পাতালজাতক

রূপক সাহা

পাতালজাতক

রূপক সাহা

pathagar.net

আনন্দ

ম্যাগনেটিক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছি অমিয়র সঙ্গে, এমন সময় ইন্দ্রদা এসে বলল, "অর্ক, ঘণ্টাখানেক কাউন্টারটা সামলে দিবি ভাই। সুজয় ফোন করেছিল। বউয়ের শরীর খারাপ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। দশটার আগে আসতে পারবে না। জানিয়ে দিল।"

ইন্দ্রদা আমাদের কালীঘাট স্টেশনের এস্ এস্। অর্থাৎ স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। আমাদের সবার বস। উনি কোনও কথা বললে, না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কাউন্টার সামলানো মানে বসে বসে টিকিট বিক্রি। সপ্তাহে চার-পাঁচদিন আমাদের এই কাজটা করতে হয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আটটা পঁচিশ। এই সময়টা থেকেই আমাদের পাতাল রেলে ভিড় শুরু হতে থাকে। অফিস আওয়ার্স। চলবে আরও ঘণ্টা তিনেক। তিনটে কাউন্টার খোলা না রাখলে লম্বা লাইন পড়ে যায়। আজ সকালের ডিউটিতে দুটো কাউন্টারে বসে গেছে সীতাংশু আর সুমন্ত্র। সে দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রদাকে বললাম, "আমি চার নম্বর কাউন্টারে গিয়ে বসছি। আপনি চিন্তা করবেন না।"

অমিয়র সঙ্গে কথা শেষ হল না। ওর সঙ্গে ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধুত্ব। আমরা সেন্ট টমাস স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম। একই সঙ্গে আশুতোষ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছি। বেহালার বনমালী নস্কর রোডে ওদের বাড়ির খুব কাছাকাছি, একটা সময় আমি থাকতাম। ও আর আমি এক সঙ্গে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পরীক্ষায় বসেছিলাম। দু'জনেই পাতাল রেলে চাকরি পেয়েছি। অমিয়র অফিস মেট্রো ভবনে। ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগে আছে। আমি কালীঘাট স্টেশনের ট্রাফিক অ্যাসিসটেন্ট। রোজ আমাদের স্টেশন দিয়ে অমিয় অফিসে যায়। আমি সকালের ডিউটিতে থাকলে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলে।

কাউন্টারের দিকে পা বাড়াতেই অমিয় বলল, "এই অর্ক, তোকে আসল কথাটাই বলিনি। ভাল একটা খবর আছে রে। শুক্লার বিয়ে হয়ে গেল। কার সঙ্গে জানিস? আমাদের মেট্রো রেলেরই বড় অফিসার। শুভঙ্কর দত্ত। ভদ্রলোককে তুই চিনিস?"

ঘাড় নেড়ে বললাম, "না," মেট্রো ভবনে কত অফিসার। সবাইকে চেনা সম্ভব? মেট্রো ভবনে মাঝে মধ্যে যাই বটে, তা সে স্টোর্স আর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। ওই হলদে বাড়িতে গেলে একতলায় অমিয়র অফিসে খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে আসি। ওপরতলার অফিসারদের কাউকে চিনি না।

শুক্লার বিয়ের খবরটা শুনিয়ে অমিয় আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় আমার মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কি না, তা লক্ষ করছে। এখন শুক্লার নামটা শুনলে আর চঞ্চল হই না। বছর পাঁচেক বেহালা ছেড়ে চলে এসেছি। শুক্লার স্মৃতি আমার কাছে ফিকে হয়ে গেছে। হবেই বা না কেন? আমার দিক থেকে তো কোনও আগ্রহ ছিল না। ও-ই বরং আমার জন্য একটা সময় পাগল হয়ে উঠেছিল। আমি ঠিক সময়ে পাড়া ছেড়ে চলে এসেছি। না এলে খুন হয়ে যেতাম। যাক সে সব পুরনো কথা। অমিয়কে বললাম, "খুব ভাল খবর দিলি। যোগ্য

লোকের সঙ্গেই ওর বিয়েটা হয়েছে।"

অমিয় বলল, "বিয়ের দিন আমি গেছিলাম রে। ওর মা বার তিনেক তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তোকে তো নেমন্তন্ন করেছিল। গেলি না কেন?"

এটা আমার কাছে একটা খবর। শুক্লার বিয়েতে ওর বাড়ির লোকেরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। ফালতু কথা। আমি অন্তত কোনও কার্ড-টার্ড পাইনি। সেই কথা অমিয়কে বলার দরকার নেই। ইন্দ্রদা এখনও এস এসের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কাজ পাগল মানুষ। যতক্ষণ না আমি কাউন্টারে গিয়ে বসছি, ততক্ষণ ইন্দ্রদা দাঁড়িয়েই থাকবেন। যাত্রীদের সামান্য অসুবিধা হোক, এটা চান না ইন্দ্রদা। তাই অমিয়কে কাটানোর জন্যই বললাম, "সময় পাইনি রে। সেদিন ডাবল ডিউটি করতে হয়েছিল।"

অমিয় ইয়ার্কি মেরে বলল, "ভাল আছিস ভাই। ওভার টাইম করে বেশ কামাচ্ছিস। তোদের পয়সা দিতে গিয়েই মেট্রো রেলে এত লস। এখন বেশ বুঝতে পারছি।"

কথাটা শুনে হেসে গেটের ও প্রান্তে বেরিয়ে এলাম। দমদম থেকে বোধহয় কোনও ট্রেন এল। সিঁড়ি আর এসকালেটর দিয়ে গলগল করে লোক উঠে আসছে। অফিস আওয়ার্সে লোক বেশি যাতায়াত করে বলে আমরা গেট খুলে রাখি। টিকিট পাঞ্চ করার দরকার হয় না। চারমুখী চারটে সিঁড়ি দিয়ে লোকে ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠে যায়। কাউন্টারের সামনে বড় চাতালটা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায়।

দুটো কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। এখুনি আরেকটা কাউন্টার খোলা দরকার। পাশ ফিরে অমিয়কে বললাম, "এই, এখন আমার কথা বলার টাইম নেই। বিকেলে তুই কখন ফিরবি রে?"

"সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে। ও হো, তোকে তো একটা খবর দেওয়াই হয়নি। ভেরি ইন্টারেস্টিং। কাল বিকালে না, আমাদের বসকে ওপরতলায় ডেকে জি এম আচ্ছা করে ঝেড়েছে।"

হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "কেন?"

"আনন্দবাজারে কী যেন একটা খবর বেরিয়েছিল। মেট্রো রেল নিয়ে। জি এম তো খেপে বোম। একটা কনট্রাডিকশন পাঠাতে বলেছিল আমাদের বস-কে। পাঠায়নি। পাঠাবে কী করে? খবরটা তো বস-ই দিয়েছিল। ব্যস, ঝাড় খেয়ে নেমে এসে বস কী বলল, জানিস? না অমিয়, এখানে আর চাকরি করা পোষাবে না।"

অমিয়র মুখে খুশি খুশি ভাব দেখে আমার ভাল লাগল না। বেশি খাটতে হয় বলে, বস-কে ও পছন্দ করে না। মাঝে মধ্যেই আমার কাছে নিন্দে করে। অফিসের রাজনীতিতে একবার জড়িয়ে পড়লে মুশকিল। অমিয় যে ইউনিয়নের মেম্বার, তারা ওর বস-কে পরোয়া করে না। দু'একবার বিক্ষোভও দেখিয়েছে পি আর ডি-র ঘরের সামনে। এসব কথা আমার জানার কথা নয়, অমিয়র মুখেই শুনেছি।

পাল্টা প্রশ্ন করলে অমিয় সাতকাহন শুরু করবে। তাই চুপচাপ কাউন্টারে ঢুকে গেলাম। মেশিন খোলার জন্য আমাদের একটা ব্যাজ নম্বর ব্যবহার করতে হয়। চার সংখ্যার একটা নম্বর। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা। নম্বরগুলো টিপে মেশিনটা চালু করে দিলাম। পরে ব্যাজ নম্বর দেখে ইন্দ্রদা মিলিয়ে নেবেন, কে কোন কাউন্টারে বসেছিল। বা কত টাকার টিকিট বিক্রি করেছে। কাউন্টারের সামনে থেকে 'ক্লোজড' বোর্ডটা সরিয়ে দিতেই সামনে লাইন পড়ে গেল।

অন্যদিন আমার সঙ্গে কথা বলে অমিয় নীচে ট্রেন ধরতে নেমে যায়। আজ তা না করে আমার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারে ঢুকে এসেছে। টিকিট দেওয়ার ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "অফিস যাবি না?"

"যাব। বারোটার পর। এখনও আমি ডিউটিতে আছি।"

"তার মানে?"

"কয়েকটা খবরের কাগজে কাল একটা বিজ্ঞাপন বেরোবে। আসলে একটা টেন্ডার। মেট্রোর প্রতিটা স্টেশনকে আবার নতুন করে সাজানো হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। ঠিকাদারদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।"

অমিয়কে সাধু ভাষায় কথা বলতে দেখে হাসি পাচ্ছে। কিন্তু কাউন্টার হাসি-ঠাট্টা করার জায়গা নয়। যাত্রীরা দেখলে চটে যেতে পারেন। তাই চুপ করে রইলাম। টিকিট দেওয়ার সময় সামান্য ভুল হলে আমাদের মাফ নেই। এ নিয়ে প্রতিদিন অশান্তি হয়। চিৎকার-চেঁচামেচি। যাত্রীরা ভুল করলেও আমাদের তা মেনে নিতে হবে। ইন্দ্রদার বলাই আছে, যাত্রীরা আমাদের লক্ষ্মী। ওঁদের চটানো যাবে না।

মুখ বুজে টিকিট বিক্রি শুরু করলাম। টু জোন, থ্রি জোন। পাঁচ আর সাত টাকার টিকিটের ক্রেতাই বেশি। আমাদের স্টেশন দিয়ে রোজ প্রায় হাজার তিরিশ যাত্রী যাতায়াত করেন। সকালের দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যান। আবার বিকেলে ফিরে আসেন। বেশিরভাগ চেনা মুখ। স্কুল-কলেজ, অফিসযাত্রীদের দেখেই আমরা বুঝে যাই, কে কোন জোনের টিকিট চাইবেন। অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও হয়ে গেছে। নববর্ষে বা বিজয়ার সময় আমরা গ্রিটিংস কার্ড পাই। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে অনেক যাত্রী আমাদের জন্য মিষ্টিও পাঠিয়ে দেন। সত্যি বলতে কী, তখন বেশ ভাল লাগে।

অমিয় চুপ করে বসে থাকার ছেলে নয়। হঠাৎ বলল, "আরতিকে এখানে আসতে বলেছি, আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে এসে যাবে।"

আরতি মানে, অমিয়র বউ। সিরিটির মেয়ে। দশটা বছর ধরে প্রেম করার পর এই মাস ছয়েক আগে অমিয় বিয়ে করেছে। আরতি কি সিরিটিতে আছে? বোধহয়। তা না হলে ওর জন্য অমিয় আধ ঘণ্টা আগে এসে এখানে বসে থাকবে কেন? প্রশ্নটা মুখ ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিয় বলে উঠল, "চৈত্র মাসের সেল দিচ্ছে গড়িয়াহাটের মার্কেটে। কিছু কেনাকাটা করা দরকার। একসঙ্গে বেরোলে মা ঘ্যান ঘ্যান করত, বুঝলি। কী দরকার কেনাকাটার? মাকে চুক্কি দেওয়ার জন্যই ওকে আলাদা আসতে বললাম।"

আমি দাঁত চেপে বললাম, "মাসিমাকেও আজকাল চুক্কি দিচ্ছিস?"

"বিয়ে-থা তো করিসনি। সংসারে পাঁচজনকে নিয়ে চলা কী হুজ্জোত, পরে বুঝবি।"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, "এই ভয়েই বোধহয় আমার মা সাত তাড়াতাড়ি স্বর্গে গেছে।" কিন্তু কিছু বললাম না। চুপচাপ কাজ করতে লাগলাম।

"অর্ক, তোর কাছে পঞ্চাশ টাকার খুচরো পাওয়া যাবে?" পাশের কাউন্টার থেকে ব্যাজার মুখে আমাকে জিজ্ঞেস করল সুমন্ত্র। টিকিট কেনার জন্য বোধহয় কেউ নোটটা দিয়েছে। সুমন্ত্র দিতে পারছে না। তাই আমার কাছে ভাঙানি চাইছে। আমি "নেই" বলতেই ও জানলা দিয়ে নোটটা গলিয়ে বলল, "বাইরে থেকে নোটটা ভাঙিয়ে আনুন। আমরা দিতে পারব না।"

পরক্ষণেই এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনারা কী রকম লোক মশাই? পঞ্চাশটা

সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলুম। এখন আবার উপরে উঠতে বলছেন?"

সুমন্ত্র বলল, "তিন টাকার টিকিটের জন্য পঞ্চাশ টাকার নোট এনেছেন কেন? বাইরে কী লেখা আছে দেখছেন না?"

বোর্ডে লেখা আছে বটে 'সঠিক ভাড়া দিন', কিন্তু কেউ তা মনে রাখেন না। ভদ্রমহিলা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "সকাল থেকে টিকিট বিক্রি করছেন, অথচ পঞ্চাশ টাকার খুচরো নেই, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এ কথা?"

কথায় কথা বাড়ে। আমাদের সবারই এক অভিজ্ঞতা। সুমন্ত্র আর তাই কথা বাড়াল না। ক্লান্ত গলায় বলল, "আপনি এক পাশে দাঁড়ান। অন্যদের টিকিট নিতে দিন। খুচরো হলে আমি আপনাকে ডেকে নেব।"

লাইন থেকে ভদ্রমহিলা সরে দাঁড়ালেন। উঁকি মেরে মুখটা দেখেই চিনতে পারলাম। আমাদের চেতলায় থাকেন। দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার বলে একটা দোকান আছে হিজড়ার মোড়ে। তার মালিকের স্ত্রী। যাতায়াতের পথে প্রায়ই চোখে পড়ে। চোখাচোখি হলে এই কাউন্টারে চলে আসতে পারেন। তাই একটু সরে বসলাম। সকালবেলার ডিউটি থাকলে ওই দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে কচুরি আর হালুয়া খেয়ে আমি অটো ধরি। অত সকালে—সাড়ে ছ'টায় আমার জন্য ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দেওয়ার মতো কোনও লোক বাড়িতে নেই। ঘুম থেকে উঠতে যেদিন দেরি হয়ে যায়, সেদিন পেটে কিছু পড়ে না। আজ ওই রকম একটা দিন। ভদ্রমহিলাকে দেখা মাত্রই খিদেটা হঠাৎ চাগাড় দিয়ে উঠল। বেলা এগারোটার আগে ফুরসত পাওয়া যাবে না। কথাটা মনে হতেই, হিসেব করে নিলাম, এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি।

"অর্কবাবু, এক মিনিটের জন্য একবার বাইরে আসতে পারবেন?"

মুখ তুলে দেখি, যতীন সাহা। ভদ্রলোক কাপড়ের ব্যবসায়ী। রোজ পাতাল রেল দিয়ে যাতায়াত করেন। আমাদের সবার খুব চেনা। ফলতায় একটা বাগানবাড়ি আছে যতীনবাবুর। একবার আমরা সবাই সেখানে পিকনিক করতে গেছিলাম। ভদ্রলোকের হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ, বোধহয় কিছু দিতে এসেছেন। কাউন্টার ছেড়ে এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব না। তাই ইশারা করে বললাম, ভেতরে আসুন।

যতীন সাহা ভেতরে ঢুকে বললেন, "কাল ফলতায় গেছিলাম। গঙ্গার পারে গিয়ে দেখি, খুব ইলিশ উঠেছে। তাই কয়েকটা নিয়ে এলাম। আমার বাড়িতে তো খাওয়ার লোক তেমন নেই। তাই আপনাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন আমার স্ত্রী। নিন, রাখুন ভাই।"

যতীনবাবুর কথা শুনে অমিয় অবাক হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে ও ব্যাগটা নিতেই, যতীনবাবু বললেন, "চলি তা হলে। আমার একটু তাড়া আছে আজ। মাছটা খেয়ে বলবেন, কেমন লাগল।"

কথাগুলি বলেই উনি বেরিয়ে গেলেন। ব্যাগ খুলে ইলিশের সাইজ দেখে অমিয় বলল, "মাই গড, লোকটা এত বড় দুটো মাছ তোদের এমনি দিয়ে গেল? তোরা কী লাকি মাইরি। কী করবি এখন মাছ নিয়ে?"

"রাসবিহারীর মোড়ে যে পাইস হোটেলটা আছে, ওখানে পাঠাব। ওরাই কেটেকুটে, ভেজে পাঠিয়ে দেবে।"

বলেই চুপ করে গেলাম। অমিয়কে চুপ করানোর জন্যই মিথ্যে কথাটা বললাম। পাতাল রেলের কোনও স্টেশনে ক্যান্টিন নেই। পনেরো-কুড়িজন করে স্টাফ একেকটা স্টেশনে। এত

কম লোকের জন্য কর্তারা ক্যান্টিনের প্রয়োজনবোধ করেননি। সকাল সাতটায় আমরা যারা ডিউটিতে আসি, তারা বেলা আড়াইটার আগে ছাড়া পাই না। আমাদের লাঞ্চ করার অসুবিধের কথা কর্তারা ভাবেননি। তাই আমরা নিজেরাই গোপনে একটা ক্যান্টিনের মতো করে নিয়েছি। নীচে অনেকগুলো ফাঁকা ঘর আছে। তারই একটায় স্টোভে ডাল-ভাত ফুটিয়ে দেয় সুরজপ্রসাদ বলে একজন সুইপার। খিদের সময় ওর হাতের খাবারই অমৃত বলে মনে হয়। সকাল দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ সুরজপ্রসাদ এসে প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা করে নিয়ে যায়। কোনওদিন মাছ রান্না করলে আরও পাঁচ টাকা বেশি। পাতাল রেলের কর্তারা এসব জানেন না। স্টোভে রান্না করার কথা জানতে পারলে ক্যান্টিন তুলে দেবেন।

পলিথিনের ব্যাগটা আমার চেয়ারের নীচে রেখে অমিয় উঠে দাঁড়াল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "অর্ক, তোদের এখান থেকে একটা ফোন করা যাবে বাড়িতে? আরতি এখনও এল না। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়?"

কাজ করতে করতেই বললাম, "ইন্দ্রদার ঘরে চলে যা, ওখানে ফোন আছে।"

অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ালাম। উঁচু চেয়ারে বসে বেশিক্ষণ কাজ করতে পারি না। কাউন্টারগুলো যখন তৈরি হয়েছিল, তখন হাইট নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। এখন আমাদের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। উঁচু চেয়ারে বসে ঝুঁকে কাজ করার জন্য কারও স্পন্ডিলাইটিস হয়ে গেছে, কারও হাঁটুতে ব্যথা। শ্যামলদার এখন এমন অবস্থা, হাঁটুর চিকিৎসার জন্য প্রায়ই অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে দৌড়তে হচ্ছে। কাউন্টারে তাই কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে টিকিট বিক্রি করি আমি। এখনও আমাকে কোনও রোগে ধরেনি।

আমাদের টিকিট কাউন্টারের ঠিক উল্টোদিকে পেপসির একটা বুথ আছে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ায় দেখলাম, প্রিয়াঙ্কা বলে মেয়েটা এসে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে বুটিকের সালোয়ার-কামিজ, চুল উল্টো করে আঁচড়ানো। যে কোনও পুরুষের নজর টানতে বাধ্য। কিন্তু ওকে দেখলে আমার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে যায়। এই মেয়েটা আমার বিরুদ্ধে একবার মেট্রো ভবনে অভিযোগ করেছিল। আমি নাকি ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। মেট্রো ভবনের সাততলায় আমার ডাক পড়েছিল। গিয়ে দেখি, মেয়েটাকেও ডাকা হয়েছে। তখনই ওর নামটা জানতে পারি। মুখোমুখি সওয়াল-জবাবে প্রিয়াঙ্কা কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। উল্টে, আমিই অফিসারদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম, ও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। তারপর থেকে রোজ এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় প্রিয়াঙ্কা কেমন যেন অপরাধী চোখে তাকিয়ে থাকে।

মাসখানেক আগে থেকেই লক্ষ করছি, আরও একটা মেয়ে ওর সঙ্গে জুটেছে। ওরা দু'জনেই মহাত্মা গাঁধী রোডের টিকিট কাটে। হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, না হয়তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই পেপসি বুথের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়াঙ্কা। তারপর অন্য মেয়েটা এলে কথা বলতে বলতে দু'জনে নীচে নেমে যায়। আগে রোজ টিকিট কাটত। এখন মাসে একটা দিন ফরটি এইট রাইডের একটা করে টিকিট কেটে নেয়। তাই রোজ প্রিয়াঙ্কার মুখোমুখি হতে হয় না। পেপসি বুথের দিকে ফের চোখ যেতেই দেখলাম, প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন ছটফট করছে। ওকে নিয়ে ভাবার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। তাই টিকিট বিক্রিতে মন দিলাম।

"হ্যাঁরে অর্ক, যতীনবাবু নাকি ইলিশ মাছ দিয়ে গেছেন? অমিয় গিয়ে আমাকে বলল।

পাশ ফিরে দেখি ইন্দ্রদা। কাউন্টারের ভেতর ঢুকে এসেছেন। হাতে পলিথিনের মোড়কে পাঁচ আর দু'টাকার কয়েন। আমাকে তিন-চারটে মোড়ক দিয়ে বললেন, "রাখ এগুলো। শ'পাঁচেক টাকার মতো কয়েন আছে।"

নিশ্চয়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পাঠিয়েছে। কয়েনগুলো ঝকঝক করছে। কাউন্টারে খুচরো দরকার হয় বলে প্রতি সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে হাজার দশেক টাকার কয়েন পাতাল রেলের প্রতি স্টেশনে পাঠানো হয়। কাল বিকেলের দিকে বোধহয় এই কয়েনের প্যাকেট এসেছে। সকালেই কয়েনগুলো দিয়ে দিলে সুমন্ত্রর সঙ্গে ভদ্রমহিলার কথা কাটাকাটি হত না। বিকেলের শিফটে ইনচার্জ ছিলেন চক্রবর্তীদা। কয়েনের প্যাকেট বোধহয় আলমারিতে তুলে রেখে গেছিলেন। ইন্দ্রদা জানতেন না। এখন চোখে পড়ায় নিয়ে এসেছেন।

ইলিশের ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে ইন্দ্রদা বললেন, "এই মাছ সুরজপ্রসাদের হাতে দিয়ে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। সর্ষে দিয়ে রাঁধলে দারুণ টেস্ট হবে। দাঁড়া, বাইরে একজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই রান্না করে দেবে।"

"কে ইন্দ্রদা?"

"আছে। তুই চিনিস না। এই নেপাল ভট্টাচার্য লেনে থাকে।"

ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইন্দ্রদা ফের ঘুরে দাঁড়ালেন, "শোন, তোদের তিনজনকেই বলে যাই। মুদিয়ালির কাছে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। রাসবিহারীর মোড়ে গণ্ডগোল হচ্ছে। বোধহয় বাস-ট্রাম সব বন্ধ হয়ে যাবে। একটু পরেই প্যাসেঞ্জাররা সব নেমে আসবে। চাপটা কিন্তু তোদেরই সামলাতে হবে। রেডি থাকিস, বুঝলি।"

আমরা তিনজনই ঘাড় নাড়লাম। ইন্দ্রদার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে একটু পরেই মারাত্মক ভিড় শুরু হয়ে যাবে। বেলা দুটো পর্যন্ত আমরা কেউ নড়াচড়ার সুযোগ পাব না। পাতালে বসে আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়, এটা একটা আশ্চর্য জগৎ। ওপরে ঝড়-জল, বিক্ষোভ, পথ অবরোধ, কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটে যায়। নীচে বসে আমরা কিছু টের পাই না। মাঝে একদিন দুপুরের দিকে ভূমিকম্প হয়েছিল। পরদিন খবরের কাগজে দেখে তা জানতে পেরেছিলাম। আরেকবার টালিগঞ্জের মোড়ে ছ'তলা একটা বাড়ি ভেঙে পড়ে। সারা কলকাতায় হইচই হয়ে গেল। আমি জানলাম, রাতে অফিস থেকে ফেরার সময়।

ফিরে গিয়ে ইন্দ্রদা বোধহয় ক্যাসেট চালিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা মুখার্জির গান বাজছে। "আসছে শতাব্দীতে, আসব ফিরে তোমার খবর নিতে।" এই গানটা শুনলেই আমার মনটা খুব ভাল হয়ে যায়। কারও উপর রাগ থাকে না। বিরক্তি হয় না, গাইতে পারেন বটে ভদ্রমহিলা! "দেখব তখন কোথায় তোমার মন, একুশ শতক করছে পর্যটন...।" সুর সুমন চট্টোপাধ্যায়ের। কথাও। ক্যাসেটটা প্রথম এখানে শুনে এত ভাল লেগে গেছিল, ওপরে উঠে মেলোডি থেকে সেদিনই কিনে ফেলেছিলাম। ইন্দ্রদা বলেছিলেন, "অর্ক, তুই যে এত গান ভালবাসিস, তা তো জানতাম না।"

ইন্দ্রদা অবশ্য যন্ত্রসঙ্গীত শুনতেই বেশি পছন্দ করেন। যে শিফটে থাকেন, সব সময় হয় রবিশঙ্কর, না হয় হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার ক্যাসেট বাজান। সত্যি বলতে কী, সুরগুলো তখন মনে হয় পাতালের খাঁজে খাঁজে খেলে বেড়ায়। আমার মতো 'রাফিয়ান' ছেলের চোখেও জল এসে যায়। আমার সম্পর্কে রাফিয়ান কথাটা কে বলেছিল, ভাল মতো তা মনে আছে।

শুক্লার বাবা। কিছু ভুলিনি। ভগবান আমাকে অনেক কিছু দেননি। কিন্তু একটা জিনিস দিয়েছেন—স্মৃতিশক্তি। প্রখর স্মৃতিশক্তি। কোনও কিছু দেখলে, পড়লে বা শুনলে আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। সেন্ট টমাস স্কুলে ফাদার অ্যান্ড্রুজ বলতেন, "অর্ক, তুমি খুব নামকরা অ্যাকাডেমিশিয়ান হবে।" হলাম কই। তার বদলে পাতাল রেলে টিকিট বিক্রি করছি।

"মহাত্মা গাঁধী রোডের দুটো টিকিট দেবেন, প্লিজ।"

'প্লিজ' কথাটা শুনে মুখ তুলে তাকালাম। এত মধুর ভাষণ কেউ করে না। বিশেষ করে মেয়েরা। দেখি, প্রিয়াঙ্কার বন্ধু সেই মেয়েটা। বললাম, "একসঙ্গে, না আলাদা আলাদা?"

"একসঙ্গে।" কথাটা বলেই মেয়েটা দশ টাকার একটা নোট আর একটা গোলাপি রঙের খাম এগিয়ে দিল। মেয়েটা বোধহয় ভুল করে খামটা এগিয়ে দিয়েছে। চমকে তাকাতেই, দ্রুত একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "এটা আপনার।"

মেয়েটার পিছনে দশবারো জনের লাইন। কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই অন্য যাত্রীদের ভ্রূ কোঁচকাবে। খামটা তাই এক পাশে সরিয়ে রাখলাম, প্রিয়াঙ্কা পেপসি বুথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো টিকিট নিয়ে মেয়েটা ওর কাছে গিয়ে কী বলতে বলতে নীচে নেমে গেল। গেট পেরোবার আগে প্রিয়াঙ্কা একবার কাউন্টারের দিকে ফিরে তাকাল বলে আমার মনে হল। এটা আমার কাছে তুচ্ছ ঘটনা। পাত্তাই দিলাম না। প্রিয়াঙ্কা বেশ ধনী পরিবারের মেয়ে। মেট্রো ভবনে সেদিনই জেনেছিলাম, ওর বাবা কলকাতা হাইকোর্টের নামী অ্যাডভোকেট। আমার বরাবরের ধারণা, বড়লোকের মেয়েরা ভাল হয় না। ধারণাটা কাকে দেখে হয়েছে, জানি না। হতে পারে, শুক্লাকে দেখে। সে যাক, আমার ধারণায় কার কী আসে যায়? মন দিয়ে যাত্রী পরিষেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

...বেলা সাড়ে বারোটার পর কাউন্টার একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতে সুমন্ত্রকে বললাম, "এই শোন, আমি একটু সিগারেট খেতে যাচ্ছি। তোরা কিন্তু সামলাস।" বলেই কাউন্টার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

সুমন্ত্র বিরক্ত মুখে বলল, "তুমি এলে আমি চা খেতে যাব। মাথাটা ধরে আছে, সকাল থেকে কাউন্টারে বসে।"

উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এলাম। গোলাপি রঙের খামটা এখন আমার হাতে। সিগারেট টানার ফাঁকে দেখতে হবে, কী আছে ওতে। হাতে নিয়ে বোঝা যাচ্ছে, গ্রিটিংস কার্ড নয়। তা হলে কী হতে পারে? মেয়েটার সঙ্গে আমার কোনওদিন আলাপ হয়নি। আমাকে চিঠি দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ওর নেই। আর প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার এমন সুসম্পর্ক নেই, যে ও আমাকে চিঠি দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাবে। মনে এত কৌতূহল হল, সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়েই খামটা খুলে ফেললাম। দু'লাইনের একটা চিঠি। পড়েই হাসি পেয়ে গেল।

"আপনার নামে সেদিন অভিযোগ করার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমাকে মাফ করবেন—প্রিয়াঙ্কা।"

পড়েই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। ঘটনা ঘটার ছয় মাস পর আমার কাছে মাফ চাইছে? ন্যাকামি করার জায়গা পায়নি। সিনেমায় এসব মাফ করাকরি হয়। করিশমা কপূরদের মাফ করে দেয় আমির খান সলমন খানেরা। তারপর ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দশবার জামা পাল্টে দুজনে মিলে গান গাইতে গাইতে নাচে। বাস্তবে এসব হয় না। প্রিয়াঙ্কা কি জানে, ওর

অভিযোগের জন্য আমার কোনও শাস্তি হয়নি বটে, কিন্তু আমার প্রোমোশন আটকে গেছে? সুমন্ত্র আমার থেকে দু'বছরের জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও, সিনিয়র গ্রেড পেয়ে গেছে? রাগে চিঠির কুচিগুলো মুঠোয় নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম।

কুচিগুলো নর্দমায় ফেলে দেওয়া দরকার।

২

সিগারেট খেয়ে নীচে কাউন্টারে ফিরতেই সুমন্ত সিট ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। ওর মুখে বিরক্তির ছাপ নেই। কোনও কারণে বোধহয় হাসছিল। সুমন্ত হাসছে, এটা বিরল ঘটনা। ও আগে ছিল সারফেস রেলে। ভুবনেশ্বর স্টেশনে। বদলি হয়ে পাতাল রেলে এসেছে। বদলিটা ওর মনের মতো হয়নি। তাই সব সময় গম্ভীর মুখে বসে থাকে। তবে ছেলেটা খুব ভদ্র।

সীতাংশু কাকে যেন বলছে, "দাঁড়া, তোর বাবাকে আমরা সব বলে দেব। তখন টের পাবি, হাউ মেনি রাইস ইন হাউ মেনি প্যাডি।"

কাউন্টারের বাইরে থেকে মেয়ের গলা শুনতে পেলাম, "ইংরেজি বলতে পারো না, কেন বলতে যাও সীতাংশুকাকু? পড়েছ তো বকুলতলা অনুকূলচন্দ্র বিদ্যালয়ে, মা গো, স্কুলের কী বিচ্ছিরি নাম।"

এবার গলা শুনেই বুঝতে পারলাম, সুজাতা। আমাদের ট্রাফিক সুপারভাইজার নিবারণদার মেয়ে। পড়ে কাছেই নব নালন্দা স্কুলে। ক্লাস টেনে। রোজ স্কুল থেকে ফেরার সময় কালীঘাটে বাবার সঙ্গে একবার কথা বলে যায়। আজ নিবারণদা আছেন উত্তর দিকের গেটে। সুজাতা জানত না। মেয়ের জন্য নিবারণদা হয়তো এদিকে আসছেন। সেই ফাঁকে সুজাতা গল্প করছে সীতাংশুদের সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেয়েই ও বলল, "অর্ককাকু, আমার নামে মায়ের কাছে কে কমপ্লেন করেছে বলো তো?"

সীতাংশু বোধহয় ওর পিছনে লাগার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলেছে। সেটা বুঝতে পেরেই বললাম, "কী কমপ্লেন রে?"

"এই...আমাকে নাকি রোজ একটা ছেলে কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। একদিন নাকি আমরা সিঁড়িতে বসে গল্প করেছি।"

ওকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যই বললাম, "কে ছেলেটা?"

"তার মানে? কার কথা বলছ তুমি?"

"ওই যে...যার সঙ্গে সেদিন ট্রেনে কথা বলছিলি। ফর্সা মতো। আমার চেয়ে একটু লম্বা।"

"কবে বলো তো? বেস্পতিবার?"

"বার-টার অত মনে নেই।"

"ও তো সুপর্ণ। আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে পড়ে...শ্যামলী। ওর দাদা। সল্ট লেকের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্ট।"

"সল্ট লেকে পড়ে, তো পাতাল রেলে যাবে কেন?"

সুজাতা একটু ঘাবড়েই গেল প্রশ্নটা শুনে। আমতা আমতা করে বলল, "তা তো জানি না।"

"এই কারণেই তো লোকে তোকে সন্দেহ করে।"

সুজাতা রেগে গিয়ে বলল, "ও, তা'লে তুমিই মাকে লাগানির কাজটা করেছ। দাঁড়াও

দেখাচ্ছি মজা।"

সীতাংশু আমাদের কথা শুনে হাসছে। ও সুজাতাকে বলল, "অর্কদা বলেনি রে। বিশ্বাস কর। কে বলেছে আমি জানি।"

"তা'লে নিশ্চয়ই সুজয়কাকু।"

"কাছাকাছি গেছিস। ফোরটিন্থ লেটার দিয়ে শুরু নাম। ভাব তো, কে হতে পারে?"

সুজাতা কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, "দূর ছাই, মনে পড়ছে না। ইংরেজির ফোরটিন্থ লেটার তো এন। এন দিয়ে নাম শুরু, কে আছে তোমাদের এখানে? তার মানে, বাবা। ধুস, গুল মারার জায়গা পাওনি। তোমাদের জন্য কাল মা খুব বকাবকি করল আমাকে। সবাই যদি আমার উপর গার্জেনগিরি করো, তাহলে আমি মেট্রো রেলে যাতায়াতই ছেড়ে দেব।"

ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ বদলায় সুজাতার। ওকে ছোট থেকেই আমরা চিনি। নিবারণদা থাকেন হাতিবাগানে। মাঝে মধ্যে আমরা ওঁর বাড়িতে যাই। তাই পারিবারিক সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে। নিবারণদার স্ত্রী—ঝর্না বউদি লোককে খুব খাওয়াতে ভালবাসেন। সুজাতা একমাত্র মেয়ে। সেই কারণে, মেয়ের দিকে খুব নজর দু'জনের। আসলে ঝর্না বউদির কাছে কেউ নালিশ করেনি। বউদিই মাঝে মধ্যে আমাদের নাম করে ওর পেট থেকে কথা বের করে নেন। রোজ একা যাতায়াত করে। কখন কী বিপদ ঘটবে, সেই ভয়ে টেনশনে থাকেন। সুজাতাটাও এমন সরল, সব বলে ফেলে। এই মাত্র যেমন বলে ফেলল, বেস্পতিবার একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিল। ওকে রাগানোর জন্যই বললাম, "ঠিক আছে, মেট্রো রেলে চড়িস না। তোরই ক্ষতি হবে। মেট্রোর মতো স্মুথ ট্রান্সপোর্ট আর কোথায়ও পাবি?"

সুজাতা হার মানবে না বলেই বলল, "ট্রাম অনেক ভাল।"

সীতাংশু হাসতে হাসতে বলল, "রোজ তাহলে ছুটির সময় স্কুলে পৌঁছবি।"

আমাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না সুজাতা। কোণঠাসা হয়ে বলল, "আমিও তোমাদের নামে নালিশ করতে পারি। দাঁড়াও, আজই গিয়ে মাকে একটা কথা বলব।"

"কী বলবি?" জিজ্ঞেস করল সীতাংশু।

"তোমার নামে নয়। অর্ককাকুর নামে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেলাম। সুজাতা কী বলতে, কী বলে বসবে। হট করে সে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তাই বললাম, "এবার তুই গাট্টা খাবি। যা, পালা।"

"পালাব কেন? নিজের বেলায় আটিশুটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি। তাই না? অমনি গম্ভীর হয়ে গেলে, কেমন?"

সীতাংশু ওকে তাতানোর জন্য বলল, "কী করেছে রে অর্ককাকু? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে?"

"খাচ্ছেই তো। না হলে শ্রীপর্ণাদি কেন বারবার অর্ককাকুর কথা জিজ্ঞেস করে?"

"শ্রীপর্ণাদিটা আবার কে?"

"অর্ককাকুর পাড়াতেই থাকে। রোজ আমার সঙ্গে পাতাল রেলে যায়। দেখবে, শ্যামলা, খুব মিষ্টি দেখতে। আমার থেকে পাঁচ-সাত বছরের বড়। কী যেন রিসার্চ করে। অর্ককাকুর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে নিজেই একদিন ভাব করে নিয়েছে আমার সঙ্গে। অর্ককাকুকে ক্রিসমাস কার্ডও পাঠিয়েছে।"

এবার মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। শ্রীপর্ণা দত্ত বলে একটা মেয়ে সত্যিই আমাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিল। মেয়েটাকে চিনি না। তাই অবাকই হয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি,

মেয়েটা আমার ঠিকানা জানল কী করে। এখন বুঝতে পারছি, ওটা কে দিয়েছিল।

সুজাতা আরও কী বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় এসে পড়লেন নিবারণদা। বাবাকে দেখে সুজাতা অভিমান করে বলল, "বাপি, দেখো, সব ক'টা আজ আমার পিছনে লেগেছে।"

নিবারণদা হেসে বললেন, "আজ অনেক দেরি করে ফেলেছিস। মা তোকে আস্ত রাখবে না।"

সুজাতা বলল, "মা মারুক-ধরুক, যা ইচ্ছে করুক। তোমাকে আমি ছাড়ছি না। চলো, ওপরে চলো। ফুটপাথে ঢালাও বিক্রি হচ্ছে। মাত্র কুড়ি টাকা দাম।"

আমি কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই নিবারণদা বলল, "ঋত্বিক রোশনের পোস্টার। কাল থেকে মাথা খেয়ে ফেলছে। কেনা চাই-ই।"

কথাটা শুনে আমি হাসতে লাগলাম। এই মাসছয়েক আগে সুজাতা খুব ফ্যান ছিল শাহরুখ খানের। এখন শুনছি, ঋত্বিক রোশনের ফ্যান। এ নিয়ে পরে একদিন রাগানো যাবে। চুপ করে রইলাম। কাউন্টারে প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে গেছে। এখন আর কথা বলা যাবে না। দুপুরের এই সময়টায় পনেরো মিনিট অন্তর ট্রেন। দমদমমুখী একটা ট্রেন যাওয়ার পর মিনিট পাঁচ-সাত একটু ফাঁকা পাওয়া যায়। নিবারণদা আর সুজাতা চলে যাওয়ার পরই সীতাংশু লাঞ্চ সারতে গেছে ক্যান্টিনে। ও ফিরে কাউন্টারে এসে বসলে ইন্দ্রদা আর আমি ক্যান্টিনে যাব।

প্রায় পৌনে একটা বাজে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। মাঝে সিগারেট টানতে গিয়ে দুটো কলা খেয়ে এসেছি। তাতে খিদে কমেনি। বেলা দু'টোয় এসে আমার জায়গায় কাউন্টারে বসবে কিশোর। তার আগে টিকিট বিক্রির সব হিসেব আমাকে করে রাখতে হবে। টাকার বান্ডিল আর খুচরো কয়েনের প্যাকেট তুলে দিতে হবে ইন্দ্রদার হাতে। শ' দুয়েক টাকার খুচরো আলাদা সরিয়ে রাখতে হবে কিশোরের জন্য। যাতে পরে ও কোনও অসুবিধেয় না পড়ে।

ইন্দ্রদার ঘরে একটা লকার আছে। সব কাউন্টারের টাকা গিয়ে জমা পড়বে ওই লকারে। রোজ প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয় আমাদের স্টেশন থেকে। ব্যাঙ্কের লোক এসে সেই টাকা নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কের লোকের রোজ আসার কথা। কিন্তু আসে না। দশ-বারো দিন টাকা জমা হয় লকারে। তারপর একদিন এসে ওরা ছয়-সাত লাখ টাকা একসঙ্গে নিয়ে যায়। এত টাকা স্টেশনে পড়ে থাকে। অথচ কারও কোনও হুঁশ নেই। ইন্দ্রদার বুকে চেম্বার ঠেকিয়ে কেউ যদি লকার খুলতে বলে, পুরো টাকাটাই চোট হয়ে যাবে। গুন্ডা-বদমাইশরা জানে না। জানলে যে কোনও দিন ডাকাতি হয়ে যাবে।

কাউন্টার ফাঁকা দেখে আমি ক্যাশ গোছাতে লাগলাম। হঠাৎ মাইকে ইন্দ্রদার গলা, "টালিগঞ্জ থেকে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর টিকিট দেওয়া হবে না। যাঁরা টিকিট কিনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছেন, তাঁরা টিকিটের দাম ফেরত নিয়ে যান।"

বার তিনেক কথাগুলো বলল ইন্দ্রদা। হঠাৎ কী হল টালিগঞ্জে? প্ল্যাটফর্মে অবশ্য খুব বেশি লোকজন নেই। মেরেকেটে কুড়িজন। বা তার আরও কম। কিন্তু ইন্দ্রদা যখন টিকিট দিতে মানা করেছেন, তখন ধরে নিতে হবে ঘন্টাখানেকের আগে ট্রেন চলাচলের কোনও সম্ভাবনা নেই। তা হলে কি কোথাও অ্যাকসিডেন্ট হল? কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। ট্রেন বন্ধ হলেই অশান্তি। লোকজন এসে চেঁচামেচি শুরু করবে। গালাগাল দেবে। আর তা চুপচাপ হজম করতে হবে আমাদের। ম্যাগনেটিক গেটের কাছে

স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু' তিনজন পুলিশ বসে থাকে। সেই সঙ্গে কালীঘাট থানার দু'জন। তাকিয়ে দেখলাম, পুলিশদের চেয়ারে এই মুহূর্তে কেউ নেই। ঝামেলা হলে ওপর থেকে এম আর পি-দের ডেকে আনতে হবে। ইন্দ্রদা পাকা মাথার লোক। নিশ্চয় সব ব্যবস্থা আগে করে, তবেই মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে।

কাউন্টারের সামনে ক্লোজড বোর্ডটা ঝুলিয়ে দেব কি না ভাবছি, এমন সময় সুজয়দা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, "টালিগঞ্জে আজ কী হয়েছে, জানিস?"

সকাল থেকে সুজয়দার আজ পাত্তা নেই। বউয়ের অসুখ, বেলা দশটায় আসবে বলে, এই বেলা একটায় এসে সুজয়দা গল্প ফাঁদতে চাইছে। টালিগঞ্জে কী হয়েছে, একটু পরেই জানতে পারব ইন্দ্রদার মুখ থেকে। তাই কোনও আগ্রহই দেখালাম না। ঠান্ডা গলায় বললাম, "মিতা বউদির কী হয়েছে সুজয়দা? এত দেরি করলে যে?"

সুজয়দা বলল, "লেফট ব্রেস্টে একটা টিউমারের মতো হয়েছে। ক'দিন ধরে বলছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। তাই গেছিলাম। ফিরে এসে শুনি টালিগঞ্জে মারাত্মক ব্যাপার।"

মিতা বউদিকে দেখে ডাক্তার কী বলেছে, তা কিন্তু জানাল না সুজয়দা। একটু অবাক হয়েই তাকালাম। নিশ্চয় গুরুতর কিছু নয়। মিতা বউদির সঙ্গে আমাদের সবার খুব ভাল সম্পর্ক। বছরে একটা দিন আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাই। সেই কারণে যোগাযোগটা আছে। সুজয়দা থাকে খুব কাছে। লেক মার্কেটের মুখে। বেশ কয়েকবার আমি সুজয়দার বাড়িতে গেছি। মিতা বউদি খুব মিশুকে টাইপের। গেলে খুশি হয়। কিন্তু সুজয়দার কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, দরকার ছাড়া বাড়িতে যাওয়া পছন্দ করে না। মিতা বউদির প্রসঙ্গে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হতে পারে। সেইজন্য বললাম, "কী এমন ঘটল সুজয়দা টালিগঞ্জে?"

"ঘেরাও। বিক্ষোভ। টালিগঞ্জে আমাদের স্টাফ কোয়ার্টার্সে যারা থাকে, তাদের বউরা আজ এখন স্টেশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।"

"কেন?"

"আরে, দীর্ঘদিন ধরে স্টাফ কোয়ার্টার্সে জলের সমস্যা। মঙ্গল থেকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত জল থাকে। শনিবার থেকে হাওয়া হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে বাড়ির লোকেরা সহ্য করেছে। আজ রাগে বেরিয়ে এসেছে।"

"জল না পাওয়ার কারণটা কী সুজয়দা?"

"খচরামি। ইলেকট্রিকাল ডিভিশনের লোকেদের খচরামি। শনি-রবি ওদের অফিস বন্ধ। তাই শুক্রবার বিকেলে পাম্প বন্ধ করে সব চলে যায়। আবার সোমবার সকালে এসে খোলে। ব্যস্, কোয়ার্টার্সের লোকেরা বাঁচল, কী মরল—শালাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। কাল বিকেলে ভবানীদা আমার কাছে এসেছিল। বললাম, ভাল কথায় কাজ হবে না। বউদিদের দিয়ে স্টেশন ঘেরাও করে দিন। ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলে মেট্রো ভবনের টনক নড়বে।"

ওহ, পরামর্শটা তাহলে সুজয়দারই! শুনে রাগ হয়ে গেল। ভবানীদা হলেন মেট্রো কর্মীদের একটা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। সুজয়দার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই এসে কথা বলেন। একটা তুচ্ছ কারণে এঁরা ট্রেন বন্ধ করে দেবেন, ভাবতেও পারি না। আমাদের পাতাল রেলে সিভিল ডিভিশনের সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের একটা সূক্ষ্ম লড়াই আছে। মাঝে মাঝে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এদের ঝগড়ায় সাধারণ যাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাবেন কেন, আমার

মাথায় ঢুকল না। সত্যি বলতে কী, পাতাল রেলের দুর্নাম হয়, এমন কোনও কিছুতেই আমার মন সায় দেয় না। সুজয়দাকে তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ ট্রেন বন্ধ থাকবে, জানো?"

"যতক্ষণ না ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে মীমাংসা করবেন। তা, ধর ঘন্টা দুয়েক তো লাগবেই। তুই বাড়ি চলে যেতে পারিস।"

কথাটা শুনেই কাউন্টারে ক্লোজড বোর্ডটা লাগিয়ে দিলাম। পাশের কাউন্টার থেকে সীতাংশু টিকিটের দাম ফেরত দিচ্ছে। তা দেখে আমি হিসেব গোছাতে লাগলাম। কম পড়লে পকেট থেকে দিতে হবে। কোনও কোনওদিন আমরা গাঁট গচ্চা দিই। কিন্তু তা দশ-বারো টাকার বেশি হয় না। কিন্তু হিসেব মেলানোর সময় টাকার পরিমাণ বেশি হলেই আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। যে প্যাসেঞ্জার বেশি টাকা দিয়েছেন, তিনি এসে অভিযোগ করলেই নানা অশান্তি। আজ সকালে অমিয়টা এসে অনেকক্ষণ বকর বকর করেছে। ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শালা এখন গড়িয়াহাটে কেনাকাটা করছে বউ নিয়ে। আর আমি অন্যের টাকা মেলাচ্ছি বসে বসে।

দশ টাকার বান্ডিল সাজানোর সময় মনে হল, কাউন্টারে আমার বাঁ পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল। মুখ তুলেই দেখি, পায়েল। উল্টোদিকে পেপসির যে বুথটা আছে, তার সেলস গার্ল। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়েটা। সারাদিন বসে বসে পেপসি বিক্রি করে, অথচ ওর মুখে একটা কথাও শুনতে পাই না। ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলে সব থেকে ক্ষতি পায়েলের। ওর পেপসি কেনার লোক থাকবে না। খুব নরম গলায় বললাম, "কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ। মানে, একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। কাকে দেব, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কোথায় পেলে ব্যাগটা?"

"আমার কাউন্টারের নীচে। একটা মেয়ে এই ব্যাগটা রেখে পেপসি খাচ্ছিল। এটা মনে আছে। মেয়েটা রোজ আগে এসে অপেক্ষা করে আরেকটা মেয়ের জন্য। আজ তাড়াহুড়ো করে নেমে গেল দু'জনে। তখনই হয়তো ব্যাগ নীচে পড়ে গেছিল। মেয়ে দু'টোর মুখে প্রায় আপনার নাম শুনতে পাই অর্কদা। তাই ভাবলাম, মানে... মনে হল, বোধহয় আপনার চেনা।"

"কই, দেখি ব্যাগটা?"

পায়েল আমার সামনে রেখে দিল ব্যাগটা। মুহূর্তেই চিনে ফেললাম। এটা প্রিয়াঙ্কার। আমার ভুল হয় না। প্রিয়াঙ্কার কাঁধ থেকে রোজই ঝুলতে দেখি এই সাইড ব্যাগটা। বললাম, "যার ব্যাগ, তাকে আমি চিনি। মেয়েটা কাল এলে তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব। তুমি দিয়ে দিও, কেমন?"

এটা অবশ্য নিয়ম না। ব্যাগটা আমার জমা দেওয়া উচিত ইন্দ্রদার কাছে। তারপর উনিই ঠিক করবেন, থানায় জমা দেবেন কি না। নিয়মটা জানা সত্ত্বেও, জিনিসটা পায়েলকে রেখে দিতে বললাম। কেননা, ব্যাগের মালিক আমার চেনা। আমার অনুরোধ শুনে পায়েল বলল, "না অর্কদা, আমার কাছে ব্যাগটা রাখা যাবে না। একবার খুলে দেখেছি। কিছু টাকা আছে ভেতরে। এই ঝুঁকিটা আমি নিতে পারব না।"

"তা হলে দাও।" বলে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলাম। আজ সকালেই প্রিয়াঙ্কা চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। কাল সকালে এই ব্যাগটা ফেরত দিতে গেলে ও ভাববে আমি ওর চিঠি পেয়ে গলে গেছি। না, সেটা ভাবার সুযোগ ওকে দেব না। কাল সকালে ও এলে পায়েলকে ডেকে নেব। ওর হাত দিয়েই ফেরত দেব জিনিসটা। সিদ্ধান্তটা নিয়ে

ফেলার পরই মনটা হালকা হয়ে গেল।

ইন্দ্রদাকে হিসেব বুঝিয়ে যখন নীচে খেতে নামলাম, তখন বেলা দেড়টা। সুজয়দা খেতে বসে গেছে। আমাকে দেখেই বলল, "ইলিশ মাছটা খেয়ে দ্যাখ অর্ক। বিউটিফুল রান্না। সুরজপ্রসাদ বলল, তোর ইন্দ্রদা নাকি কোনও এক দিদিমণিকে দিয়ে রান্না করিয়ে এনেছে। জানিস, দিদিমণিটা কে?"

'তোর ইন্দ্রদা' কথাটা শুনে হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। সুজয়দার স্বভাবই এই রকম। ঠেস দিয়ে কথা বলা। তবুও রাগটা প্রকাশ করলাম না। ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, "তোমার অত জানার দরকারটা কী। রান্না করিয়ে এনেছে। চুপচাপ খেয়ে উঠে যাও।"

"না, মানে অনেক কথাই তো শুনি আজকাল ইন্দ্র চ্যাটার্জিকে নিয়ে। তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"কী শুনলে আবার ইন্দ্রদাকে নিয়ে?"

"সময় এলে সবই জানতে পারবি। ইউনিয়নের ইলেকশনটা আসতে দে। গত বার আমাদের ভবানীদার ওপর খুব টেম্পার নিয়েছিল ইন্দ্র চ্যাটার্জি। এ বার তো শুনলাম ক্যান্ডিডেট হবে। তখন জি এমের চামচেগিরি করা বের করে দেব।"

ইন্দ্রদার ওপর সুজয়দার প্রচণ্ড রাগ। ওই ভবানীদার সঙ্গে ঝামেলাটার পর থেকে। আমরা সবাই সেটা জানি। তাই প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্যই বললাম, "সুজয়দা প্লিজ, তোমার ইউনিয়ন আর পলিটিক্সের কথাবার্তা এখন একটু বন্ধ রাখবে? পেট চুঁইচুঁই করছে। শান্তিতে খেতে দাও।"

আমার কথায় ঝাঁঝ লক্ষ করে সুজয়দা চুপ করে গেল। সুরজপ্রসাদ ভাতের থালা এনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি খেতে শুরু করলাম। অন্যদিন আলুসেদ্ধ, ডাল আর পোনা মাছ কপালে জোটে। আজ বাড়তি আইটেম সর্ষে ইলিশ। তাই অমৃত মনে হতে লাগল। প্রায় বছর খানেক হল, বাড়িতে দুপুরের খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। নিজের তো নয়, অন্যর বাড়িতে থাকি। ভাত বেড়ে দেওয়ার মতো লোক পর্যন্ত নেই। অফিসে যতক্ষণ থাকি, বাড়ির কথা ভুলে থাকি। সত্যি বলতে কী, বাড়ি না বলে ওটাকে মেস বলাই ভাল।

খাওয়া শেষ করে সুজয়দা উঠে দাঁড়াল। বললাম, "চললে?"

"যাই। দেখি, ইন্দ্রদা যদি ওভারটাইম করতে বলে, থাকব।"

সুজয়দা বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ক্যান্টিনে এসে বসলেন ইন্দ্রদা। হাতমুখ ধুয়ে বললেন, "কাজটা ওরা ভাল করল না, বুঝলি অর্ক? বউদের জন্য আমাদের কয়েকজন স্টাফ সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারে।" তার মানে, টালিগঞ্জে অবরোধের কথা এখনও ইন্দ্রদার মাথা থেকে যায়নি।

"কিছু শুনলেন নাকি?"

"হ্যাঁ রে, মেট্রো ভবনে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল, রেল মিনিস্টার কলকাতায় আছেন। ওঁর কানে অবরোধের কথা গেছে। কর্তাদের উনি বলেছেন, ট্রেন চলাচল আগে শুরু না করলে কারও কথা শুনবেন না।"

"ঠিক বলেছেন।"

"দুঃখ হয় কেন জানিস, কয়েকটা বাজে লোকের জন্য আমাদের মেট্রো কালচারটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সেদিন দেখলাম, ভবানী আমাদের স্টেশনে এসে নানা রকম খুঁত ধরছে। ও থাকতে থাকতে এসকালেটারটা বন্ধ হয়ে গেল। কন্ট্র্যাক্টরকে খবর দিলাম। ওরা এসে সব

দেখে বলল, কিচ্ছু হয়নি। বোতাম টিপে কে যেন বন্ধ করে রেখেছিল। এই যে অফিস আওয়ার্সে এসকালেটর ঘণ্টা দুয়েক বন্ধ রইল, তার জন্য গালাগালটা খেলাম আমি। আমাকে খাস্তা করে কী লাভ হল ভবানীর?

"ইন্দ্রদা, টালিগঞ্জে আজ গণ্ডগোলের পিছনেও কি ইউনিয়নের পলিটিক্স?"

"জানি না। কিছুই অসম্ভব নয়। বোসদা বিকেলের ডিউটিতে আছেন। উনি এলে সব জানা যাবে। অন্য দিন দু'টোর আগেই এসে যায়। আজ বোধহয় কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন।"

চক্রবর্তীদা আমাদের স্টেশনের আরেকজন সিনিয়র ট্রাফিক সুপারভাইজার। উনি থাকেন টালিগঞ্জের কোয়ার্টার্সে। নিবারণদাদেরই বয়সী। ওঁর মুখে অবশ্য আমরা কোনওদিন জলকষ্টের কথা শুনিনি। ইন্দ্রদাকে বললাম, "ঠিক বলেছেন। সুজয়দা খুব গুলতাপ্পি মারে। আসল ঘটনাটা চক্রবর্তীদার মুখেই জানা যাবে।"

সুরজপ্রসাদ ভাতের থালা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। আমার কথা শেষ হতেই বলল, "দশ-বারো পিস মাছ বেঁচে গেছে। ভাত দিচ্ছি অর্কবাবু। খেয়ে নিন। খাওয়ার লোক আর নেই।"

বললাম, "আমাকে আর দিও না। পেট ভরে গেছে। ইন্দ্রবাবুকে দাও।"

সুরজপ্রসাদ ইন্দ্রদার পাতে ভাত ঢেলে দিতেই হাঁ হাঁ করে উঠে উনি বললেন, "অর্ক, তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বুড়ো হতে চললাম। এত ইলিশ খেলে যে পেট গরম হয়ে যাবে।"

বললাম, "একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। রোজ রোজ তো আর যতীন সাহা মাছ সাপ্লাই করবে না।"

"না রে অর্ক। হার্টের প্রবলেম শুরু হয়েছে। মেট্রো রেলে আমাদের বয়সী অনেকেরই দেখছি হার্টের অসুখ হয়ে যাচ্ছে। পাতালে কাজ করার জন্যই এটা হচ্ছে বোধহয়। গুরু ভোজন করা ঠিক না।" বলেই মাছের দুটো টুকরো ইন্দ্রদা আমার পাতে তুলে দিলেন।

খাওয়া শেষ করে আমরা দু'জন ওপরে উঠে এলাম। ইন্দ্রদা এস এস-দের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি সিগারেট খাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। এই ক'দিন আগেও আমার কোনও বদভ্যাস ছিল না। আমাকে সিগারেটের নেশা ধরিয়েছে সীতাংশু। তবে দিনে দু'তিনটের বেশি কখনও খাই না। একটা প্যাকেট কিনলে আমার দিন তিনেক চলে যায়।

অটো রিকশা স্ট্যান্ডের পাশেই একটা সিগারেটের দোকান আছে। পানও বিক্রি হয়। ইন্দ্রদার জন্য পান নিয়ে গেলে খুশি হবে। সে কথা ভেবে পানের দোকানের দিকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামতেই জোর ঝটকা। দেখি, প্রিয়াঙ্কা আর সেই মেয়েটা গেটের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, "অর্কদা একটু শুনবেন? আমরা খুব বিপদে পড়ে গেছি। একটু সাহায্য করবেন?"

৩

বেলা আড়াইটার সময় বাড়িতে ফিরে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল ঝুলন। আমাকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার অর্কদা? আজ এত তাড়াতাড়ি?"

ওর জিজ্ঞেস করার ধরন দেখে রাগ হয়ে গেল। আমি যখনই ফিরি না কেন, তাতে ওর কী? ওকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। ঝুলনের সঙ্গে ফালতু কথা বলার কোনও মানে হয় না। বুলুদি যে দিন আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এল, সে দিনই প্রথম দেখার পর ও বলেছিল, "তুমি যে বলেছিলে দিদিভাই, তোমার ভাই খুব স্মার্ট? দেখে তো আমার তা মনে হচ্ছে না।" আমি কড়া চোখে তাকিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই ঝুলনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ। সেদিনই শুনি, ও দিবাকরদার বোন। দিবাকরদার এক ভাইও আছে। তবে সে বাইরে থাকে।

চেতলার এই বাড়িটা আসলে দিবাকরদার। ছোট-বড় মিলিয়ে আটখানা ঘর। মানুষ মোটে চারজন। আমার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক বুলুদি মারফত। আমাদের নিজেদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ভগীরথপুরে। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, তখন আমার মা হঠাৎ মারা যান। মায়ের কাজে ভগীরথপুরে গেছিলেন অনেক আত্মীয়স্বজন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুলুদির মা। আমার দূর সম্পর্কের এক জেঠিমা। কাজ মিটে যাওয়ার পর সেই জেঠিমাই বাবাকে বললেন, "রথীন, এখানে পড়ে থাকলে অর্ক মানুষ হবে না। তুমি রাজি হলে, আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি। বেহালায় আমার অত বড় বাড়ি। আমার মেয়েটা একা। কথা বলার পর্যন্ত লোক পায় না। ভাইবোনে একসঙ্গে থাকবে। তোমার ছেলে না হয় ওখানেই পড়াশুনো করবে।"

বাবা প্রথমে গররাজি ছিলেন। পরে বুলুদির কান্নাকাটি দেখে রাজি হয়ে যান। আমাকে ছেড়ে বুলুদি কলকাতায় ফিরতে চায়নি। সেই সময় থেকে বুলুদি আমার গার্জেন। বয়সে আমার থেকে বারো বছরের বড়। একটা সময় আমি কথা না শুনলে কান ধরে ওঠবোস করিয়েছে। আমি বেহালায় আসার পরই জ্যাঠাবাবু মারা যান। বুলুদি পাড়ায় নানা কীর্তি করে, শেষে বছর সাতেক আগে বিয়ে করে দিবাকরদাকে। চলে আসে চেতলায়। তখন বেহালার বাড়িতে থাকতাম আমি আর জেঠিমা। কলেজ থেকে পাশ করে বেরনোর আগে পাড়ায় এমন একটা ঘটনা ঘটল, বুলুদি জোর করে আমাকে চেতলায় নিয়ে এল। সেই থেকে আমি এ বাড়িতে। আমাকে চলতে হচ্ছে ঝুলনের মর্জিতে।

প্রশ্নটা করে ঝুলন চলে যায়নি। ঘরে ঢুকে জামা খোলার সময় দেখতে পেলাম, ও দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ টিপে হাসছে। জামা-প্যান্ট বদলানোর সময় কেউ এসে দাঁড়াক, আমার তা পছন্দ হয় না। প্রায় দিনই দেখি, ঠিক এই সময়টায় এসে ঝুলন ফালতু কথা শুরু করে। কোনও কড়া কথা ওকে বলা যাবে না। বুলুদি অসন্তুষ্ট হয়। বুলুদিকে ও হাত করে ফেলেছে। এ বাড়িতে এখন আমার থেকে ঝুলনের গুরুত্ব বেশি।

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, "কিছু বলবি?"

"হ্যাঁ। দিদিভাইয়ের খোঁজে এখনই এক ভদ্রলোক আসবেন। আমি আর নামতে পারব না। সদর দরজাটা তুমি খুলে দিও।"

মেয়েটার স্পর্ধা দেখে আমার ফের রাগ হয়ে গেল। চিলেকোঠায় ও দিবানিদ্রা দেবে। আর আমাকে দরজা খোলার জন্য বসে থাকতে হবে। কথাটা বলেই ঝুলন মিটিমিটি হাসছে। এই হাসিটা আমি সহ্য করতে পারি না। ও দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, "আর কিছু বলবি?"

"দিদিভাই এসেই তোমার খোঁজ করছিল। উপরে গিয়ে একবার কথা বলে এসো।"

"কখন ফিরেছে বুলুদি?"

"বেলা আড়াইটায়। এখন খুব ব্যস্ত। সামনের মাসে ট্রুপ নিয়ে বাংলাদেশ যাবে। সেই ব্যাপারেই আজ কথা বলতে আসবেন একজন।"

আমাদের বাড়িতেই নাচের স্কুল খুলেছে বুলুদি। সুরঙ্গনা। প্রায় শ'খানেক মেয়ে নাচ শিখতে আসে সারা সপ্তাহে। বুলুদি নিজে নাচ শিখত অমলাশঙ্করের কাছে। চমৎকার নাচে। নিজের কোনও সন্তান হয়নি। হাতে অঢেল সময়। সংসারও দেখতে হয় না। একতলায় বড় ড্রয়িংরুমে বছর পাঁচেক আগে স্কুলটা চালু করেছে। চেতলার তো বটেই, অন্য জায়গা থেকেও নানা বয়সী মেয়েরা নাচ শিখতে আসে। সন্ধেবেলায় আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ রাখতে হয়। ঘুঙুরের আওয়াজে আমি অন্য কোনও কাজই করতে পারি না।

গত পুজোর সময় বুলুদি নাচের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রথম দিল্লিতে প্রোগ্রাম করতে যায়। দিন দশেকের জন্য। ঝুলনও সঙ্গে গিয়েছিল। দিল্লিতে আমার কখনও যাওয়া হয়নি। আমাকে বললে যেতাম। যাতায়াতের জন্য আমার পয়সা খরচ হত না। রেল থেকে পাস পেয়ে যেতাম। কিন্তু বুলুদি তখন বলল, "তুই গেলে বাড়ি পাহারা দেওয়ার লোক থাকবে না। দিবাকরের ওপর ভরসা করে বাড়ি ফেলে যাওয়া যাবে না।" এই কথা শোনার পর আমার দিল্লি যাওয়ার ইচ্ছেটা চলে যায়।

দিল্লিতে বাঙালিদের পুজোয় ওই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সুখবিন্দর সিং ফ্লোরা নামে এক ভদ্রলোক। বুলুদি আর দিবাকরদা তাঁকে ডাকেন সুখিজি বলে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নানারকম ব্যবসা করেন। কোনও এক পার্টিতে সুখিজির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল দিবাকরদার, ভদ্রলোক খুব শান্ত স্বভাবের। সুন্দর কথা বলেন। আগে মাসে অন্তত একবার এ বাড়িতে আসতেন। এখন ঘনিষ্ঠতা বেশি বুলুদির সঙ্গে।

"তোমার একটা চিঠি আছে।" কথাটা বলেই ঝুলন একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

বললাম, "টেবিলে রাখ। পরে দেখে নেব।"

নিশ্চয়ই বাবার চিঠি। বাবা ছাড়া আমাকে চিঠি দেওয়ার আর কেউ নেই। পরে পড়ে নিলেও চলবে। তার আগে ভাল করে গা ধুয়ে নেওয়া দরকার। তোয়ালে নিয়ে ঘর থেকে বেরোব, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। ঝুলন সিঁড়িতে পা বাড়াতে গিয়েও পিছিয়ে এসে সদর দরজাটা খুলে দেওয়ার জন্য হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তুমি কলঘরে যাও। আমি দেখছি ভদ্রলোক এলেন কি না।"

আগে এ বাড়িতে কলঘর বলতে টিনের চাল দেওয়া ছোট্ট একটা ঘর ছিল। ভেতরে ছোট্ট একটা চৌবাচ্চা। নাচের স্কুলটা হওয়ার পর, সেটাকে ভেঙে একটু বড় করা হয়েছে। এখন একটা দরজাও আছে। নাচের স্কুলের মেয়েরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে এই কলঘর ব্যবহার করে। প্রায় দিন বিকেলের দিকে এই সময়টায় চৌবাচ্চায় জল থাকে না। এটাও ঝুলনের শয়তানি। আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। আজ অবশ্য কলঘরে ঢুকে দেখলাম, গা ধোয়ার মতো জল অবশিষ্ট আছে। মুহূর্তের মধ্যে ঝুলনের উপর বিরক্তিটা চলে গেল। মগ দিয়ে গায়ে জল ঢালতে লাগলাম।

ঝুলন উঠোনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। "ইস, কী সুন্দর লাগছে রে তোকে।" "অনেকদিন পর এলি।" "তোর বরও এসেছে নাকি?" কথা শুনেই বুঝলাম, যে এসেছে সে রেখা। ঝুলনের বন্ধু। দুর্গাপুর লেনের দিকে থাকে। মাস ছয়েক আগে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জনে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। তার মানে, যে

ভদ্রলোকের আজ আসার কথা আছে, তাকে আপ্যায়ন করার জন্য আমাকে দরজা খুলে বসে থাকতে হবে। ঝুলনরা এই যে আড্ডায় বসল, সাতটা সাড়ে-সাতটার আগে আর নীচে নামবে না। পরের বাড়িতে থাকার কত ঝঞ্ঝাট এখন তা বুঝতে পারি।

গা মুছতে মুছতে কলঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকতে আমার ভাল লাগে। নিজেকে ফিটফাট মনে হয়। গায়ে একটু পারফিউম স্প্রে করে নিই। শরীর থেকে তখন সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। এই ক'দিন আগে গন্ধটা পেয়ে বুলুদি নীচে নেমে এসে জানতে চেয়েছিল, "তুই কি পারফিউম ইউজ করিস রে ভাই?"

বলেছিলাম, "ব্রুট।"

"আমার জন্য একটা এনে দিবি?"

"ব্রুট তো ছেলেদের জন্য।"

"আমার জন্য নয়। সুখিজিকে প্রেজেন্ট করব। লোকটা এত করছে আমার জন্য। ওকে কিছু দেওয়া উচিত।"

সুখিজির জন্য একটা ব্রুটের বোতল এনে দিয়েছিলাম পর দিন। তার বদলে বুলুদি একটা নীল রঙের পাঞ্জাবি উপহার দিয়েছে। একদিন পরেছিলাম। ঝুলন ফুট কেটেছিল, "তোমাকে ঠিক সুনীল শেট্টির মতো লাগছে।" শুনে এত রাগ হয়েছিল যে, মাঝে ওই পাঞ্জাবিটা বেরই করিনি। ঘরে ঢুকে কী মনে হল আজ, ওই নীল পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। হাতে কোনও কাজ নেই। ডিভানে শুয়ে এখন নিশ্চিন্তে বাবার চিঠিটা পড়া যাবে।

কেন জানি না, মাস আটেক আগে থেকে বাবার সব ক'টা চিঠিতে শেষের দিকে একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি , "সম্ভব হইলে নিজে কোনও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া নিও।" এ কথাটা কেন লিখছেন, আমি বুঝতে পারছি না। বছর খানেক আগে বাবা একদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। এ বাড়িতে ছিলেন। বুলুদির কোনও কিছু হয়তো পছন্দ করেননি। তাই চাইছেন না, আমি এ বাড়িতে আর থাকি। বুলুদির লাইফ স্টাইল আমারই খারাপ লাগে। অনেক ঘটনার আমি সাক্ষী। সে সব কথা বাবা জানতে পারলে, এ বাড়িতে একটা দিনও আমাকে থাকতে দিতেন না।

টেবিলের উপর থেকে চিঠিটা তুলে আনতেই অবাক হয়ে গেলাম। গোলাপি রঙের খাম, আগে লক্ষ করিনি। তা হলে বাবার চিঠি নয়। কে পাঠাল এই চিঠি? কৌতূহলে তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। গোলাপি কাগজে, মেয়েলি হাতের লেখা। দ্রুত পড়তে শুরু করলাম।

"প্রিয় অর্কদা,

আপনি আমাকে চেনেন। তবু ইচ্ছে করে নিজের পরিচয়টা এখন দিচ্ছি না। প্রায় দিনই অপনাকে দেখি। সত্যি বলতে কী, আপনাকে আমার ভী-য-ণ ভাল লাগে। সুরঙ্গনার বার্ষিক উৎসবে অহীন্দ্র মঞ্চে আপনি ঠিক আমার পাশেই বসেছিলেন। সেদিন আমি অনুষ্ঠানের কিচ্ছু দেখিনি। সারাক্ষণ আপনাকেই দেখেছি। আপনাকে ছাড়া আমি অন্য কোনও ছেলের কথা ভাবতেই পারি না। মাকে আপনার কথা বলেছি। মা বলেছে, ভাললাগা আর ভালবাসার মধ্যে নাকি বিস্তর ফারাক আছে। তফাতটা কী, তা বোঝার মতো বয়স নাকি এখনও আমার হয়নি।'

'যাক সে কথা। যে কারণে এই চিঠিটা লিখছি, এখন সেই প্রসঙ্গে আসি। সুরঙ্গনা নিয়ে একদিন বাবা আর মায়ের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। কিছু কথা আমার কানে আসে, যা কি না

আমার ভাল লাগেনি। মা বলছিল, সুখবিন্দর সিং নামে এক পঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায়দিনই আপনার দিদি—সুমিতাদিকে হোটেল দিন-রাতে দেখা যাচ্ছে। দু'জনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। এ কথাগুলো আপনাকে জানানোর জন্যই এই চিঠি লিখলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি আগ্রহী। রোজ আটটা কুড়ির ট্রেনে আমি কলেজে যাই। একটু চেষ্টা করলেই আমার পরিচয়টা আপনি জানতে পারবেন। —ইতি, আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।"

চিঠিটা পড়ে আমি কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইলাম। না, বুলুদির নামে বদনাম রটার জন্য না। ওটা বেহালার বাড়ি থেকে শুনে আসছি। আমি জানি, জগতে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়। অবাক লাগল, যে মেয়েটা চিঠি লিখেছে, তার কথা ভেবে। মেয়েটা নিশ্চয়ই নাচের স্কুলের ছাত্রী। কে হতে পারে? অহীন্দ্র মঞ্চে একবারই সুরঙ্গনার বার্ষিক উৎসব হয়েছে। আমার এক পাশে বসেছিলেন নিত্যানন্দ মেডিকেল হল-এর মালিক ষষ্ঠীপদবাবু। অন্য পাশে ঝুলন। তা হলে চিঠিতে কেন মেয়েটা লিখল, আপনি ঠিক আমার পাশেই বসেছিলেন? আমার স্মৃতিশক্তি প্রচণ্ড ভাল। চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম কে হতে পারে এই মেয়েটি?

মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করার মাঝেই হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দরজা খুলে দিতেই মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি সুমিতা বাসুর বাড়ি?

ঘাড় নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ, আপনি?"

"আমি সোমনাথ চট্টরাজ। উনি আছেন? আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।"

"আসুন।"

ভদ্রলোককে ভেতরে নিয়ে এসে ড্রয়িং রুমে বসালাম। তারপর বললাম, "আপনি বসুন। আমি সুমিতাদিকে ডেকে দিচ্ছি।"

pathagar.net

সোমনাথবাবু সোফায় বসতেই আমি উপরে উঠে গেলাম। বুলুদি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হালকা মেক-আপ করে নিচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, "আমি আসছি। ততক্ষণ তুই লোকটার সঙ্গে একটু গল্প কর।"

আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই বুলুদি ফের বলল, "ভাই, তুই কি আজ বাড়িতেই থাকবি?"

বললাম, "হ্যাঁ। কেন গো?"

"সুখিজি আসবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। আমাকে বলছিল, তোর সঙ্গে নাকি কী একটা জরুরি দরকার আছে।"

"আমার সঙ্গে?"

"এত অবাক হচ্ছিস কেন?" বুলুদি যেন একটু চটে গেল, "লোকটা তোর হেল্প চাইবে। পারলে করে দিস।"

বুলুদির মেজাজ দেখে আমি আর কথা বাড়ালাম না। নীচে নেমে এলাম। ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে বুলুদির অনেক ছবি টাঙানো আছে। কোনওটা নাচের ভঙ্গিতে। কোনওটা বিখ্যাত লোকেদের সঙ্গে। চট্টরাজ ঘুরে ঘুরে তা দেখছেন। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, চুপ করে বসে থাকা বোধহয় অভ্যাসে নেই। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উনি বললেন, "সুমিতাদেবী যে এত বড় ড্যান্সার, তা জানতামই না।"

কথাটা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বাড়িয়ে বলছেন কি না বুঝতে পারছি না। কেননা ছবি দেখে চোখ-মুখে মুগ্ধতার ছাপটা বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। বললাম, "আপনার সঙ্গে আগে আলাপ হয়নি?"

"না। অবশ্য না বলাটাও ঠিক না। আলাপটা সামনাসামনি হয়নি। যা কিছু কথাবার্তা, ফোনে হয়েছে। আমার ব্যাপারে উনি খোঁজ করেছিলেন রেজওয়ানা বন্যা চৌধুরীর কাছে। চেনেন? বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা। শুধু বাংলাদেশই বা বলব কেন, দুই বাংলা মিলিয়ে এমন গায়িকা ক'জনই বা আছেন? তা, বন্যাদির কথা শুনে আমি নিজেই ফোন করলাম এখানে। আপনার দিদি আজ আসতে বললেন।"

ঠিক বুঝতে পারছি না, চট্টরাজ কী কারণে এসেছেন। একটু আগে ঝুলন বলেছিল, বুলুদিদের বাংলাদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলার জন্য ভদ্রলোক আসবেন। চট্টরাজ কি তা হলে বাংলাদেশে থাকেন? প্রশ্নটা করতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। বছরে অন্তত ছ'টা মাস তো ও দেশেই কেটে যায়। দু' দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যে অনুষ্ঠানগুলো হয়, তার বেশিরভাগের পিছনেই আমি থাকি। এটাই আমার ব্যবসা বলতে পারেন। এ দেশের শিল্পী নিয়ে ও দেশে যাওয়া। প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা। আবার ও দেশের শিল্পীদের নিয়ে এ দেশে আসা। এই আমার পেশা।"

"বাঃ, খুব সুন্দর পেশা তো আপনার।"

"বলতে পারেন। এই তো সেদিন ভাষা শহিদ দিবসের প্রোগ্রামের জন্য একদল নতুন ছেলে-মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে গেছিলাম। যাদবপুর অঞ্চলের সব ছেলে-মেয়ে। এমন গান গেয়েছে, ঢাকার তিনটে বড় কাগজে পরদিন বিরাট বিরাট তাদের ছবি। সেপ্টেম্বরে ওদের নিয়ে ফের ঢাকায় প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি। তার মাঝে আপনার দিদি আমাকে ডেকে পাঠালেন। মনে হচ্ছে, সুরঙ্গনার প্রোগ্রামও ক্লিক করে যাবে। দেওয়ালে যে সব ছবি দেখছি। তার কপি আপনাদের কাছে আছে? যাওয়ার আগে আমাকে একটা বুকলেট তৈরি করতে হবে। পাবলিসিটির জন্য, বুঝলেন?"

আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল বুলুদি। চট্টরাজ দু'হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার ম্যাডাম, আমিই সোমনাথ চট্টরাজ।"

এরপর আমার বসে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। বুলুদি পছন্দ নাও করতে পারে। তাই উঠে পড়লাম। মনে হল, লোকে যাই বলুক, বুলুদির এলেম আছে। ট্রুপ নিয়ে যদি বাংলাদেশ যেতে পারে, সুরঙ্গনার নামটা খুব ছড়িয়ে পড়বে। লোক ধরে ধরে আজ বুলুদি তো একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে সুরঙ্গনাকে। দিবাকরদার কোনও ভূমিকা নেই। আর আমি তো কাউকেই চিনি না। বুলুদি নিজে খেটে স্কুলটাকে দাঁড় করিয়েছে। অনন্যা আর সহেলি বলে আরও দুটো মেয়ে সঙ্গে আছে। আলিপুর রোডের দিকে থাকে। মমতাশঙ্করের দল ছেড়ে বুলুদির সঙ্গে আছে ওরা প্রায় শুরুর দিন থেকে। অনন্যা বিবাহিতা। সহেলি কলেজে পড়ে। দু'জনেই নাচ শেখায় বাচ্চাদের।

নিজের ঘরে এসে বসার পরই হঠাৎ সহেলির নামটা মনে গেঁথে গেল। এই মেয়েটাই কি আমাকে উড়ো চিঠি পাঠিয়েছে? মেয়েটাকে রোজ কালীঘাট স্টেশন দিয়ে কলেজে যেতে দেখি। আরে, এই মেয়েটাই তো অহীন্দ্র মঞ্চের প্রোগ্রামে ষষ্ঠীপদবাবুর পাশে বসে ছিল। বুলুদি সে দিন ওকে স্টেজে উঠতেই দেয়নি। মেয়েটা লিখেছে, একটু চেষ্টা করলেই আমাকে চিনতে পারবেন। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এই সহেলিই আমাকে চিঠিটা লিখেছে। মেয়েটা মাঝে

মধ্যেই অপ্রয়োজনে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। বাচ্চা মেয়ে। এর মধ্যেই আমার সম্পর্কে এত কিছু ভেবে নিয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বের করে ছিঁড়ে ফেললাম। এই চিঠি বুলুদির হাতে গেলে, কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার জীবনে এই সব ফালতু ঘটনা কেন ঘটছে বুঝতে পারছি না। দুপুরে স্টেশনে নিবারণদার মেয়ে সুজাতা একটা মেয়ের কথা বলল, শ্রীপর্ণা। সে নাকি আমার জন্য পাগল। মেয়েটাকে চিনি না। তাকে নিয়ে ভাবার কোনও কারণই দেখছি না। তারপর কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো মেয়ের চিঠি। বিরক্তিকর। প্রিয়াঙ্কার ক্ষমা চাওয়াটা অবশ্য অবাক করার মতো। হঠাৎ কী এমন ঘটল, ও চিঠি দিয়ে ক্ষমা চাইল! পরে আমার কাছে পুরোটাই ন্যাকামি বলে মনে হয়েছে। সত্যিই যদি ও অনুতপ্ত হত, তা হলে অন্য একটা মেয়ের হাত দিয়ে ওই খাম পাঠাত না। নিজে এসে সরাসরি কথা বললে আমি খুশি হতাম।

বিকেলের দিকে ওরা দু'জন যখন ব্যাগের খোঁজে এল, তখনও প্রিয়াঙ্কা প্রথমে কথা বলেনি। ওর বন্ধুটাই বলেছিল, "আমাদের একটু সাহায্য করবেন?" পিছনে প্রিয়াঙ্কাকে দেখে আমার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছিল। নিরস গলায় বলেছিলাম, "আপনারা দাঁড়ান। ব্যাগটা আমি এনে দিচ্ছি।"

মেয়েটা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে উঠেছিল , "ব্যাগটা পেয়েছেন? উফ্ বাঁচালেন। অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল ওর মধ্যে।"

কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। তবুও বলেছিলাম, "এতই যখন দরকারি, তখন ব্যাগটা ফেলে গেছিলেন কেন পেপসি বুথে?"

"পেপসি বুথে পড়ে ছিল, তাই না? আমিও প্রিয়াকে বললাম, নিশ্চয়ই ওখনে ফেলে রেখে এসেছিস। আসলে খুব টেনশনের মধ্যে ছিলাম আমরা। বুঝতেই পারছেন, কেন টেনশনে ছিলাম সারাটা দিন। তারপর এখানে এসে দেখি, ট্রেন বন্ধ।"

মেয়েটাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "আপনারা একজন কেউ আমার সঙ্গে আসুন। নীচ থেকে ব্যাগটা নিয়ে যান।"

প্রিয়াঙ্কাকেই ঠেলে পাঠিয়েছিল ওর বন্ধুটা। ওকে আমি কোনও কথা বলার সুযোগ দিইনি। ব্যাগটা হাতে পেয়ে ও একবার মুখ তুলে শুধু বলেছিল, "থ্যাঙ্কস।"

বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রিয়াঙ্কার কথাই ভাবতে লাগলাম। ও কি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়? মাথায় কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই বোধহয়। কী আছে আমার? সীতাংশুর মতো আমি হ্যান্ডসাম নই। সুমন্ত্রর মতো গান গাইতে পারি না। একটা সময় মুখের আগে আমার হাত চলত। কোনওদিন মারপিট না করলে আমার মনে হত, কী যেন বাকি রয়ে গেল। বেহালায় আমার বদনাম হয়ে গেছিল। অর্ধেকটা বুলুদির জন্য। অর্ধেকটা আমার বদমেজাজের কারণে। শেষের দিকে শুক্লাকে জড়িয়ে ওই ঘটনাটা না ঘটলে আমি হয়তো আর বদলাতামই না। পাড়ায় অমিয় ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ মিশতও না। প্রিয়াঙ্কা বা সহেলি এ সব বৃত্তান্ত জানে না। জানলে চিঠি দেওয়ার বোকামি করত না ওরা।

"অর্কদা, চা খাবে?"

চোখ খুলে দেখি ঝুলন। হাতে চায়ের কাপ। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বাড়িতে চা, এক আধদিন জোটে। ঝুলনের মেজাজ ভাল থাকলে। চায়ের কাপটা আমার হাতে দিয়ে ও বলল,

"অর্কদা, তোমার সঙ্গে রেখা একটু কথা বলতে চায়। ডাকব?'

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "ডাক।"

সঙ্গে সঙ্গে রেখা ঘরে ঢুকে বলল, "কেমন আছেন, অর্কদা?"

"ভাল।"

হলুদ রঙের তাঁতের শাড়িতে খুব সুন্দর লাগছে রেখাকে। বিয়ের পর ওর চেহারাটাই কেমন যেন পাল্টে গেছে। চেয়ারে বসে ও বলল, "একটা ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।"

"না, না। বলো।"

"আমার শ্বশুরমশাই একটা জিনিস জানতে চেয়েছেন। আপনাদের মেট্রো রেলের ব্যাপারেই। কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া থেকে উনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। দমদম থেকে ট্রেন বদলে পাতাল রেলে। আপনাদের কালীঘাট স্টেশনে পটুয়াদের আঁকা কিছু পৌরাণিক ছবি বোধহয় টাঙানো আছে। তার একটা ছবি সম্পর্কেই উনি ডিটেল জানতে চান।"

"তোমার শ্বশুরমশাই কী করেন?"

"আগে নৈহাটি কলেজে পড়াতেন। এখন রিটায়ার্ড। রিসেন্টলি একটা বই লেখা শুরু করেছেন। বরাহ অবতার নিয়ে। আপনাদের স্টেশনে বরাহ অবতারের একটি ছবি দেখে গেছিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের মতে, ওই ছবিটাই বরাহ অবতারের একেবারে নিখুঁত ছবি। আর কোথায়ও এ রকম ছবি নেই। উনি জানতে চেয়েছেন, কোত্থেকে আপনারা ওই ছবিটা পেয়েছেন? কে এঁকেছেন? বরাহ অবতারের ওই ছবিটার কোনও ফটো তোলা যাবে কি না?"

চট করে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে সারি সারি অনেক ছবি আছে। রোজই তা দেখি। কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা ছবির মতো। মেট্রো রেলের জন্মলগ্ন থেকেই ওগুলো আছে। কিন্তু কে এঁকেছিলেন, কোত্থেকে আইডিয়া পেয়েছিলেন, এখন এ সব বলা কঠিন। ইন্দ্রদা, চক্রবর্তীদাদের মতো সিনিয়র স্টাফরা হয়তো বলতে পারবেন। ওরা অনেকদিন ধরে মেট্রো রেলে আছেন। বললাম, "আমার ঠিক জানা নেই। তবে জেনে বলে দিতে পারি। তুমি এখন কতদিন এখানে থাকবে?"

রেখা লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল। তা দেখে ঝুলন ফিক করে হেসে বলল, "মাস পাঁচেক তো বটেই। মা হতে এসেছে।"

কথাটা আমাকে জানানোর কোনও দরকারই ছিল না। তবু বলে ঝুলন মিটিমিটি হাসতে লাগল। এই কারণে ওকে আমি পছন্দ করি না। অস্বস্তি কাটানোর জন্য রেখাকে আমি বললাম, "আমি দু'তিনদিনের মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দেব, কেমন?"

রেখা মুখ তুলে বলল, "এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই অর্কদা। আপনি স্বচ্ছন্দে আরও সময় নিতে পারেন। আমার শ্বশুরমশাই সেদিন আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন। বললেন, কালীঘাট স্টেশন দিয়ে এতবার যাতায়াত করেছ, অথচ কোনওদিন ইন্টারেস্ট জাগেনি, কেন ওই ছবিগুলো টাঙানো রয়েছে? তখনই আমি আপনার কথা বললাম। উনি বললেন, ছেলেটার কাছে জেনে নিও তা হলে। ওরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে।"

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টার ঘণ্টা বাজল। রেখা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

"যাই অর্কদা। অনেকক্ষণ আড্ডা মেরে গেলাম। আজ আবার আমার বরের আসার কথা আছে। এসে আমাকে দেখতে না পেলে চটে যাবে। চল ঝুলন। আমাকে একটু এগিয়ে দিবি।"

দু'জনে বেরিয়ে যাওয়ার পর টিভি চালিয়ে অ্যাকশন চ্যানেলে সিলভেস্টর স্ট্যালোনের একটা ছবি দেখছি, এমন সময় একটা বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বুলুদি ঘরে ঢুকে বলল, "একটা কাজ করে দিবি ভাই। এই মেয়েটা থাকে পীতাম্বর ঘটক লেনে। বাড়ির ঠিকানা সাতের এক। একে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবি?"

"সঙ্গে কেউ আসেনি?"

"ওর মা দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। হয়তো জানত না, নাচের স্কুল আজ বন্ধ। তুই গিয়ে দিয়ে আয় তো ভাই।"

"যাচ্ছি।" বলে স্যান্ডেল গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। টিভি-তে স্ট্যালোনের সঙ্গে ঝাড়পিট চলছে জেলের অন্য কয়েদিদের। তবুও উঠে আসতে হল। বুলুদি কিছু বললে আমি না করতে পারি না। দুর্গাপুর ব্রিজের কাছে বড় রাস্তায় পৌঁছে মেয়েটার হাত ধরলাম। ও হাত ছাড়িয়ে নিল। দেখে বেশ মজা লাগল। একাই বড় রাস্তা পার হতে চাইছে। ন' দশ বছর বয়স। এই বয়স থেকে স্বাবলম্বী হওয়া ভাল লক্ষণ। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?"

"পিঙ্কি'।" বলেই ও গম্ভীর হয়ে হাঁটতে লাগল।

পোশাক-আসাক দেখে বেশ সচ্ছল ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। ওর ভারিক্কি হওয়ার চেষ্টা দেখে হাসি পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বাবা কী করেন পিঙ্কি।"

"জানি না। আমি মায়ের সঙ্গে থাকি।"

উত্তরটা শুনেই থমকে গেলাম। তার মানে, পিঙ্কির বাবা পীতাম্বর ঘটক লেনের বাড়িতে থাকেন না। নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনও অশান্তি আছে। আর কোনও প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। মেয়েটা যে ভাবে কথা বলছে, হয়তো বলে বসবে "আপনার কী দরকার।" মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা পীতাম্বর ঘটক লেনে পৌঁছে গেলাম। সাতের এক বাড়িটা চারতলা। পিঙ্কিদের ফ্ল্যাট একতলায়। গেটের সামনে দাঁড়াতেই পিঙ্কি বলল, "আঙ্কল, আপনি যান। এই ফ্ল্যাটটাই আমাদের।"

জানলায় দামি পর্দা ঝুলছে। হাওয়ায় পর্দাটা সরে যেতেই ঘরের ভেতর চোখ চলে গেল। এ কী? দিবাকরদা না? পিঙ্কিদের বাড়িতে দিবাকরদা বসে কী করছে? গত দু'তিনদিন দিবাকরদা কলকাতায় নেই। অফিসের কাজে নাকি বাইরে গেছে। তা হলে কি ফিরে এসেছে?

পিঙ্কি কলিংবেল টেপায় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলা। ম্যাক্সি পরে রয়েছেন। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে। নিশ্চয়ই পিঙ্কির মা। আমাকে দেখেই দরজা আড়াল করে বললেন, "আপনি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ইস, ফোন করে দিলেই তো গিয়ে আমি নিয়ে আসতে পারতাম। ভেতরে আসবেন?"

ভদ্রমহিলাকে দেখেই মনে হল, আমি হ্যাঁ বললে অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন। তাই বললাম, "না।" মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল, স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরে দিবাকরদা কেন এই বাড়িতে বসে রয়েছে?

pathagar.net

অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ঠোঙা থেকে কী যেন খাচ্ছে ছট্টু। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে বলল, "অর্কদা, আপনার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। এই নিন আপনার টাকা। আমাকে ঋণমুক্ত করুন।"

ইভনিং ডিউটি দেওয়ার জন্য স্টেশনে ঢুকছি। বেলা পৌনে দু'টো বাজে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছট্টুর ছোলাভাজা খাওয়ার কথা নয়। অটো চালিয়ে রোজগার করার সময়। রাসবিহারীতে অটো ড্রাইভারদের যে ইউনিয়ন আছে, ছট্টু তার প্রেসিডেন্ট। বয়স আমার মতোই। বি কম পাশ। চেষ্টা করেও চাকরি পায়নি। তাই অটো চালাচ্ছে। অফিসে যাওয়া-আসার পথে রোজ এদের সঙ্গে দেখা হয়। তাই খুব চেনা। চেতলা থেকে রাসবিহারীতে আসার সময় অটোতে উঠলে ভাড়া নিতে চায় না।

কয়েকদিন আগে ছট্টু আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। ওর ভাই এম কম পরীক্ষা দেবে। তাই দরকার। সেই টাকাটাই আজ ফেরত দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বললাম, "আজ অটো বের করিসনি?"

"না। কাল লস খেয়েছি। আজ আবার লস খেতে পারব না।"

"লস খেলি কেন? প্যাসেঞ্জার পাসনি?"

ছট্টু হঠাৎই চটে উঠে বলল, "অর্কদা, আপনাদের সুজয়দা কিন্তু একদিন আমাদের কাছে ঝাড় খেয়ে যাবে।"

"কেন?"

"ট্যাক্সিওয়ালাদের চামচাগিরি করছে। কাল দুপুরে দেখি হঠাৎ ট্যাক্সির লাইন পড়ে গেছে এখানে। মেট্রো যে বন্ধ থাকবে, আগে থেকেই সুজয়দা ওদের জানিয়ে রেখেছিল। মেট্রো বন্ধ থাকলে লোকে বাধ্য হয়ে ট্যাক্সিতে চড়বে। আর আমরা বসে বসে আঙুল চুষব।"

"তা, সুজয়দা কী দোষটা করল?"

"বোঝেননি, না? তা হলে শুনুন, গতকাল থেকে ট্যাক্সির ভাড়া বেড়েছে। অনেক প্যাসেঞ্জার এমন রেগে গেছে, হয়তো ট্যাক্সিতে উঠতেই চাইবে না। মেট্রো রেলে যাতায়াত করবে। এখন মেট্রো রেল যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে ওই প্যাসেঞ্জাররা বাধ্য হয়ে ফের ট্যাক্সিতে উঠবে। লক্ষ করে দেখবেন, যখনই ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ে, তখনই মেট্রোতে গণ্ডগোল হয়। সুজয়দার মতো লোকেরা টাকা খেয়ে গণ্ডগোল পাকায়।"

ছট্টুর কথায় এবার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। আর কথা না বাড়িয়ে নীচে নেমে এলাম। এই সময়টায় প্যাসেঞ্জার কম। একটু দম ফেলে কাজ করা যায়। সকালের ডিউটিতে ছিল কিশোর। ওকে রিলিভ দিতে হবে। গেট পেরিয়ে তাড়াতাড়ি এস এস-দের ঘরে ঢুকলাম। হাজিরা খাতায় সই করতেই ইন্দ্রদা বললেন, "অর্ক, তুই আজ নর্থ গেটের কাউন্টারে চলে যা।"

শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। নর্থ কাউন্টারে বসতে আমার ভাল লাগে না। তবুও ইন্দ্রদার কথা তো আর উপেক্ষা করতে পারব না। তাই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। প্ল্যাটফর্মে খুব বেশি লোক নেই। এই মাত্র একটা ডাউন ট্রেন বেরিয়ে গেল। আপ ট্রেন আসতে মিনিট বারো বাকি। বাঁ দিকে তাকাতেই পটুয়া পাড়ার ছবিগুলো চোখে পড়ল। কাল

বিকেলে রেখা এই ছবিগুলোর কথাই বলছিল। ডাউন ট্রেনের দিকের দেওয়ালে শুধু বিজ্ঞাপন। আপ ট্রেনের দিকের দেওয়ালে নানা ছবি। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম দমদম, রবীন্দ্র সদন আর টালিগঞ্জ স্টেশন ছাড়া পাতাল রেলের বাকি চৌদ্দোটা স্টেশনে একদিকে ছবি, অন্য দিকে বিজ্ঞাপন।

প্রত্যেকটা ছবি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। না, বরাহ অবতারের ছবি তো কোথাও নেই? রেখার শ্বশুর তা হলে কি ভুল করলেন? নাকি আমিই ঠিকমতো লক্ষ করিনি। ফের ছবিগুলো দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি এসে বরাহ অবতারের ছবিটা খুঁজে পেলাম। দাঁড়িয়ে দেখার সময়ই ওপর থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল। মাঝে মধ্যে আমাদের স্টেশনে এটা হচ্ছে। বিশেষ করে, বৃষ্টি হলে সিলিংয়ের একটা জায়গা থেকে জল চুঁইয়ে পড়তে থাকে। আগের দিন প্যাসেঞ্জাররা অসন্তোষ জানিয়ে গেছেন। জল পড়তে দেখে মনে হল, ইন্দ্রদাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।

ফের হাঁটতে হাঁটতে এস এস-দের ঘরে উঠে এলাম। গেটের সামনে ইন্দ্রদা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজনের সঙ্গে। আমাকে দেখেই বললেন, "কী রে, ফিরে এলি?"

"ফের সিলিং থেকে জল লিক করছে।"

"চল তো, দেখি।" বলেই ঘর থেকে প্ল্যাস্টিকের একটা বালতি নিয়ে এলেন ইন্দ্রদা। হতাশ গলায় বললেন, "মেট্রো ভবনে দু'দুটো নোট পাঠালাম। কারও কোনও হুঁশ নেই। যে দিন শর্ট সার্কিট হয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, সেদিন বুঝবে। চৌধুরী সাহেব থাকলে একদিনে এ সব কাজ হয়ে যেত, বুঝলি অর্ক।"

ইন্দ্রদার মুখে অনেকদিন এই চৌধুরী সাহেবের কথা শুনেছি। ভাস্কর চৌধুরী। এক সময় উনি আমাদের সি সি এম ছিলেন। অর্থাৎ চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার। দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার। ইন্দ্রদার মুখে শুনেছি, সাদা ট্রাউজার্স আর লাল টি শার্ট পরে হঠাৎ হঠাৎ উনি স্টেশনে চলে আসতেন। একটু কোথাও বেচাল দেখলে খাপ্পা হয়ে যেতেন। হাতে একটা ব্যাটন থাকত সব সময়। একবার নাকি এক প্যাসেঞ্জার পানের পিক ফেলেছিলেন প্ল্যাটফর্মে। চৌধুরী সাহেব জামা খুলিয়ে, সেই জামা দিয়ে তাকে পানের পিক মুছতে বাধ্য করেছিলেন। সাত-আট বছর আগে উনি রিটায়ার করে গেছেন। অথচ এখনও ইন্দ্রদাদের মুখে চৌধুরী সাহেবের গল্প শুনি।

আসার সময় ইন্দ্রদা বোধহয় খবর দিয়ে এসেছিলেন। আমাদের পিছু পিছু হাজির সুইপার যাদব। ন্যাতা দিয়ে ও প্ল্যাটফর্মে জল মুছতে লাগল। ইন্দ্রদা নিজের হাত প্ল্যাস্টিকের বালতিটা বসিয়ে দিলেন। তার পর বললেন, "কালই মেট্রো ভবনে গিয়ে একবার চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

একটা ডাউন ট্রেন এসে দাঁড়াল। পনেরো-কুড়িজন প্যাসেঞ্জার নামলেন প্ল্যাটফর্মে। দরজা বন্ধ হওয়ার পর দেখলাম, এক ভদ্রলোক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে বলতে দৌড়চ্ছেন ট্রেনের সঙ্গে। পরনে ধুতি লুঙ্গির মতো। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয়। ওদিকে তাকিয়ে ইন্দ্রদা বললেন, "নিশ্চয়ই কেউ ট্রেনে রয়ে গেছে। যা তো অর্ক। গিয়ে লোকটাকে হেল্প কর।"

কাছে যেতেই আমার নীল পোশাক দেখে ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, আমি মেট্রো রেলের কর্মী। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে উনি বললেন, "মাই ডটার ...ইন দ্য ট্রেন। ডোর ক্লোজড।"

ভদ্রলোক একা নন। তাঁর পরিবারের আরও তিন-চারজন সঙ্গে আছেন। সবার

চোখ-মুখেই উদ্বেগ। বললাম, "ডোন্ট ওরি। সি উইল বি ইন দ্য নেক্সট স্টেশন। আই উইল টেক ইউ দেয়ার।"

ভিন রাজ্যের লোকেদের নিয়ে প্রায়ই আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকে কালী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। পাতাল রেলের দরজা যে আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়, তাঁরা অনেকেই জানেন না। নামতে দেরি করেন। ব্যস, সঙ্গীরা এক স্টেশনে পড়ে থাকেন। তিনি পরের স্টেশনে নেমে কান্নাকাটি জুড়ে দেন। এঁদেরও এই অবস্থা। ভদ্রলোককে বললাম, "কাম উইথ মি।"

এ সব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরের স্টেশনে ফোন করে দিই। তখন ওরা হারিয়ে যাওয়া লোকটাকে ধরে এনে অফিস ঘরে বসিয়ে রাখে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের এস এস হলেন মিত্তিরদা। আমাদের সবার চেনা। নর্থ কাউন্টার থেকে ফোন করতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, তেরো-চোদ্দো বছরের একটা মেয়েকে আমরা বসিয়ে রেখেছি। তুমি ওর ফ্যামিলি মেম্বারদের এখানে পাঠিয়ে দাও।"

কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করছে কিশোর। পুরো ব্যাপারটা বলতেই ও হাসতে হাসতে বলল, "মালগুলো কোথাকার, জিজ্ঞেস করো তো? বিজয় অমৃতরাজ, প্রকাশ পাড়ুকোন, না পি টি উষার দেশের?"

বললাম, "যা ঘাবড়ে গেছে, নিজের নামটাই ঠিক করে বলতে পারবে না। তুই আধ ঘণ্টা কাউন্টার সামলা। আমি এদের সঙ্গে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। কিছু মনে করিস না।"

কিশোর ঠাট্টা করে বলল, "মেট্রো রেলের ইমেজ বাড়ানোর যতই চেষ্টা করো না কেন অর্কদা, প্রমোশন কিন্তু সুজয়দার বাঁধা। তোমার হবে না।"

"আমার না হোক, তোর তো হবে।" বলে সবাইকে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। ভদ্রলোককে বললাম, "আপনার মেয়ে পরের স্টেশনে আছে। আমার সঙ্গে চলুন। আবার ফিরে আসবেন।"

কথাটা শুনে হাসি ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে। পাশ ফিরে তিনি কী যেন বললেন অন্যদের। শুনে সবাই আশ্বস্ত হলেন। টালিগঞ্জমুখী ট্রেনে উঠেই ভদ্রলোক বললেন, "সরি মিস্টার, আই গেভ ইউ ট্রাবল।"

বললাম, "নো নো। ইটস মাই ডিউটি। আর ইউ ফ্রম চেন্নাই?"

"নো, তিরুবনন্তপুরম। আমিও রেলের কর্মী। সাদার্ন রেলে আছি। মেট্রো রেল দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। দেখে খুব ভাল লাগল।"

ভদ্রলোক হিন্দি বলতে পারেন না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছেন। চাঁদনি চকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছেন। কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়েছেন। মাঝে এই বিপত্তি। আরও একটা মজার কথা বলে ফেললেন ভদ্রলোক। তিরুবনন্তপুরমে কয়েকজন নাকি সাবধান করে দিয়েছিলেন, মেট্রো রেলে চড়লে মাথা ঘোরে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বমি বমি পায়। এখন দেখছেন,সব বাজে কথা।

কথা বলতে বলতেই রবীন্দ্র সরোবর স্টেশন এসে গেল। উত্তর দিকে মিত্তিরদার ঘরে যেতে উনি বললেন, "অর্ক, তুমিও এসেছ? উফ্, মেয়েটাকে নিয়ে আচ্ছা প্রবলেমে পড়েছিলাম বাবা। ভাষা বুঝি না। কিছু বোঝাতে পারি না। খালি আম্মি আম্মি করে কাঁদছে।"

বাবা-মাকে দেখে মেয়েটার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। পরিবারের সবাই বারবার ধন্যবাদ

জানিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমিও উঠে দাঁড়াতে মিত্তিরদা বললেন, "অর্ক, একটু বোসো। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

মিত্তিরদা মানেই প. নি. প. চ। অথাৎ পরনিন্দা পরচর্চা। কী জিজ্ঞেস করে বসবেন, ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "না মিত্তিরদা, বসা চলবে না। এখুনি কাউন্টারে গিয়ে বসতে হবে।"

"রাখো তো কাজ। তোমাদের ওখানে প্রবলেমটা কী বলো তো?"

আমি বুঝতে পারলাম না, কী বলতে চাইছেন মিত্তিরদা। বললাম, "কোন প্রবলেমের কথা বলছেন?"

"আজ সকালে কী হয়েছিল। কিছু শোনোনি?"

"না তো?"

"আমাদের স্টেশনে একটা ডাউন ট্রেনের ব্রেকপাইপ ফেটে গেছিল। ট্রেনটা যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, তখন দেখি একটা ট্রেন কালীঘাট ছেড়ে দিয়েছে। মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। পিছনের ট্রেনটা সোজা এসে ধাক্কা মারত দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটাকে। কী হত, তা হলে বলো তো?"

এ ধরনের ঘটনা যে কোনও দিন ঘটতে পারে, আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। সিগন্যালে গণ্ডগোল থাকলে আলাদা কথা। বললাম, "পিছনের ট্রেনটাকে থামালেন কী ভাবে?"

"কন্ট্রোল থেকে থার্ড রেলের কারেন্ট অফ করে দিয়েছিল। ট্রেনটা কয়েক গজ আগে এসে থেমে গেল।"

"এ রকম তো হওয়ার কথা নয় মিত্তিরদা।"

"তবুও হয়েছে। তোমাদের ওখানে ওই সময় কি সিগন্যালে কেউ ছিল না? কার ডিউটি থাকতে পারে, বলো তো?"

"জানি না। জানলেও বলতাম না।"

"খবরটা কাল নিশ্চয়ই কাগজে বেরোবে। কী কেলেঙ্কারিটা হবে বলো তো। পেছনের ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা সব গালাগাল করতে করতে গেল। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কমপ্লেন করে দেবে।"

মিত্তিরদার গলায় ক্ষোভ। দুর্ঘটনা সত্যিই ঘটলে তার দায় খানিকটা গিয়ে বর্তাবে মিত্তিরদার উপর। পাবলিক ছাড়ত না। স্টেশন ভাঙচুর করত। কিন্তু একই লাইনে দুটো ট্রেন এল কীভাবে? রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনটা নন ব্লক স্টেশন। অর্থাৎ এখানে সিগনালের কোনও ব্যাপার নেই। কালীঘাট আর টালিগঞ্জে আছে। পিছনের ট্রেনটা ছাড়ার সময় নিশ্চয় কালীঘাট আর টালিগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে কথা হয়েছিল। পেপার লাইন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছিল। দোষটা বেশি টালিগঞ্জের। ওরা কেন আগে খোঁজ নিল না, কেন একটা ট্রেন আটকে রয়েছে রবীন্দ্র সরোবরের স্টেশনে?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মিত্তিরদা ফের বললেন, "দেখো, এ নিয়ে একটা এনকোয়ারি হবেই। তোমাদের ওখানে কেউ না কেউ সাসপেন্ড হবে। আমার মনে হয়, এটা সাবোতেজ। দোষীদের খুঁজে বের করা উচিত।"

পাতাল রেল সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেশি। তাই ঘটনাটা শুনেই আমার মনে হয়েছে, সাবোতেজ। তা না হলে একই লাইনে দুটো ট্রেন চলে আসা সম্ভব নয়। নানা কারণে পাতাল

রেলের কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ। বিশেষ করে কারশেডে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে। মিত্তিরদার সঙ্গে আমিও একমত, প্যাসেঞ্জারদের জীবন নিয়ে যাঁরা ছিনিমিনি খেলেন, তাঁদের কড়া শাস্তি হওয়া দরকার। আপ ট্রেন আসার সময় হয়ে গেল দেখে উঠে দাঁড়ালাম। তার পর বললাম, "আজ আসি, মিত্তিরদা ইন্দ্রদাকে না বলেই চলে এসেছি।"

মিত্তিরদা বললেন, "ইন্দ্র কোথায় আছে বলো তো। ফোনে পাচ্ছি না। যতবারই ফোন করছি, বলছে সিটে নেই।"

বললাম, "একটু আগেই তো ছিলেন।"

"ওর সম্পর্কে কীসব শুনছি, অর্ক।"

"কী মিত্তিরদা?"

"ও নাকি এক বিধবা মহিলার প্রেমে পড়েছে।"

"কই, আমরা তো কিছু শুনিনি।"

"মহিলাটি উগ্র আধুনিকা, মাঝে মধ্যে আজকাল তাকে ইন্দ্রর ফ্ল্যাটেও দেখা যাচ্ছে। বুড়ো বয়সে এ কী শুরু করল ইন্দ্র।"

"আমার মনে হয় এ সব রটনা। ইন্দ্রদার মতো লোক হয় না।"

"জানি না বাবা। এই বয়সটা ডেঞ্জারাস বুঝলে। শরীরেরও তো একটা খিদে আছে। বছর পাঁচেক হল, বউ মারা গেছে। ইন্দ্রকে দোষ দিই কী করে বলো। শুধু ভয় হচ্ছে মহিলাটি আবার ইন্দ্রকে ফাঁসিয়ে না দেয়।"

প্রসঙ্গটা অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন মিত্তিরদা। এ সব কথা বাড়তে দেওয়া উচিত না। বললাম, "আমাদের তো কখনও চোখে পড়েনি মিত্তিরদা।"

"পড়বে কী করে? মনে আছে, মাস ছয়েক আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় একটা মেয়ে তোমাদের স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করতে গিয়েছিল। মেয়েটা বেঁচে যায়। এই ভদ্রমহিলা হচ্ছে, সেই মেয়েটির মা। আমি সেদিন তখন তোমাদের ওখানে ছিলাম। মহিলা খুবই সেক্সি। বোধহয় চাকরিও করেন কোনও এক মার্কেন্টাইল কোম্পানিতে। সেদিন আমরা মহিলাকে খবর দেওয়ার পর মেয়েকে নিতে এসেছিলেন। তুমি কি তখন ছিলে?"

"না। সেদিন আমার বিকেলের ডিউটি ছিল। আমি ডিউটিতে এসে শুনেছিলাম ঘটনাটা।"

"হবে হয়তো। সে দিনই মহিলার হাবভাব দেখে আমার ভাল লাগেনি। ইন্দ্রর মতো বিচক্ষণ লোক কীভাবে ট্র্যাপে পড়ল, জানি না। আমাদের টালিগঞ্জে কোয়ার্টারে তো দেখি সবাই জানে ব্যাপারটা।"

মিত্তিরদার কথাগুলো আমার ভাল লাগল না। ওই ভদ্রমহিলাকে আমি দিখিনি। কিন্তু যদি ইন্দ্রদার সঙ্গে কোনও অ্যাফেয়ার হয়েই থাকে,তা নিয়ে এত নিন্দের কী আছে? ইন্দ্রদা বিপত্নীক। ভদ্রমহিলাও বিধবা। দু'জনে যদি বিয়েও করেন, কারও আপত্তি থাকার তো কথা নয়। প্রসঙ্গটা আর বাড়াব না ভেবে, আমি ফের উঠে পড়লাম। তার পর বললাম, "আমি চলি। দেরি হয়ে গেছে।"

"যাবে? এসো তা হলে। ইন্দ্রকে আবার কিছু বোলো না যেন। এ সব স্ক্যান্ডাল না ছড়ানোই ভাল। ইন্দ্রর ব্যাপার, ও-ই বুঝবে।"

শেষ কথাগুলো শুনে হাসি পেল। স্ক্যান্ডাল ছড়াতে মানা করছেন মিত্তিরদা। অথচ উনিই ছড়াচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ইন্দ্রদাকে আমি চিনি। কোনও নোংরামি

উনি করতে পারেন না। মিত্তিরদা খারাপ ইঙ্গিত করলেন। এ সব ঈর্ষা। জগতে এক ধরনের লোক আছে, সব কিছুতেই শরীরের গন্ধ পায়। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। মিত্তিরদা বাজে টাইপের লোক। রবীন্দ্র সরোবরে না এলেই ভাল হত আজ।

এমনও হতে পারে, দু-তিন দিন পর কোথাও মিত্তিরদার সঙ্গে ইন্দ্রদার দেখা হল। মিত্তিরদা হয়তো বলে বসবেন, "হ্যাঁ রে ইন্দ্র, অর্কের মুখে শুনলাম, তোর ফ্ল্যাটে নাকি এক মহিলাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।?" মিত্তিরদা পুরো ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন। ইন্দ্রদা হয়তো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। তবে মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন।

আপ ট্রেন ধরে কালীঘাট স্টেশনে ফিরে এলাম। প্রায় পৌনে চারটে বাজে। নর্থ গেটের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, এমন সময় দেখি সীতাংশু নেমে আসছে। সকালে ওর ডিউটি ছিল। এখন তো থাকার কথা নয়? মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কী রে, তুই এখন?"

মুখ কাঁচুমাচু করে সীতাংশু বলল, "আর বলিস না। টালিগঞ্জে মেডিকেল ইউনিটে গেছিলাম। পায়ের কড়ে আঙুলে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাক্তার দেখালাম। ওখানে ইন্দ্রদা খবর পাঠিয়েছে, সকালের ডিউটিতে যারা ছিল তাদের সবাইকে বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে হাজির হতে হবে।"

"কেন?"

"সকালের ব্যাপারটা তো জানিস। মেট্রো ভবন থেকে সিনিয়র সিগন্যাল টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার আসবেন তদন্ত করতে। তিনি সবার সঙ্গে কথা বলবেন।"

"সিগন্যালে কে ছিল রে?"

"সুজয়দের ইউনিয়নের লোকটা। নাম বল্যে আর কী হবে। আজ চোতা খাবে।"

"শুয়োরের বাচ্চাকে ধরে লাথি মারা উচিত।" সাত-আট বছর আগেকার সত্তাটা হঠাৎ বেরিয়ে এল আমার ভেতর থেকে। বনমালী নস্কর রোডের সেই অর্ক।

সীতাংশু আমার চোখ-মুখ দেখে অবাক হয়ে বলল, "বাপ রে, তুই এত রেগে গেলি কেন রে অর্ক?"

"কত লোক আজ মারা যেত বল তো? আমাদের উচিত, লোকটার নাম সি সি টি ই-কে জানিয়ে দেওয়া।"

"দেখি, ইন্দ্রদা কী বলে।" বলেই দু'ধাপ নেমে সীতাংশু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "একটা বাজে খবর আছে রে অর্ক। মেডিকেল ইউনিটে সুজয়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যা আমরা সাসপেক্ট করেছিলাম, বউদির ঠিক তাই-ই হয়েছে।"

"ক্যান্সার?"

"হ্যাঁ। আমাকে বলার সময় সুজয়দা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।"

"অপারেশন করিয়েছে?"

"হ্যাঁ। বি আর সিং হাসপাতালে। লেফট ব্রেস্টটা বাদ দিয়েছে। কালই বায়োপসিতে ধরা পড়ল।"

"সুজয়দা আর কিছু বলল?"

"কী বলবে, বল তো। এমনিতে লোকটা তো খারাপ না। আপদ বিপদে কিন্তু পাশে এসে দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, বউদির জন্য কিছু টাকা পয়সা আমাদের তুলে দেওয়া উচিত।"

"আমি রাজি। অন্যদের সঙ্গে কথা বল।"

সীতাংশু ঘাড় নেড়ে নীচে নেমে যাওয়ার পর আমি উঠে কাউন্টারে এসে ঢুকলাম। কিশোর বেচারা আমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছে। ও থাকে বারুইপুরের দিকে। আমার জন্যই বাড়ি ফিরতে আজ ওর ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেটা এত ভাল যে, রাগ করে না। কাউন্টারে বসতেই আমাকে বলল, "তোমার জন্য অর্কদা, আজ আমার মেট্রো ভবনে যাওয়া হল না।"

"যাওয়ার কথা ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। স্টোর থেকে জুতো আনার জন্য। এত দেরি হয়ে গেছে, এখন গেলে আর পাওয়া যাবে না।"

দু' বছর অন্তর মেট্রো ভবন থেকে আমাদের জুতো দেওয়া হয়। আর নীল শার্ট ও ট্রাউজার্স প্রতি বছর তিন সেট করে। গত সপ্তাহে আমরা অনেকেই গিয়ে শ্যু নিয়ে এসেছি। কিশোর বোধহয় সময় করে উঠতে পারেনি। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চারটে বাজে। বললাম, "না, এখন আর পাবি না। তার চেয়ে বরং বাড়ি চলে যা।"

"না গো। এখন কম্পিউটার ক্লাসে যেতে হবে।"

"কম্পিউটার শিখছিস! বাঃ, আগে তো কখনও বলিসনি?"

"ইচ্ছে করেই বলিনি। এই চাকরিতে সারা জীবন থাকতেই পারব না। বেটার কিছু করা দরকার।"

কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। চাকরিতে নতুন ঢোকার পর আমিও একবার ভেবেছিলাম, কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসব। কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎই পাতাল রেলটাকে ভাল লেগে গেল। পাতাল রেল আমাকে অনেক শান্ত করে দিয়েছে। মাটির তলায় আসার পর থেকে আমি অনেক বদলে গেছি। পাতালে কোনও দূষণ নেই। আমার একটা সত্তাকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

কিশোর টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতেই আমি কাউন্টারে বসে গেলাম। বিকেলের ডিউটিতে দম নেওয়া যায়। চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকানো যায়। এ এফ সি গেটের আগে নন পেইড এরিয়াতে মেটাল ডিটেক্টরের সামনে বসে আছে নীল শাড়ি পরা একজন মেয়ে পুলিশ। মেয়েটাকে আমি চিনি। নাম দুর্গা ব্যানার্জি। মাস আটেক হল ডিউটিতে আসছে। কখনও টুকটাক কথাবার্তাও হয়। একদিন বলেছিল। বুলুদিকে চেনে। কীভাবে চেনে, জানতে চাইনি। কেঁচো-খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। বুলুদির তো গুণের শেষ নেই।

টিকিট দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনি, কাউন্টারের ওপাশ থেকে একটা মেয়ে বলছে, "আপনি কিন্তু আমাকে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছেন।"

মুখ তুলে দেখি, আমারই বয়সী একটা মেয়ে। চোখে চশমা। পরনে টি শার্ট। অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "তাই নাকি?"

"ডেফিনিটলি। আমি দশ টাকার নোট দিয়েছিলাম। পাঁচ টাকার টিকিট চেয়েছি। আপনি কিন্তু সাত টাকা ফেরত দিয়েছেন।"

হিসেব মেলানোর সময় আজ আমাকে দুটো টাকা গচ্চা দিতে হত। হাসিমুখে বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"যদি উল্টোটা হত?" বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। ওর হাসি শুনে দুর্গা ব্যানার্জি এ দিকে তাকাল।

বললাম, "কী আর হত। ফের দেখা হলে দুটো টাকা দিয়ে দিতাম।"

"সত্যি দিতেন? আমার কিন্তু মনে হয় না।"

এই কথাটা শুনে একটু সতর্ক হয়ে গেলাম। আর কথা বাড়তে দেওয়া উচিত না। মেয়েটাকে আগে কখনও দেখিনি। হয়তো এই গেট দিয়ে রোজ যাতায়াত করে। তাই দেখার সুযোগ হয়নি। মেয়েটা যে গায়ে পড়ে কথা বলছে, তা নয়। তবে খুব সপ্রতিভ। একেকটা মেয়ে এ রকম হয়। এখনও কাউন্টার ছেড়ে যায়নি। কারও জন্য অপেক্ষা করছে? না, তা হলে তো একটা টিকিট কাটত না।

"আপনি তো অর্কদা,তাই না?"

মেয়েটা আমার নামটাও জানে, তা হলে! বললাম, "হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি সোনালি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?"

"বলুন।"

"আপনাদের সীতাংশু চ্যাটার্জিকে আপনার কী রকম ছেলে বলে মনে হয়?"

"খুব ভাল।" সীতাংশুর নামটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপরই জিজ্ঞেস করলাম, "কেন বলুন তো?"

"না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। হবু স্ত্রীকে রাসবিহারীর মোড়ে যে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে, সে কতটা ভাল তা জানতে চাইছিলাম।"

"সীতাংশু কিন্তু সাউথ গেটের অফিসে আছে। ডেকে দেব?"

"একদম না। ওকে বলে দেবেন, বিয়ের আগে যেন আমাদের বাড়ির ছায়া না মাড়ায়।"

বলেই সোনালি গট গট করে হেঁটে নীচে নেমে গেল। দমদমমুখী ট্রেন আসতে এখনও মিনিট সাতেক সময় আছে। সোনালি নিশ্চয়ই ততক্ষণ প্ল্যাটফর্মে থাকবে। এখুনি ইন্দ্রদার ঘরে ফোন করে দিলে সীতাংশু ওকে ধরে মান ভাঙাতে পারবে। কথাটা মনে হতেই উঠে গিয়ে ফোন করলাম। ও প্রান্তে রিসিভারটা সীতাংশুই তুলল। বললাম, "সোনালি তোর খোঁজে এসেছিল। রেগেমেগে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তুই কী রে, ওকে এক ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিস?"

সীতাংশু অবাক হয়ে বলল, "কে সোনালি?"

"কে আবার? যাকে তুই বিয়ে করছিস?"

"অর্ক, তোর মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়েছে। ডাক্তার দেখা। কে গুল মেরে গেল, আর তুই বিশ্বাস করে নিলি। আমার দুই দাদারই এখনও বিয়ে হয়নি। আমি বিয়ে করতে চাইলে বাড়িতে ঝাঁটা মারবে। এটা ঠাট্টা করার সময় নয়। সি সি টি ই এখুনি আমাদের যা ঝেড়ে গেল। সবার মাথা গরম হয়ে আছে।"

বলেই ঠক করে রিসিভারটা রেখে দিল সীতাংশু।

৫

আমাদের বাড়িতে ফোন দোতলায়। চৌধুরী সাহেবকে একটা ফোন কবর বলে বুলুদির ঘরে যাচ্ছিলাম। কাল ফোন নম্বরটা দিয়ে ইন্দ্রদা বলল, "বরাহ অবতারের ছবিটা সম্পর্কে একমাত্র বলতে পারবেন চৌধুরী সাহেব। তুই ওঁর কাছে চলে যা। পণ্ডিত মানুষ। ঝটপট বলে দেবেন। তবে যাওয়ার আগে একটা ফোন করে যা। উনি থাকেন গোলপার্কে। ঠিক

রামকৃষ্ণ মিশনের উল্টো দিকে।"

রেখার শ্বশুর মশাই দু'একদিনের মধ্যে আসবেন। তার আগে আমার চৌধুরী সাহেবের কাছে যাওয়া দরকার। আমার নিজেরও আগ্রহ বেড়ে গেছে। পাতাল রেলে চাকরি করি। অথচ পাতাল রেল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি না। কোনওদিন পাতাল রেলকে অন্য ভাবে দেখার চেষ্টাও করিনি। সেদিন ইন্দ্রদা বললেন, "বুঝলি অর্ক, কলকাতা শহরের মধ্যে দু'টো কলকাতা আছে। দু'টো আলাদা সংস্কৃতি। উত্তর আর দক্ষিণ। এই দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছে পাতাল রেল। তবে দক্ষিণ কলকাতার প্রভাবটা একটু বেশিই আছড়ে পড়ছে উত্তরে। টালিগঞ্জ থেকে যদি টানা দমদম যাস, তা হলে এটা বুঝতে পারবি।"

পরে ভেবে দেখেছি, সত্যিই তো ইন্দ্রদার কথাই ঠিক। পাতাল রেলই উত্তর আর দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। ইন্দ্রদা আরও বলেছিলেন, "চৌধুরী সাহেবের কাছে যা অনেক নতুন নতুন কথা শুনতে পাবি। তোদের দুর্ভাগ্য লোকটার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলি না। পাতাল রেলের প্রতি লোকটার কী অসীম ভালবাসা। দেখতে পেলি না।"

এসব কথা শোনার পর থেকেই আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে ভদ্রলোক সম্পর্কে। আজ আমার বিকেলের ডিউটি। ঠিক করে রেখেছি, সকালের দিকে যদি আমাকে চৌধুরী সাহেব মিনিট পনেরো সময় দেন, তা হলে আমি গোলপার্কে যাব। সেই জন্যই ফোন করতে উঠছি। দোতলায় ওঠার ল্যান্ডিংয়ে পা দিয়ে হঠাৎই ছিটকে আসা বুলুদির একটা কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। "কোনও দিকেই যখন তোমার মুরোদ নেই। তখন আমাকে বিয়ে করতে গেছিলে কেন?"

দিবাকরদা তা হলে এখনও অফিসে বেরয়নি। কথার ঝাঁঝ লক্ষ করেই বুঝলাম, দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। আগে মাঝে মধ্যে হত। ইদানীং দেখছি, প্রায়ই লাগছে দু'জনের মধ্যে। তবে বুলুদি চেঁচিয়ে বলা শুরু করলেই দিবাকরদা কেমন যেন মিইয়ে যায়। আজও তেমন হল। বুলুদির কথাটা শুনে দিবাকরদা নরম গলায় বলল, "রাগ করছ কেন বুলু। বললাম তো, টাকাটা আমার দরকার।"

"দরকার থাকলে আমার কাছে হাত পাততে পারতে। আমাকে না বলে আমার ব্যাগ থেকে সরালে কেন? ভেবেছিলে আমি হলদিয়ায় চলে যাব। টেরও পাব না। কেমন?"

"তোমার ব্যাগে তো আরও হাজার দশেক টাকা আছে বুলু।"

"যত টাকাই থাক। না বলে টাকাটা সরাতে তোমার লজ্জা করল না?"

"মাত্র তো হাজারটা টাকা। তার জন্য তুমি এত চেঁচাচ্ছ? সুখবিন্দরের কাছে চাইলেই তো তুমি টাকা পাবে। কেন সামান্য টাকার জন্য অশান্তি করছ?"

"তুমি জানো, আমি চাইলেই সুখি কেন টাকা দেয়? সে বুদ্ধি তোমার আছে, হিজড়ে কোথাকার। আজ আমার তাড়া আছে বলে তুমি রেহাই পেয়ে গেলে। না হলে, সারা পাড়ার লোককে ডেকে সব বলে দিতাম।"

দিবাকরদা অসহায়ের মতো বলল, "চিৎকার কোরো না বুলু, প্লিজ। নীচে অর্ক রয়েছে। সব শুনতে পাবে।"

"চুপ। একটা কথাও তুমি আর বলবে না। অর্ক জানুক। ওর জানা দরকার, ও কি তোমার মতো ইম্পোটেন্ট বাস্টার্ড? ও সব বোঝে।"

"বুলু লক্ষ্মীটি, তুমি চুপ করো।"

"কেন চুপ করব, বলো তো? একটা পয়সাও বাড়িতে দাও না। কেন তোমার এত টাকা

দরকার? দাঁড়াও তোমার শয়তানি আমি বন্ধ করছি। সুখির লোকজনকে তোমার পিছনে লাগিয়ে দিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব খবর ও এনে দেবে।"

"বললাম তো, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আজ খাওয়াব। কথা দিয়ে ফেলেছি। টাকাটা পরে তোমাকে দিয়ে দেব।"

"বন্ধুদের খাওয়াবে. মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি। হলদিয়া থেকে ফিরে এসে, তারপর মজা দেখাচ্ছি। ভেবেছ আমি জানি না, টাকাটা তুমি কার গর্ভে দেবে?"

চটির শব্দ এদিকে আসছে। তার মানে বেডরুম থেকে বুলুদি ড্রয়িংরুমে আসছে। ঘাড় ঘোরালেই আমাকে দেখতে পাবে। আমি দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এলাম। বুলুদির সঙ্গে দিবাকরদার সম্পর্ক যে এত খারাপ হয়ে গেছে, আমি জানতামই না। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে কথাগুলো শুনে। নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। যাতে সদর দরজা খুলে বেরনোর সময় বুলুদির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে না যায়।

ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। কয়েকদিন আগে পাওয়া সেই উড়ো চিঠিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। মেয়েটা তা হলে ঠিকই লিখেছিল। বুলুদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে সুখিজির। একটু আগে বুলুদি দিবাকরদাকে বলল, "ইম্পোটেন্ট বাস্টার্ড"। এই জন্যই কি ওদের কোনও সন্তান হয়নি? এই কারণেই সুখিজির সঙ্গে বুলুদির এত ঘনিষ্ঠতা? বুলুদির জীবনে অনেক পুরুষকে আসতে দেখেছি। অনেক কুকীর্তির সাক্ষী আমি। বুলুদির জন্য অনেকবার নিজেও মারপিটের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছি। সেসব কথা আর কেউ জানে না। দিবাকরদা তো নয়ই।

বেহালায় বনমালী নস্কর রোডের রনিদার কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। সুন্দর দেখতে। রনিদা প্রায়ই আসত ও বাড়িতে বুলুদির টানে। পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। উচ্চ মাধ্যমিকে আর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিল। পাড়ায় ভাল ছেলে বলতে তখন রনিদা। শুনতাম, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেই রনিদা আমেরিকায় চলে যাবে। ওখানে কে এক আত্মীয় আছে। তার কাছে থেকে আরও পড়াশুনো করবে।

জেঠিমা খুব পছন্দ করতেন রনিদাকে। দোতলার ঘরে রনিদা আর বুলুদি যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করত, জেঠিমা তখন আমাকে বলতেন, "ওপরে গিয়ে যেন তুই আবার ওদের ডিসটার্ব করিস না।"

তা সত্ত্বেও, আমি অনেকদিন দেখেছি বুলুদিকে জড়িয়ে ধরে রনিদা চুমু খাচ্ছে। বাড়িতে বেশির ভাগ সময় বুলুদি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে থাকত। এমনও দেখেছি ব্লাউজের বোতাম পটাপট খুলে বুলুদি স্তন বের করে রনিদার মুখের সামনে তুলে দিচ্ছে। আর রনিদা পাগলের মতো মুখ ঘষছে সেই স্তনে। দু'জনের মধ্যে তখন এমন ঘনিষ্ঠতা, একদিন ছাদে ঘুড়ি উড়িয়ে নীচে নামার সময় দেখি, বাথরুমের দরজাটা খোলা। টুল পেতে বসে আছে রনিদা। ভেতরে বুলুদি গায়ে সাবান মাখছে। বিস্ফারিত চোখে বুলুদির নগ্ন শরীরটা সেদিন দেখেছিলাম। তারপর থেকে বহুদিন দৃশ্যটা আমাকে উত্তেজিত করেছে।

পাড়ায় সবাই বুলুদি আর রনিদার সম্পর্কটা জানত। সবাই ধরে নিয়েছিল, দু'জনের মধ্যে বিয়েটা হবে। অমলাশঙ্করের নাচের ট্রুপে বুলুদি তখন বেশ নাম-টাম করেছে। রবীন্দ্র সদনে বার তিনেক প্রোগ্রামও হয়ে গেছে। নাচের পোশাকে বুলুদিকে যখন দেখতাম, তখন

রাজকন্যা, রাজকন্যা বলে মনে হত। রনিদার বাড়ির লোকজন এ বাড়িতে আসতেন। ওরা ঠিক করে ফেলেছিলেন, রনিদা পাস করে বেরলেই বিয়েটা দিয়ে দেবেন। আমার কিন্তু মনে হত, এ বিয়েটা হবে না। বুলুদি যা স্বার্থপর আর বদমেজাজি, কোনও একটা দিন হঠাৎ বেঁকে বসবে।

ঠিক হলও তাই। রনিদাদের বাড়িতে সেদিন বোধহয় কোনও একটা অনুষ্ঠান ছিল। দুপুর বেলাতেই জেঠিমা চলে গেছিলেন নেমন্তন্ন রাখতে। আমি তখন সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি। বিকেলবেলায় ফিরে ছাদের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ দোতলার ঘরে শুনতে পেলাম বুলুদির গলা, "আসল কাজটা করার সাহস নেই। তোমার শুধু চুমু খাওয়া। যাও তো, তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে আমার ভাল লাগে না।"

রনিদা ফিসফিস করে বলেছিল, "কেউ এসে পড়লে?"

"কে আবার আসবে? বাড়ি ফাঁকা। আজও পারলে না? তুমি পুরুষ মানুষ কি না, এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

ঘরের আবছা অন্ধকারেও বুঝতে পেরেছিলাম, ধাক্কা মেরে খাট থেকে রনিদাকে নামিয়ে দিল বুলুদি। তারপর হিসহিস করে বলল, "খবর্দার, আর কোনওদিন তুমি এ বাড়িতে আসবে না।"

পরদিন সকালেই শুনলাম, রনিদা ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কোন এক আত্মীয়ের চোখে পড়ে যায়, রাতেই নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা পেটে পাম্প করে সব বের করে দেওয়ায় রনিদা বেঁচে গিয়েছে। পাড়ায় খুব হইচই হয়ে গেছিল। নার্সিংহোমে দেখতে গিয়ে বুলুদি কান্নাকাটিও করে। পরে অবশ্য আমাকে বলেছিল, "কাওয়ার্ড কোথাকার। ওর মরে যাওয়াই উচিত ছিল।" কিছুদিন পর রনিদা আমেরিকায় চলে গেল। মনে মনে আমি তখন বলেছিলাম, বেঁচে গেল।

...রাস্তা থেকে হর্নের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বনমালী নস্কর রোড থেকে আমি ফের চেতলায় ফিরে এলাম। সদর দরজার সামনে সাদা রঙের একটা অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে, তার মানে, সুখবিন্দর সিং পাঠিয়েছে। জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখলাম, ড্রাইভারের সঙ্গে হেসে কথা বলছে বুলুদি। খুব সুন্দর লেবু রঙের একটা সালোয়ার-কামিজ পরেছে। শ্যাম্পু করা চুল উড়ছে। চোখে রোদ চশমা। খুব সুন্দর লাগছে বুলুদিকে দেখতে। একেবারে ফিল্মের নায়িকাদের মতো। কে বলবে, একটু আগে এই মহিলাই দিবাকরদার সঙ্গে কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করে এসেছে!

ছোটবেলা থেকে দেখছি, যে কোনও পুরুষকে আকর্ষণ করার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে বুলুদির। যে কোনও বয়সী লোককে। রনিদা চলে যাওয়ার পর বোধহয় কোনও পুরুষকে দরকার হয়ে পড়েছিল বুলুদির। শুভজিৎ স্যারের উপর নজর পড়ল। আমাকে কেমিস্ট্রি পড়ানোর জন্য সপ্তাহে দু'দিন আমাদের বাড়িতে আসতেন শুভজিৎ স্যার। মাঝবয়সী, বিবাহিত এবং দুই মেয়ের বাবা। বুলুদি তখন আমার গার্জেন। মাঝে মধ্যেই স্যারের কাছে খবর নিতে আসত, আমি কেমন পড়াশুনো করছি। তা জানার জন্য। দু'জনের মধ্যে সামান্যই কথাবার্তা হত।

হঠাৎ একদিন অমিয় এসে বলল, "অর্ক তোর কেমিস্ট্রি স্যারকে বুলুদির সঙ্গে দেখলাম। লাইট হাউস থেকে সিনেমা দেখে বেরচ্ছে।"

কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। অমিয় কী দেখতে, কী দেখেছে। হয়তো এমনও হতে পারে,

আলাদা আলাদা গেছিল। ওখানে গিয়ে দেখা হয়েছে। স্যার একটু সিরিয়াস টাইপের মানুষ। তখন বুঝতাম, বুলুদির গার্জেনগিরি ঠিক পছন্দ করতেন না। বুলুদিকে ঘরে ঢুকতে দেখলে অস্বস্তিতে পড়ে যেতেন। সেই স্যার বুলুদিকে নিয়ে সিনেমা দেখবেন, মেলাতে পারছিলাম না।

অমিয় খবরটা দেওয়ার পর শুভজিৎ স্যার একদিন বললেন, "অর্ক তোমাকে ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। তোমার জন্য আরও বেশি সময় দেওয়া দরকার। তুমি যদি চাও তা হলে আমি সপ্তাহে চার দিন আসতে পারি।"

বুলুদিকে কথাটা বলতেই নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, "চার দিন আসুক, কিন্তু টাকা বাড়াতে পারব না।"

টাকার কথা শুভজিৎ স্যারকে বলার পর উনি বললেন, "টিউশন ফি-টা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, ভাল রেজাল্টের জন্য তোমার ইচ্ছেটা আছে কি না?"

সেই দিন থেকে শুভজিৎ স্যার প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসা শুরু করলেন। বুলুদির খপ্পরে পড়ে গেলেন। ওঁরা ভাবতেন আমি কিছু বুঝি না। পাড়ার কিছু রদ্দি ছেলের সঙ্গে মিশে নরনারীর গোপন সম্পর্ক নিয়ে আমি আর অমিয় তখন অনেক কিছু জেনে গেছি। অমিয় বলত, "তোর স্যারটা পুরো জালি।" কিন্তু আমি জানতাম স্যারের কোনও দোষ নেই। দোষ আমার বুলুদির।

কলেজ থেকে ফিরে হঠাৎ একদিন শুনলাম, বুলুদি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সেই সময় অমিয় আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমাকে বলল, "নির্ঘাত তোর স্যারের কাজ। স্যার কোথায় থাকে তুই জানিস? চল, ও বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসি।" দু'জনে মিলে নিউ আলিপুরে স্যারের বাড়িতে গিয়ে শুনি, "কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে উনি দিঘায় এডুকেশনাল ট্যুরে গেছেন।" তিন দিন বাদে দিঘা থেকে উদ্ধার করে বুলুদিকে বাড়ি পৌঁছে দেয় পুলিশ।

স্যারের বাড়িতেও সব জানাজানি হয়ে গেছিল। পাড়াতেও অনেকদিন অপমান সহ্য করতে হয়েছিল স্যারকে। বুলুদির কিছু হয়নি। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, যেন কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

পুরনো দিনের কথা ভাবছি, এমন সময় শুনলাম, ওপর থেকে দিবাকরদা ডাকছেন, "অর্ক তোমার ফোন।"

আমার ফোন? কে করতে পারে? হয় অমিয়, না হয় অফিসের কেউ। তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে এলাম। দিন কয়েক আগে সেদিন সোমনাথ চট্টরাজ এসেছিলেন, সেদিন বুলুদিকে খবর দেওয়ার জন্য উপরে উঠেছিলাম। তখন নজরে পড়েনি। আজ বেডরুমে ঢুকে মনে হল, অনেক কিছুই বদলে গেছে। মেঝেতে দামি কার্পেট, খাট, ড্রেসিং টেবিল। দেয়ালে বাহারি ল্যাম্প। কেমন যেন হোটেল হোটেল চেহারা। কবে এসব হল, জানতেই পারিনি।

আমাকে দেখে দিবাকরদা বলল, "কর্ডলেসটা ড্রয়িংরুমে আছে। ইচ্ছে হলে নীচে নিয়ে যাও।"

দিবাকরদার চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। দেখেই মনে হল, ভাল নেই। একটা কথা না বললে ভাল দেখায় না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "আজ বেরোবে না?"

"এই বেরব। তোমার কখন ডিউটি?"

"বেলা দু'টোয়। কেন দিবাকরদা?"

"ঝুলনটার জ্বর কাল রাত থেকে। ওপরে পড়ে আছে। তুমি গিয়ে একবার দেখে আসবে ভাই? তেমন হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।"

"যাচ্ছি। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।"

"এই মেয়েটার জন্যই আমার যত চিন্তা, বুঝলে অর্ক। মেয়েটার জ্বর জানা সত্ত্বেও তোমার বুলুদি হলদিয়ায় চলে গেল। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েটা সংসারের জন্য খাটছে। বিবেকে একটুও বাধবে না, বলো?"

কথাটা মিথ্যে বলেনি দিবাকরদা, বুলুদির জন্য অনেক কিছু করে ঝুলন। ওর অসুস্থতার সময় থাকা উচিত ছিল বুলুদির। কিন্তু বরাবরই স্বার্থপর। নিজেকে ছাড়া বুলুদি আর কাউকে ভালবাসে বলে মনে হয় না। বললাম, "হলদিয়া থেকে কবে ফিরবে বুলুদি?"

"জানি না হলদিয়া উৎসবে নাচের ট্রুপ নিয়ে প্রোগ্রাম করতে যাবে। সেই ব্যাপারে কথা বলতে গেল। কবে ফিরবে, বলে যায়নি। আমাকে তো আজকাল মানুষ বলেই মনে করে না। যাক সে কথা, ফোনটা ধরা আছে। কর্ডলেস নীচে নিয়ে যাও।" বলেই দিবাকরদা বাথরুমে ঢুকে গেল।

ড্রয়িংরুম থেকে কর্ডলেসটা নিয়েই বুঝতে পারলাম, অমিয়র ফোন। ও প্রান্ত থেকে বলল, "কী রে অর্ক, তোদের বাড়িটা কি দোতলা হয়ে গেছে?"

বললাম, "না তো। আগের মতোই আছে।"

"ফোনটা ধরতে তোর এতক্ষণ সময় লাগল দেখে জিজ্ঞাসা করছি।"

"কী জন্য ফোনটা করেছিস বল।" কথা বলতে বলতে আমি নীচে নেমে এলাম।

"কেন দরকার ছাড়া তোকে ফোন করতে পারি না?"

"শালা, আসল কথাটা বল তো। আজ মনমেজাজ ভাল নেই।"

"কেন? যতদূর জানি, তুই তো প্রেম-ট্রেম কিছু করিস না। করছিস নাকি? গড়িয়াহাট আর রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে—খুব খতরনাক জায়গা। ডাইনে-বাঁয়ে সুন্দরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন তোর সঙ্গে কাউন্টারে বসে তো দেখলাম। চোখ ফেরানো যায় না। বেড়ে আছিস মাইরি।"

"আজ বোধহয় আরতি বাড়িতে নেই?"

"থাকবে না কেন? এই তো পাশে বসে আমসত্ত্ব খাচ্ছে। আমাকে বলল, অর্কদার অনেক দিন কোনও খোঁজ খবর নেই। একটু ফোন করবে? অর্কদাকে নিয়ে কাল একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি। কী ব্যাপার বল তো? আমাকে নিয়ে তো কোনও দিন স্বপ্ন দেখেনি।"

"বেশ স্ফূর্তিতেই আছিস দেখছি।"

"তা বলতে পারিস। বিয়েটা করে ফ্যাল। রোজ সকালে উঠে তোরও মনে হবে, স্ফূর্তিতে আছিস।"

"পরে বুঝবি, কত গমে কত ময়দা।"

"ভাল বলেছিস তো! এর সঙ্গে আমি আরেকটা লাইন জুড়ে দিচ্ছি, আগে বিয়ে পরে ফয়দা।

"আসল কথাটা এবার ছাড় তো।"

'তোর জন্য তো মাইরি আমার অফিস যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"কেন?"

"আরে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর দত্ত...সে তো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।"

"কী জন্য?"

"রোজই অফিসে দেখা হলে আমাকে বলে অর্ক রায়চৌধুরী ভদ্রলোককে আমার কাছে একদিন নিয়ে আসুন।"

"আমাকে উনি চিনলেন কী করে?"

"শুক্লাই হয়তো বলেছে।"

দুম করে মনে পড়ে গেল, কয়েক দিন আগে অমিয় আমাকে খবরটা দিয়েছিল বটে। শুভঙ্কর দত্তের সঙ্গে শুক্লার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শুক্লা আমার সম্পর্কে কী বলতে পারে, ভেবে পেলাম না। "আমাদের পাড়ায় মাস্তান টাইপের ছিল," "আমার দাদার বন্ধু ছিল," "আমার সঙ্গে প্রেম করতে এসেছিল," "আমার কাছে পাত্তা পায়নি।" সদ্য বিবাহিত স্বামীকে অন্য একজন ছেলে সম্পর্কে কী বলতে পারে ও?

"কী রে, শুক্লার নামটা শুনে বোবা মেরে গেলি যে?"

"না, বল।"

"তুই তো বলবি। কবে মেট্রো ভবনে আসতে পারবি বল তো। আমি সি ই-কে বলে রাখব। সি ই-র সঙ্গে হৃদ্যতা রাখলে আমার ডিপার্টমেন্টের গান্ডু বস-টা আমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। লোকটাকে বিয়ে করে শুক্লা মাইরি আমার দারুণ উপকার করল। তা কাল তুই আসতে পারবি? বিকেলের দিকে উনি একটু ফাঁকা থাকেন।"

বললাম, "না রে, এই সপ্তাহে আমার বিকেলের ডিউটি।"

"ধুস। ইন্দ্র চাটুজ্জেকে বলবি, সি ই ডেকেছে। সঙ্গে সঙ্গে তোকে ছেড়ে দেবে। ছাড় তো। বহুত ডিউটি মারিয়েছিস।"

"ঠিক আছে। তোকে কাল জানিয়ে দেব। ছাড়ি?"

"দাঁড়া ছাড়িস না। জগৎটা সীতা ক্যারেক্টরে ভরে গেছে। বেহালার সীতা এবার কথা বলবেন চেতলার লক্ষ্মণের সঙ্গে।"

শুনে আমি হাসতে লাগলাম। আরতি বোধহয় রিসিভার নিয়ে টানাটানি করছে। শেষে ও প্রান্ত থেকে বলল, "কেমন আছেন অর্কদা?"

"ভাল। তুমি আমসত্ত্ব খাচ্ছ কেন বলো তো? এখনও বছর ঘোরেনি, এর মধ্যেই..."

"আপনি পাগল, না জামরুল। কথাটা ভাবলেন কী করে? আমার মাসি-শাশুড়ি এসেছেন মালদা থেকে। উনি আমসত্ত্ব নিয়ে এসেছেন।"

"তা, আমাকে নিয়ে কী দুঃস্বপ্ন দেখলে আরতি? আমি হরিয়ানা লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, নাকি মেট্রোরেলে চাপা পড়েছি।"

"স্বপ্নর কথা বলতে নেই। প্রায় কাছাকাছি গেছেন। তা শুক্লাদির বিয়েতে এলেন না কেন? খুব আফসোস করছিল। বর ভালই হয়েছে। তবে বয়সের একটু ডিফারেন্স হয়ে গেল। আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে খুব মানাত অর্কদা।"

"তুমি কি তা হলে এই স্বপ্নটাই দেখেছ?"

"না। ফের পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করছেন, তাই না? কবে এদিকে আসছেন বলুন তো। একদিন আপনাকে খাওয়াব।"

"আসল মতলবটা কী বলো তো? মেয়েরা তো মতলব ছাড়া চলে না।"

"মেয়েদের সম্পর্কে এই আপনার ধারণা? আপনি তো খুব বাজে লোক মশাই।"

"কে বলেছে আমি ভাল? শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় কিছু শোনোনি? যাক সে সব কথা। খুব আর্জেন্ট কথা যদি থাকে বলো। না হলে ফোনটা রেখে দিচ্ছি। এখুনি আমায় ডাক্তারখানায় যেতে হবে।"

"শুনুন, শুনুন অর্কদা, রোববার সকালে আমরা দু'জন আপনার ওখানে যাচ্ছি। সকালের দিকে। থাকবেন কিন্তু।"

"থাকব। ছাড়ি তা হলে?"

"আচ্ছা।"

ফোনের সুইচ অফ করে দেওয়ার পরই দিবাকরদা নীচে নেমে এসে বলল, "অর্ক, আমি যাচ্ছি। ঝুলনকে দেখো।"

"তুমি কখন ফিরবে দিবাকরদা?"

"ঠিক নেই। রাতে পার্টি আছে। যদি আটকা পড়ে যাই, নাও ফিরতে পারি। তুমি আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো ভাই।"

আমি অবাক হয়ে দিবাকরদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অদ্ভুত লোক তো? এই একটু আগে দুষছিল বুলুদিকে। এখন বলছে, নিজেও আসবে না। বেলা দেড়টা নাগাদ আমি বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে। না হয় ইন্দ্রদাকে বলে একটু আগেই পালিয়ে আসব। কিন্তু মাঝের এই পাঁচ-ছয় ঘণ্টা বাড়িতে কেউ থাকবে না। তখন যদি ঝুলনের কিছু হয়? সামান্য রাগ হওয়া সত্ত্বেও বললাম, "চিন্তা কোরো না, আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।"

যেন ওই উত্তরটা শোনার জন্য দাঁড়িয়েছিল দিবাকরদা। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট কয়েক পর চিলেকোঠায় উঠে দেখি, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঝুলন শুয়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। মুখটা লালচে হয়ে গেছে। ওভানে বসে এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকালাম। অসুখ হলে মানুষ কত অসহায় হয়ে যায়। এই ঝুলন আমার সঙ্গে কম শয়তানি করেছে, আমাকে পাত্তাই দিত না। কথায় কথায় বুলুদির কানে মন্তর দিত। অথচ আজ আমি ছাড়া ওকে দেখার কেউ নেই। আর আমি? ওকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও ফেলে পালিয়ে যেতে পারছি না।

ওকে ডাকলাম, "ঝুলন, এই ঝুলন, কেমন আছিস?"

কোনও সাড়া শব্দ নেই। ওর কপালে হাত ছোঁয়ালাম। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলাম। লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বর দু'আড়াই হতে পারে। মেপে দেখলে হত। থার্মোমিটার কোথায় আছে, আমার জানা নেই। আদৌ আছে কি না, আমার সন্দেহ। আমার মন বলল, মহিম ডাক্তারকে একবার খবর দেওয়া উচিত। টেবিলে ক্রোসিন ট্যাবলেটের একটা ফাইল পড়ে আছে। তার মানে ট্যাবলেট খেয়েও জ্বরটা ওর কমেনি। কী মনে হল, ফের ডাকলাম, "ঝুলন।"

এবার সাড়া দিল। চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি?"

"থার্মোমিটার কোথায় আছে, জানিস?"

ইশারায় ঝুলন দেখাল বালিশের নীচে। তাড়াতাড়ি থার্মোমিটারটা বের করে আনলাম। কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে তারপর বললাম, "হাঁ কর তো। জ্বরটা মাপতে হবে।"

ঝুলন হাঁ করতেই থার্মোমিটার ওর মুখে দিয়ে বললাম, "গা-হাত-পা ব্যথা করছে?"

মাথা নাড়িয়ে ও জানাল, হ্যাঁ, তারপর চোখ খুলে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দু'চোখ করমচার মতো লাল। মনে হল, ও বিশ্বাস করতে পারছে না চিলেকোঠায়

এসে ওর শুশ্রূষা করছি। হঠাৎই ওর চোখের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা জল নেমে এল। তা দেখে আমার মনটা কেমন যেন করে উঠল। আমার মনের ভাব ও বুঝতে পারল কি না জানি না। চোখটা ফের বন্ধ করে রাখল। মিনিট দুয়েক পর ওর মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে এনে দেখি জ্বর প্রায় আড়াই। এত জ্বরে কী করা উচিত, সে সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তাই বললাম, "বাড়িতে আর কেউ নেই। তুই চুপ করে শুয়ে থাক। আমি মহিম ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ঝুলন বলল, "একটু জল খাওয়াবে অর্কদা?"

টেবিলের উপর জলের একটা বোতল দেখে আমি সেটা এগিয়ে দিলাম। হাতে ভর দিয়ে উঠে আধশোয়া হয়ে ঝুলন ঢকঢক করে জল খেয়ে বোতলটা আবার ফিরিয়ে দিল। তারপর দম নিয়ে বলল, "আমাকে ধরে একটু বাথরুমে নিয়ে যাবে? মাথা ঘুরছে। একা নীচে যেতে পারব না।"

আমার হাত ধরে ঝুলন উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ধরে ধরে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নামানো যাবে না। তাই পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। রাতে ম্যাক্সি পরে শুয়েছিল। ওকে কোলে তুলে নিতেই ঝুলন দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। নরম তুলতুলে একটা শরীর আমার কোলে। পূর্ণযৌবনা একটা মেয়ে। আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। ওর গাল আমার গলা স্পর্শ করে আছে। ওর শরীরের উত্তাপ আমি টের পাচ্ছি। হঠাৎ ওই তাপপ্রবাহ আমাকে একটু নতুন অভিজ্ঞতা দিল।

দোতলার বাথরুমটা বুলুদিদের। সেখানে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ঝুলনকে একতলায় নিয়ে এলাম। কলঘরের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললাম, "এবার পারবি?"

ঘাড় নেড়ে ঝুলন দরজা খুলে ঢুকে গেল। জলের কল খুলে দিয়েছে। চৌবাচ্চায় জল পড়ার শব্দ আসছে। এ এক অস্বস্তিকর মুহূর্ত। বুলুদি আর দিবাকরদার উপর রাগও হতে লাগল। স্বার্থপর কোথাকার। একটা দিন পরে হলদিয়ায় গেলে কী এমন ক্ষতি হত? বাথরুম থেকে ওয়াক ওয়াক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঝুলন বমি করছে। একটু পরেই বালতি সরানোর আওয়াজ। জল ঢালারও। তারপর আর কোনও সাড়া নেই। মাথা ঘুরে ঝুলন পড়ে গেল নাকি? দরজা ভেজানো। খুলে ঢুকে যাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েটা তো পাকা। পরে কী ভেবে বসবে, কে জানে। বাধ্য হয়ে ডাকলাম, "ঝুলন"।

দরজা খুলে ঠিক সেই মুহূর্তেই ও বেরিয়ে এল। চোখ-মুখে জল দিয়েছে। দরজায় ভর দিয়ে আচ্ছন্নের মতো ও বলল, "অর্কদা, আমায় একটু ধরবে? মাথাটা ফের ঘুরছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ওকে ফের পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। ঠিক করে নিলাম, এখনই চিলেকোঠায় নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আপাতত ও আমার ঘরে থাক। মহিম ডাক্তারকে ডেকে আনি। উনি কী বলেন, দেখি। তারপর না হয় ঝুলনকে উপরে রেখে আসা যাবে। বাচ্চা মেয়ের মতো ও আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। ওকে আমার বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর হঠাৎই আমার মনে হল, আচ্ছা আমার যদি অসুখ হয়, তা হলে কে দেখবে? আমার জন্য সময় নষ্ট করতে বুলুদির বয়ে গেছে। দিবাকরদাও বাড়িতে বসে থাকার লোক না। হয়তো এই ঝুলনই তখন আমার মাথার পাশে বসে জলপট্টি দেবে।

বিছানায় শোয়াতেই ঝুলন কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "আমার খুব শীত শীত করছে। ওপর থেকে কাঁথাটা এনে দেবে অর্কদা?"

পাশ ফিরে ঝুলন ঠকঠক করে কাঁপছে। দু' হাত বুকের কাছে জড়ো করা। পায়ের দিকে

ম্যাক্সিটা অনেকখানি উঠে এসেছে। উরুর অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। হা করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝুলনের গায়ের রং কালো। কিন্তু এই প্রথম লক্ষ করলাম, ওর ফিগারটা অসাধারণ। কোমরের কাছে ঢাল নেমেই চমৎকার উঠে এসেছে। কতই বা বয়স হবে? সতেরো-আঠারো। হঠাৎ ও যেন কেমন বড় হয়ে গেছে।

নিজেকে সামলে, ডিভানের তলা থেকে তাড়াতাড়ি লেপটা বের করে এনে ওর গায়ে চাপা দিয়ে দিলাম। এখুনি মহিম ডাক্তারকে ডেকে আনা দরকার। সদর দরজা খুলে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি সুজয়দা। উসকো-খুসকো চুল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা। আমাকে দেখেই ভেতরে ঢুকে এল। তারপর আমার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলল, "একটা জরুরি কথা আছে তোর সঙ্গে। চল, তোর ঘরে গিয়ে বসি।"

সর্বনাশ! ঘরে ঝুলন শুয়ে আছে। সুজয়দা দেখতে পেলে স্ক্যান্ডাল ছড়াবে। আমি পা চালিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালাম।

৬

সাউথ গেটের কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি আর সীতাংশু কথা বলছি, এমন সময় নিবারণদা এসে বলল, "অর্ক, আমাদের প্ল্যাটফর্মে এক ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছেন। ভাবগতিক দেখে আমার ভাল লাগছে না।"

বেলা তিনটে বাজে। এতক্ষণে নিবারণদার বাড়ি চলে যাওয়ার কথা। হয়তো এদিকে আসার সময় ভদ্রমহিলাকে চোখে পড়ে গেছে। তাই দমদমমুখী ট্রেনে ওঠেননি। আমাদের খবরটা দিতে এসেছেন। বললাম, "ভদ্রমহিলা এখন কোথায়?"

"নর্থ গেটের নীচটায়। বছর চল্লিশের মতো বয়েস। দেখেই মনে হল, একটু পাগলাটে ধরনের।"

সীতাংশু বলল, "সন্দেহটা আপনার হল কেন নিবারণদা?"

"পরপর চারটে ট্রেন ছেড়ে দিল। একবার আপ ট্রেনের দিকে যাচ্ছে। আরেকবার ডাউন ট্রেনের দিকে।"

"চলুন তো দেখা যাক।"

নিবারণদাকে নিয়ে এস. এস-দের ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরটায় একটা ক্লোজড সার্কিট টিভি আছে। সামনে বসলে স্টেশনের নানা অংশ দেখা যায়। যাত্রীরা মনে করেন, তাঁদের কেউ লক্ষ করছে না। কিন্তু তা নয়। টিভি সেটে সুইচ টিপে টিপে দেখলাম, সত্যিই নর্থ গেটের দিকে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা। পরনে আটপৌরে শাড়ি। বোধহয় কাজ করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়ে কী যেন বলছেন। তারপর অস্থিরভাবে কয়েক পা হেঁটে আবার ফিরে আসছেন থামের কাছে।

দেখেই বুঝতে পারলাম, গণ্ডগোল আছে। বিকেলের দিকে এই সময়টাই সব থেকে মারাত্মক। প্ল্যাটফর্ম একেবারে খা-খা করে। আর ঘণ্টাখানেক পর থেকে ভিড় শুরু হবে। চলবে রাত আটটা পর্যন্ত। মাস ছয়েক আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের সামনে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন গড়িয়ার এক গৃহবধূ। তাঁকে বাধা দেওয়ার মতো লোকও

তখন প্ল্যাটফর্মে ছিলেন না। ওই ঘটনার পর থেকে, আমরা ঠিক করেছি যাত্রীদের মধ্যে কোনও রকম অস্বাভাবিকত্ব দেখলে, সাধারণ পোশাকে আমরা কেউ না কেউ তাঁর আশপাশে ঘোরাঘুরি করব।

কম্পিউটারে দেখলাম, পরের ট্রেন আসতে মিনিট দশেক দেরি আছে। দু' দিকের ট্রেন প্রায় একই সময়ে আসবে। নিবারণদাকে বললাম, "আপনি আপ ট্রেন ধরে বাড়ি চলে যান। আমি আর সীতাংশু আছি। দু'জনে মিলে ভদ্রমহিলার দিকে লক্ষ রাখব।"

নিবারণদা বলল, "একটু চা খাওয়াতে পারিস ভাই? যদি বাইরে থেকে আনাতে হয়, তা হলে দরকার নেই।"

বললাম, "না। ফ্লাস্কে আছে। দাঁড়ান দিচ্ছি।"

"দে তা হলে। আর মাস পাঁচেক আছে রিটায়ারমেন্টের। বেশি দিন তোদের জ্বালাব না।"

সীতাংশু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, "কদ্দিন আপনার চাকরি হল নিবারণদা?"

"তা পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই। শুরু করেছিলাম ফেয়ারলি প্লেসে। সাতঘাটের জল খেয়ে পাতালে এসে জুটেছি। আমাকে নিয়ে এলেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, তোমার মতো স্পোর্টসম্যান আমার দরকার।"

টিভি পর্দার দিকে চোখ রেখে এতক্ষণ ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম। এখন সিঁড়িতে বসে আছেন। নিবারণদার মুখে চৌধুরী সাহেবের নাম শুনে ফিরে তাকালাম। এই ভদ্রলোকের কাছে আমার যাওয়ার কথা। যাওয়ার সময়ই পাচ্ছি না। বললাম, "দারুণ অফিসার ছিলেন চৌধুরী সাহেব, না নিবারণদা?"

চায়ে চুমুক দিয়ে নিবারণদা বললেন, "ওই রকম অফিসার আর হবে না। ওর আমলেই কলকাতার মেট্রো ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর হয়েছিল, ভাই। শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখা।"

সীতাংশু জিজ্ঞেস করল, "আমরা তো কখনও শুনিনি।"

"শুনবি কী করে? এই তো সেদিন জয়েন করলি। আসলে আমেরিকার একটা টিভি চ্যানেল এই সমীক্ষাটা করেছিল। ওরা বিশ্বের বারোটা শহরের মেট্রো রেলের ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে সোল, টোকিও, লস অ্যাঞ্জেলস—আরও কী কী শহর ছিল, অত এখন মনে নেই। সেই ছবি ওরা আমেরিকায় দেখিয়ে দর্শকদের ভোট চায়। কোন মেট্রো সেরা? সব থেকে বেশি ভোট পড়েছিল কলকাতার দিকে।"

চৌধুরী সাহেবের গল্প বলছেন নিবারণদা। আমাদের ভাল লাগছে। টিভি পর্দায় দেখলাম, ভদ্রমহিলা ফের হাঁটাহাটি করছেন। না, আর ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। নর্থ কাউন্টারে আছে চিত্তদা। ফোন করে সব বলে দিলাম। চিত্তদা বলল, "দু'জন ওয়াচারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা চিন্তা করিস না। জমিয়ে গল্প করে যা।" একটু পরেই পর্দায় দেখলাম, ভদ্রমহিলার আশপাশে দু'জন ওয়াচার ঘোরাঘুরি করছে। একজনের নাম জানি, প্রসাদ। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

চা খেতে খেতে নিবারণদা বলল, "মেট্রোর সব কিছুই দেখবি সারফেস রেলের থেকে আলাদা। এই যে ইউনিফর্মটা আমরা পরি, সেটাও চৌধুরী সাহেবের অবদান। উনি বলতেন, ইউনিফর্ম ইজ এ পার্ট অব ডিসিপ্লিন। রেলের লোকরা আগে জুতো পেতেন না। চৌধুরী সাহেব বোর্ড-কর্তাদের বোঝালেন, অত সুন্দর ইউনিফর্ম পরে কেউ যদি চটি পায়ে অফিসে

pathagar.net

আসে, ভাল দেখাবে না। শ্যু-এর ব্যবস্থা তো উনি করলেনই, সেই সঙ্গে বেল্টেরও ব্যবস্থা। উফ্ সে এক লোক ছিলেন, ভাই।"

"চৌধুরী সাহেব এখন কী করেন নিবারণদা?"

"ওসব লোক কী বসে থাকে? এখন কত বড় বড় কোম্পানির কনসালটেন্ট। তারপর কোথায় যেন পড়ানও। এই তো কিছুদিন আগে আমাদের এখান দিয়ে টাটা সেন্টারে গেলেন। দেখা হতে বললেন, মেট্রোর এ কী হাল করেছ তোমরা? সেই কালচারটাই তো আর নেই। কী উত্তর দেব। চুপ করে রইলাম।"

চিত্তদার মুখে অনেকদিন আগে একবার শুনেছিলাম, নিবারণদা নাকি স্পোর্টস কোটায় রেলের চাকরিটা পেয়েছিলেন। ওয়েটলিফটিংয়ে দু'বার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। এখন শরীর দেখে বোঝা যায় না। পেটের সমস্যায় একদম প্যাকাটি মেরে গেছেন। মানুষটা খুব স্থির। একদিনের জন্যও রাগতে দেখিনি। সব থেকে বড় কথা টিমম্যান। অন্যের কাজ আগ বাড়িয়ে করে দিতে এক পায়ে খাড়া। ইস্টার্ন বাইপাসের কোথায় যেন একতলা বাড়ি করেছেন নিবারণদা। মাস ছয়েক পর হাতিবাগানের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যাবেন। বাড়ির কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার বাড়ি কতদূর?"

নিবারণদা হতাশ গলায় বললেন, "সে ঝুলে আছে। এখনও ইলেকট্রিকের লাইন আসেনি। জলের ব্যবস্থা হয়নি। আমরা ভাই নর্থ ক্যালকাটার মানুষ। ইস্টার্ন বাইপাসের মতো জায়গা কি আমাদের মতো লোকেদের পোষায়?"

উত্তর কলকাতার লোক বলে খুব গর্ব নিবারণদার। কথায় কথায় সেটা প্রকাশও করে ফেলেন। এ নিয়ে মাঝে মধ্যেই লেগে যায় ইন্দ্রদা আর সীতাংশুর সঙ্গে। নিবারণদার ধারণা, দক্ষিণ কলকাতায় সব স্বার্থপর আর চালিয়াত লোকেদের বাস। উত্তর কলকাতার মতো খাঁটি মানুষ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইন্দ্রদা ভবানীপুরের লোক। মাঝে মধ্যেই শুনিয়ে দেন, উত্তর কলকাতার লোকেরা এখনও গামছা পরা অবস্থায় বসে রকে আড্ডা মারে। আমি মুর্শিদাবাদের ছেলে। কোনও দলে নেই। এসব চাপান-উতোর শুনে বেশ মজাই পাই। পাতাল রেলের দু'প্রান্তের দু'দল লোকের টিপ্পনী শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে। সীতাংশু তো আড়ালে নিবারণদাকে বলে, "গামছাদা।"

নিবারণদাকে বললাম, "বাড়িটা তা হলে ওখানে করলেন কেন?"

"ভুল করেছি। তোর বউদি নাচাল। আমিও নেচে উঠলাম। আর দু' দিন পর পাশ করে বেরলে মেয়েটা কোন কলেজে ভর্তি হবে, জানি না। একা একা যাতায়াত করতে হবে। মেয়েটারই অসুবিধে হবে। ও তো বলছে, বাপি বাড়িটা ওই অবস্থায় বিক্রি করে দাও। পাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও আমি থাকতে পারব না। এদিকে, তোর বউদি জেদ ধরে আছে। ওখানেই যাবে। যাক, আমার গল্প শুনে তোরা আর কী করবি। দেখ তো, ভদ্রমহিলা এখনও আছেন কি না?"

দু'জনেই টিভি পর্দার দিকে চোখ দিলাম। না, ভদ্রমহিলাকে দেখা যাচ্ছে না। দুই অত্যাচারেরও কোনও পাত্তা নেই। যাক, নিশ্চিন্ত। এই স্টেশনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটা মানে, আমাদের ভোগান্তি। "আপদ গেছে" বলে সীতাংশু উঠে দাঁড়াল। কথাটা শুনে নিবারণদা একটু অসন্তুষ্ট হলেন। একবার বিরক্তিভরা মুখে সীতাংশুর দিকে তাকিয়ে তারপর আমাকে বললেন, "চলি রে। বাড়ি থেকে সুজাতা একবার ফোন করেছিল। আর দেরি হলে বকুনি দেবে।"

সুজাতার কথা উঠতেই বললাম, "কেমন আছে ও?"

"তোর উপর খুব খেপে আছে। একদিন যাস না হাতিবাগানে। তোর কথা প্রায়ই বলে ঝর্না।"

নিবারণদা নীচে নেমে গেলেন। সীতাংশু গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিবারণদা রিটায়ার করলে ময়দান স্টেশন থেকে একটা মেয়ে আসবে ট্রাফিক সুপারভাইজার হয়ে। সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে—কবিতা নায়ার। এ নিয়ে সুজয়দা একটা ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করেছিল। পারেনি। কবিতা খুব কাজের মেয়ে। ইন্দ্রদাই ওকে নিয়ে আসছে। সে কথা জানাজানি হয়ে গেছে।

এস এস-দের ঘরে এখন আমি ছাড়া কেউ নেই। বাড়িতে একবার ফোন করলে হয়। বুলুদি এখনও হলদিয়া থেকে ফেরেনি। দিবাকরদাও দু' দিন উধাও। আজ ডিউটিতে আসার সময় দেখলাম, ঝুলন শুয়ে আছে। জ্বর নেই। তবে শরীরটা খুব দুর্বল। ওর জন্য মাঝে একদিন অফিসেই আসতে পারিনি। জ্বর এত বেড়েছিল, ঝুলন ভুলভাল বকতে শুরু করেছিল। প্রথম দিন তো হঠাৎ চোখ খুলে একবার বলল, "অর্কদা, তুমি যখন মহিম ডাক্তারকে ডাকতে গেলে, তখন একটা লম্বা-চওড়া লোক ঘরের ভেতর ঢুকেছিল। সেই লোকটা আমার ম্যাক্সি তুলে কী যেন সব দেখল।"

শুনে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। যা মেয়ে, পরে আমার ঘাড়ে না আবার দোষ চাপিয়ে দেয়। পরদিন সকালে খুঁজে খুঁজে রেখাদের বাড়িতে গিয়ে, ওকে ডেকে এনেছিলাম। গত কয়েকটা দিন সকালের দিকটা আমি সামলেছি ঝুলনকে। বিকেলে রেখা। ও তো ঝুলনকে একদিন বলেই ফেলল, "অর্কদা, তোর জন্য যা করেছে, তোর উচিত লোকটার পায়ের ধুলো নেওয়া।" রোজ কর্ডলেসটা আমি রেখে আসি চিলেকোঠায়। যাতে দরকার হলে ঝুলন আমাকে অফিসে ফোন করতে পারে। আমি নিজেও দু' দিন ফোন করে ওর খবর নিয়েছি।

ঝুলনের চাউনিটাই ইদানীং কেমন যেন বদলে গেছে। ওর মধ্যে তাচ্ছিল্যের সেই মনোভাবটা এখন আর দেখতে পাই না। ও বুঝে গেছে, এই বাড়িতে আমরা দু'জন একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। মাঝে একদিন, ডাইনিং রুমে চা করছিলাম। গায়ে জ্বর নিয়ে নেমে ঝুলন আমাকে বলল, "তুমি ঘরে গিয়ে বোসো। আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।"

চা নিয়ে এসে, ঝুলন ঘরে শুয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর দুর্বল গলায় বলল, "অর্কদা, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি। দিদিভাই এই বাড়ি থেকে নাচের স্কুলটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।"

"কেন রে?"

"সে অনেক ব্যাপার। সব শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। দিদিভাই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে প্রতাপাদিত্য রোডে। স্কুল করবে বলে সেই বাড়িটা খুব করে সাজাচ্ছে। এখনও কাউকে কিছু জানায়নি। তবু, আমি সব জেনে ফেলেছি।"

"দিবাকরদাও জানে না?"

"না। অর্কদা, আমার খুব ভয় করছে।"

নাচের স্কুল প্রতাপাদিত্য রোডে চলে যাওয়ার সঙ্গে ঝুলনের ভয় পাওয়ার কোনও সম্পর্ক আমি খুঁজে পাইনি। নিশ্চয়ই ও কিছু লুকিয়েছে। তাই চুপ করে ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ও বলেছিল, "রেখা বলছিল, রেলের লোকেরা নাকি থাকার জন্য কোয়ার্টার পায়? তুমি চেষ্টা করলে পাবে?"

আমি বলেছিলাম, "পেতে পারি। তবে তার জন্য অনেক ধরাধরি করতে হবে।"

ব্যস, ঝুলন আর কোনও কথা বলেনি। তারপর থেকে আমার মনে একটা কাঁটা গেঁথে আছে। ও কেন এই প্রশ্নটা করল? কার জন্য ও ভয় পাচ্ছে!'

বাইরে গেটের সামনে জোর তর্কাতর্কি হচ্ছে। সীতাংশুর গলা কানে আসতেই বেরিয়ে এলাম। গেটের এ পাশে পেইড এরিয়ায় সীতাংশুকে ঘিরে ধরেছে চার পাঁচজন অবাঙালি ছেলে-মেয়ে। দু' চারটে কথা শুনেই বুঝে গেলাম, সবার কাছে টিকিট নেই। দু'জন লাফিয়ে গেট পেরনোর চেষ্টা করেছিল। সীতাংশু আটকেছে। এ নিয়ে জোর কথা কাটাকাটি চলছে ওর সঙ্গে। টি-শার্ট আর জিনস পরা একটা মেয়ে খুব হম্বিতম্বি করছে, "ফাইন দেব না। যা পারেন, করে নিন।"

পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে, সবাই খুব পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে-মেয়ে। কলকাতা শহরে ইদানীং এই ধরনের কিছু অবাঙালি ছেলে-মেয়ে খুব অসভ্য আচরণ করছে। বাপের পয়সা আছে বলে, এরা মনে করছে, যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা পেয়ে গেছে। পাতাল রেলে চড়ার লোক এরা না। হয়তো মজা করার জন্যই চেপেছে। বিনা টিকিটে পাতাল রেলে ঘুরে আসার বাজিও ধরতে পারে। একজন বলল, "চাঁদনি চক স্টেশনে আমরা সবাই টিকিট কেটেছিলাম। বোধহয় দুটো টিকিট কোথাও পড়ে গেছে।"

আমাকে দেখে সীতাংশু জোর পেয়ে গেল। বলল, "দেখেছিস অর্ক, বিনা টিকিটে যাচ্ছে। অথচ গালাগাল দিচ্ছে।"

শুনে চশমা-পরা একটা ছেলে বলল, "মুখ সামলে কথা বলুন, আমরা বিনা টিকিটে যাচ্ছি না।"

গেটের সামনে ভিড় জমে গেছে। প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ছেলেমেয়েগুলোকে এস এস-দের ঘরের সামনে সরিয়ে এনে বললাম, "আপনাদের মধ্যে যাদের কাছে টিকিট নেই তারা প্লিজ আমার সঙ্গে ঘরে আসুন।"

চশমাপরা ছেলেটা চিৎকার করে উঠে বলল, "কেউ আপনার সঙ্গে যাবে না। যা বলার সবার সামনে বলুন।"

সীতাংশু ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "অর্ক, তুই এদের ছাড়িস না। আমি কালীঘাট থানায় ফোন করে আসছি।"

থানায় ফোন করার কথা শুনে ছেলেটার তড়পানি আরও বেড়ে গেল, "নিয়ে আসুন পুলিশ। আমরাও আপনাদের নামে কমপ্লেন করব, মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন।"

কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে গেল। অন্য লাইনে খেলছে। আজ থেকে সাত-আট বছর আগে হলে, ছেলেটার মুখ ফাটিয়ে দিতাম। কিন্তু ইউনিফর্ম পরে আছি। হাত চালানো যাবে না। হঠাৎই চোখে পড়ল, গেট দিয়ে ঢুকছেন ইন্দ্রদা। ভিড় দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "কী হয়েছে রে অর্ক।"

পুরো ঘটনাটা অল্প কথাতে বলতেই ইন্দ্রদা হেসে বললেন, "ছেড়ে দে। সব লেখাপড়া জানা ছেলে-মেয়ে। নিয়মটা জেনেও যদি ফাইন দিতে না চায়, তা হলে বুঝতে হবে, মেট্রো-কালচার এদের জন্য নয়।"

ছেলে মেয়েগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ইন্দ্রদার কথা শুনে। তারপর চশমা-পরা ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে আঙুল তুলে বলল, "কালচার শেখাচ্ছেন? কী ভেবেছেন আপনি?

আমরা সবাই আনকালচার্ড? উইথড্র করুন। না হলে ঝামেলা করে দেব। আই উইল টিচ ইউ আ লেসন, বাস্টার্ড।"

"এই শুয়োরের বাচ্চা, অনেকক্ষণ তোদের সহ্য করেছি।" বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে এগিয়ে এসে চশমা-পরা ছেলেটার কলার ধরল। তারপর বলল, "এরা তোদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। ফাইন না দিলে আমরাই তোদের পেটাব।"

চশমা-পরা ছেলেটা ধাক্কা মারতেই আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড মারধোর শুরু হয়ে গেল। "শালা, টিকিট কাটিসনি। তবুও চোটপাট করছিস।" চশমা-পরা ছেলেটাকে দু' তিনজন মিলে দমাদম লাথি মারছে। ছেলেটা মেঝেতে পড়ে গেছে। মুখ ফেটে রক্ত বেরচ্ছে। তা দেখে প্যাসেঞ্জারদের আমি আর ইন্দ্রদা টেনে সরিয়ে দিলাম। অন্য ছেলেগুলো গেট টপকে পালিয়ে গেছে। দুটো মেয়ে এত ভয় পেয়ে গেছে, দেওয়ালের ধারে গিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

চশমা-পরা ছেলেটাকে ধরাধরি করে আমরাই তুলে এনে এস এস-দের ঘরে বসালাম। মার খাওয়ার অভ্যেস নেই। ছেলেটা কেমন যেন পাংশুটে হয়ে গেছে। চোখের নীচে কালশিটের দাগ। চোখে চশমাটা নেই। বোধহয় কোথাও ছিটকে পড়েছে। ছেলেটা পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্ত মুছতে লাগল। স্পষ্ট দেখলাম, ওর হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

স্টেশন বিল্ডিংসের ওপরের তলাতে আর পি এফের ব্যারাক। কেউ সম্ভবত খবর দিয়েছিল। স্টেশন ইনচার্জ গজেন্দর সিংহ দশ-বারোজন কনস্টেবলকে নিয়ে নেমে এসেছেন। দু' চার মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা তিনি বুঝে ছেলেটাকে ঠাট্টা করে বললেন, "খুব লেগেছে?"

ও এমনভাবে তাকাল, মনে হল ভস্ম করে ফেলবে। অত মার খাওয়া সত্ত্বেও তেজ কমেনি। বলল, "আগে এখান থেকে বেরোই। উত্তরটা তারপর দেব।"

গজেন্দর বললেন, "ফাইন না দিলে তো এখান থেকে বেরতে পারবি না। পার্সে মালকড়ি আছে? না, বাবা কিছু দিয়ে পাঠায়নি।"

ক্ষিপ্ত হয়ে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটা বলল, "এই নিন। একটা রিসিট দেবেন।"

ইন্দ্রদা টাকাটা তুলে সীতাংশুকে বললেন, "একশো দশ টাকা কেটে নিয়ে বাকিটা ফেরত এনে দে।"

উঠে দাঁড়ায়ে গজেন্দর বললেন, "ইন্দরবাবু, এই ছেলে-মেয়েগুলোর নাম-ধাম লিখে আপনার কাছে রেখে দিন। পরে যদি ঝামেলা করে আমাকে ডাকবেন।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। রিসিট নিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেটা ইন্দ্রদাকে হুমকি দিয়ে গেল, "মিঃ চ্যাটার্জি, এর জন্য আপনাকে কিন্তু ফল ভোগ করতে হবে।" পাবলিককে দিয়ে আপনি আমাকে মার খাওয়ালেন। আমার বাবা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবেন না।"

ইন্দ্রদা কয়েক মিনিট গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "অর্ক, এই ছেলেটার বাবার নামটা কী দেখ তো?"

বললাম, "ও পি আগরওয়াল।"

"ও, বুঝেছি। আগরওয়াল এন্টারপ্রাইজের মালিক। লোকটার সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের অনেকের যোগাযোগ আছে। ঝামেলায় ফেলতে পারে। এখুনি কালীঘাট থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসতে হবে।"

"মেট্রো ভবনে জানিয়ে রাখলে হয় না?"

"কোনও লাভ নেই। চৌধুরী সাহেবের মতো লোক তো এখন নেই। মেট্রোর প্রতি ভালবাসাও কারও নেই। তবুও তুই যখন বলছিস, সি পি আর ও-কে না হয় জানিয়ে রাখব। আমাদের নিয়মে কত গলদ দ্যাখ। এই ছেলেগুলো যদি ফাইন না দিত, আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারতাম না। সারফেস রেলে কেউ বিনা টিকিটে ট্রাভেল করলে তাকে আটকে রেখে পরদিন কোর্টে প্রোডিউস করা যায়। আমাদের এখানে তো শাস্তি দেওয়ার কোনও নিয়মই নেই। শুধু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়।"

"সারফেস রেলের নিয়মটা কেন আমরাও অ্যাপ্লাই করতে পারব না ইন্দ্রদা?"

"চৌধুরী সাহেবকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, পেইড এরিয়ায় টিকিট পাঞ্চ না করে কেউ ঢুকতেই পারবে না। তা হলে উইদাউট টিকিট ট্রাভেল করার কোয়েশ্চেন আসছে কী করে?"

আজ এ নিয়ে দু'বার চৌধুরী সাহেবের কথা শুনলাম। ভদ্রলোকের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা নিবারণদা আর ইন্দ্রদাদের! না, আজই একবার ফোন করতে হবে ভদ্রলোককে। নিজের চোখে একবার দেখে আসতে হবে। ভবানীপুর থানায় যাওয়ার জন্য ইন্দ্রদা উঠে দাঁড়িয়েছেন দেখে বললাম, "ফ্লাস্কে চা আছে। একটু চা খেয়ে বেরোন ইন্দ্রদা।"

"দে তা হলে। মুডটাই খারাপ হয়ে গেছে।" বলে ইন্দ্রদা ফের চেয়ারে বসে পড়লেন।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে গ্লাসটা এগিয়ে দিলাম। আমার জন্যও ঢাললাম। গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ চোখ গেল টিভি সেটের দিকে। আরে, প্ল্যাটফর্মে নিবারণদা! বাড়ি যাননি? আচ্ছা লোক তো, এখনও সেই ভদ্রমহিলার পিছনে পড়ে রয়েছেন? পর্দায় ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ এখনও আটপৌরে শাড়ি পরা সেই ভদ্রমহিলা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা তা হলে আবার ফিরে এসেছেন?

মনের মধ্যে কুডাক দিয়ে উঠল। ভদ্রমহিলা দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছেন মানে, মনস্থির করেই এসেছেন। তবে যতক্ষণ না উনি কিছু করছেন, ততক্ষণ বাধা দেওয়া যাবে না। আর এক মিনিটের মধ্যে একটা ডাউন ট্রেন আছে। আমি নীচে নামার আগেই ট্রেন এসে যাবে। অনেক ট্রেন আবার আধ মিনিট আগে চলে আসে। কী করব, সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

চায়ে চুমুক দিয়ে ইন্দ্রদা বললেন, "হ্যাঁ রে, তোর বাড়ির ওই মেয়েটার জ্বর কমেছে?"

পর্দার দিকে চোখ রেখেই বললাম, "হ্যাঁ, কমের দিকে।"

একটা ডাউন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। এই সময় ট্রেনের স্পিড থাকে কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার। সিগন্যাল রুমের কয়েক গজ আগে হঠাৎ দেখলাম, নিবারণদা ভদ্রমহিলাকে ঝাপটে ধরেছেন। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের প্রথম কামরাটা পর্দা থেকে সরে গেল। কামরাগুলো একের পর এক চলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা প্ল্যাটফর্মে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। কয়েকজন যাত্রী সামনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। নিবারণদা নেই।

আমার হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা পড়ে গেল। ইন্দ্রদা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই কোনও রকমে বললাম, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইন্দ্রদা, শিগগির নীচে চলুন।"

সকালে ঘুম চটকে গেল বুলুদির ডাকে, "এই ভাই, ওঠ। এত বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস। তোর হলটা কী? আগে তো সেই ভোরবেলায় উঠতিস।"

ক'টা বাজে, দেখার জন্য ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে আটটা। কাল রাতে বাড়ি ফিরতে দেড়টা বেজে গেছিল। পাঁচিল টপকে ঢুকব কি না ভাবছি, এমন সময় দরজা খুলে দিয়েছিল ঝুলন। নিশ্চয়ই আমার জন্য জেগেছিল। ভেতরে ঢুকতেই চাপাস্বরে বলেছিল, "এত রাত অবধি কোথায় ছিলে অর্কদা? তোমার জন্য আমি ভেবে ভেবে মরছি।"

নিবারণদার কথা সংক্ষেপে বলতেই ঝুলন বলেছিল, "একটা ফোন করে দিলেই তো পারতে। তা হলে এত চিন্তা করতাম না।"

ঘুম থেকে উঠতেই তাই আজ এত দেরি হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম, এই সাত সকালেই বুলুদি স্নান সেরে নিয়েছে। নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে। দারুণ দেখাচ্ছে। বুলুদি এত সুন্দর যে, শত অপরাধ করলেও ওকে ক্ষমা করে দেওয়া যায়। এত লোকে এত কথা বলে, অথচ বুলুদির উপর কখনও আমার বিতৃষ্ণা জাগেনি।

"হাঁ করে কী দেখছিস। চট করে মুখ-হাত ধুয়ে নে। কাজ আছে।"

"তুমি কখন ফিরলে বুলুদি?"

"কাল রাতে। একটা কাজ কর তো। লেক মার্কেটে গিয়ে ভাল মাছ নিয়ে আয়। সুখিকে আজ নেমন্তন্ন করেছি। মাছ খেতে চেয়েছে। পাবদা আর তপসে মাছ নিয়ে আসবি। পাবদার সাইজ যেন ছোট না হয়।"

লেক মার্কেটে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। বাজার করা আমার ঠিক পোষায় না। বেহালায় এই কাজটা করতেন জেঠিমা। চেতলায় করে ঝুলন। আমার মনে হয়, যারা রান্না করে, তাদেরই বাজার করা উচিত। বেগুনের ভেতর পোকা আছি কি না, তারাই সব থেকে ভাল বুঝতে পারে। অথবা মোচা তেতো কি না। ঝুলন সদ্য জ্বর থেকে সেরে উঠেছে। ওকে বাজারে পাঠানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকেই লেক মার্কেটে যেতে হবে।

বাথরুমে গিয়ে জলের ঝাপটা দিতেই চোখ জ্বালাজ্বালা করতে লাগল। চট করে দাঁত ব্রাশ করে ঘরে ফিরে এলাম। বেলা দশটার মধ্যে আমাকে ইন্দ্রদার বাড়ি যেতে হবে। ওখান থেকে দু'জনে যাব নিবারণদার বাড়ি। সুজাতাকে নিয়ে মর্গে গিয়ে ডেডবডি ছাড়িয়ে আনতে হবে। তারপর কেওড়াতলা শ্মশানে যাওয়ার কথা। সারা দিনটা কীভাবে কাটবে, কে জানে? দিনের শুরুতেই এসে জুটল বাজার করার দায়িত্ব। বুলুদি ন' মাসে ছ' মাসে একবার বাজার যেতে বলে। না-ই বা করি কী করে। শেষ বার বলেছিল, মাস আটেক আগে। ফিল্মের এক ডিরেক্টরকে খাওয়ানোর জন্য। বুলুদি অবশ্য চান্স পায়নি সেই সিনেমায়।

বুলুদি আমার বিছানা গুছিয়ে দিচ্ছে। অভিনব দৃশ্য। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এত খাতির কেন, বুঝতে পারছি না। এই বুলুদি মাস চারেক আমার ঘরে পা দেয়নি। টানটান করে চাদর পাততে পাততে নিজের মনে বলল, "ঘরটা কী করে রেখেছিস ভাই। একটু গুছিয়ে রাখতে পারিস না?"

এসব কথায় কান না দিয়ে আমি পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিলাম। যে করেই হোক, সাড়ে ন'টার

মধ্যে আমাকে ফিরে আসতেই হবে। চান-টান আর করা হবে না বোধহয়। একেবারে শ্মশান থেকে অফিসে গিয়ে চান করে নিতে হবে। পাবদা মাছ আজ আমার ভাগ্যে নেই। কী আর করা যাবে।

"ভাই, তোর বিছানায় চুলের ক্লিপ এল কী করে রে?"

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলাম। বুলুদির হাতে কালো রঙের সরু একটা ক্লিপ।

নিশ্চয়ই ঝুলনের। আমার চোখে পড়েনি। দু' তিন দিন আগে কথা বলতে বলতে ও শুয়ে পড়েছিল। তখনই হয়তো খুলে পড়ে গেছে। ইস, বুলুদি আবার যেন কোনও বাজে সন্দেহ না করে বসে। আমি কোনও উত্তর দেওয়ার আগে বুলুদি বলল, "ঝুলনটা কী বল তো? যেখানে সেখানে নিজের জিনিস ফেলে রাখে। এই মেয়েটা দিন কে দিন ক্যালাস হয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত পেতে বললাম, "টাকা দাও। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে।"

ব্লাউজের ভেতর থেকে একশো টাকার তিনটে নোট বের করে, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বুলুদি বলল, "এক কিলো মুরগির মাংসও নিয়ে আসিস। সুখি আবার খুব চিকেন পছন্দ করে।"

বুলুদির পছন্দ-অপছন্দ মাঝে মধ্যে আমি বুঝতে পারি না। এই বুলুদিই সুখিজি সম্পর্কে প্রথম দিন বলেছিল, "দ্যাখ, দ্যাখ ঝুলন। লোকটার চাউনি দেখেছিস। যেন আমাকে চেটে খাচ্ছে।"

তখন ঝুলনও সীতাভক্ত মন্দাকিনী। উত্তর দিয়েছিল, "তোমার যা ফিগার দিদিভাই, সবাইকে একবার না একবার তাকাতেই হবে।"

"তুই আর পাকামো করিস না তো।" বুলুদি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু খুশি হয়েছিল। সুখির সঙ্গে খুব মাখামাখি দেখি এখন বুলুদির। জানি না, কে এখন কাকে চেটেপুটে খাচ্ছে। মনে হয়, পাল্লাটা বুলুদির দিকেই। যে হারে খরচা করে, দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই।

টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় বুলুদি বলল, "এ মা, একটু দাঁড়া তো ভাই। সুখি কী যেন বলবে তোকে। উপরে একবার আসবি?"

বললাম, "চলো। সুখিজি আছেন নাকি?"

"কাল অনেক রাতে পৌঁছে দিতে এল। আমি ওকে হোটেলে ফিরতে দিইনি। গেস্ট রুমেই শুয়ে ছিল। আজ লাঞ্চ খাইয়ে ছাড়ব।"

দিবাকরদা বাড়িতে নেই। এই অবস্থায় সুখিজিকে থাকতে বলা সমীচীন কি না, এখন আর তা নিয়ে ভাবি না। বুলুদি যা ইচ্ছে করুক, আমার কী? ওর চরিত্র না হয় খারাপ, মানলাম। কিন্তু দিবাকরদাই বা কী ধরনের মানুষ? সেদিন ঝগড়ার সময় বলল, "সুখবিন্দরের কাছে টাকা চাইলেই তো তুমি পাবে বুলু।" তার মানে, কী কারণে এই লেনদেন দিবাকরদা নিশ্চয়ই জানে। আর জেনেও তা মেনে নিয়েছে। দিবাকরদা তো আরও নোংরা চরিত্রের তা হলে?

দোতলায় উঠেই দেখলাম, সুখবিন্দর সিং ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। আমার দিকে চোখ পড়তে বললেন, "আসুন অর্কবাবু, আপনাকে কয়েক দিন ধরে খোঁজ করছিলাম। আমারই একটা দরকারে।"

সোফায় বসে বললাম, "বলুন।"

পরনে সিল্কের ছোপ-ছোপ দেওয়া লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখে মনেই হবে না, পঞ্জাবের লোক। হাইটও এমন কিছু বেশি নয়। বাংলায় ব্যবসা করতে এসে সুখিজি বাংলাটা বেশ ভাল শিখে নিয়েছেন। এর আগে দু' তিনবার ভদ্রলোককে দেখেছি। কিন্তু কখনও সামনাসামনি বসে কথা বলিনি। একবার দিবাকরদা আমাকে বলেছিল, "লোকটা খুব ভদ্র।"

সুখিজি খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, "মেট্রো রেলে শুভঙ্কর দত্ত বলে কাউকে আপনি চেনেন?"

নামটা এই ক'দিন আগে শুনেছি অমিয়র মুখে। শুক্লার হাজবেন্ড। আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তাকে সুখিজির কী দরকার? কৌতূহলী হয়ে বললাম, "ভদ্রলোককে এখনও দেখিনি। তবে যোগাযোগ করে নিতে পারি।"

"করুন তো। আমার খুব দরকার।"

"কেন?"

"আমি শুনলাম, মেট্রো রেলের পনেরোটা স্টেশন ফের নতুন করে সাজানো হবে। যাতে আগের মতো ঝকঝকে করা যায়। তার জন্য টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকার। আমার এক বন্ধু ওই কনট্রাক্ট পেতে চায়। এই শুভঙ্কর দত্তের হাতে সব ক্ষমতা।"

"আমাকে কী করতে হবে, বলুন?"

"একটু পাত্তা লাগাতে হবে, লোকটা ঘুষটুষ খায় কি না?"

এই খবরটা সুজয়দারাই দিতে পারবে। ইউনিয়নের লোক, ওরা সব খোঁজটোজ রাখে। বললাম, "দু' একটা দিন সময় পাওয়া যাবে?"

"দু' একটা দিন কেন, আপনি এক সপ্তাহ সময় নিন। কিন্তু পাক্কা খবর আনতে হবে। আমার বন্ধু রেলের কাজটাজ করে। কিন্তু এত টাকার কাজ করার দম ওর নেই। পিছনে আমার টাকা থাকবে। আপনাকে বিশ্বাস করে বললাম। এই কারণেই কনট্রাক্টটা পাওয়ার জন্য আমার এত ইন্টারেস্ট।"

সোফার উল্টোপ্রান্তে বসে আছে বুলুদি। বলল, "ভাই, খবরটা তুই এনে দিতে পারবি? এই মানুষটা আমার জন্য এত করছে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত করে দিস।"

সুখিজি বললেন, "আমার কাছে একটা খবর আছে। লোকটা নাকি খুব অনেস্ট। যদি সত্যিই তা হয়, তা হলে অন্য মেথড নিতে হবে। আপনি কনফার্ম করে দিন। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এর জন্য যদি কিছু টাকার দরকার হয়, আমি দিচ্ছি। সঙ্গে রেখে দিন।"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "না, না। টাকার দরকার নেই।"

"টাকার দরকার নেই? আশ্চর্যের কথা বলছেন! আপনার কাছ থেকে আমি শুধু শুধু কাজ নেব কেন অর্কবাবু? এটা ভাইটাল ইনফর্মেশন। আই শুড পে ইউ ফর দ্যাট। আপনার একটা খবরের জন্য আমার কোটি কোটি টাকা প্রফিট হবে। আপনি কমিশন নেবেন না কেন?"

বুলুদিও সায় দিল, "বোকার মতো কথা বলছিস কেন ভাই? সুখি যখন দিতে চাইছে, তুই নিবিই বা না কেন?"

সুখিজি হেসে বললেন, "ঠিক আছে; টাকার কথা পরে হবে। আপনি খবরটা তো আগে এনে দিন। আমি একবার মেট্রোর কাজে ঢুকতে চাইছি। একবার যোগাযোগ হয়ে গেলে, লোকটাকে পকেটে পুরে নোবো?"

কী মনে হল, বললাম, "শুভঙ্কর দত্তের সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান?"

"নিশ্চয়ই চাই। আপনি অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন?"

"পারব। তবে মেট্রো ভবনে নয়।"

"যেখানে বলবেন, যাব মশাই।"

"ঠিক আছে, সামনের রোববার সকালের দিকে আপনি ফ্রি থাকবেন। আমি সময়টা বলে দেব।"

"আরে, বাহ।" সুখিজি অবাক হয়ে বললেন, "তবে যে একটু আগে বললেন, ভদ্রলোককে দেখেননি?"

"সেটা ঠিক। তবে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলিয়ে দিতে পারি।" সুখিজি আর বুলুদি মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। মনে হল, দু'জনের মধ্যে ইশারায় কী যেন একটা কথা হয়ে গেল। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ঝুলন। বলল, "ফটিক বলে একজন সুখিজির খোঁজে এসেছে। কী বলব?"

বুলুদি ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওপরে নিয়ে আয়।"

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুখিজিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আর কিছু বলবেন?"

"না। তা হলে ওই কথাই রইল। রোববার আপনি আমাকে শুভঙ্কর দত্তের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই দেখি, ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়িওয়ালা আমারই বয়সী একটা ছেলে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। ঝুলন তাকে বলল, "সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে যান।"

স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। দুর্গাপুর ব্রিজের নীচ থেকে কয়েক মিনিট অন্তর অটো রিকশা পাওয়া যায়। বেহালা থেকে আসে। যায় রাসবিহারীর মোড়, গড়িয়াহাট এমনকী কসবা ব্রিজ পর্যন্ত। যে কোনও একটা অটোতে উঠলে লেক মার্কেটে পৌঁছে যাওয়া যাবে। অটোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি, ষষ্ঠীপদবাবু আমাকে ডাকছেন, "অর্কবাবু, ও অর্কবাবু, দোকানে একবার উঠে আসবেন।"

রাস্তার উল্টোদিকে নিত্যানন্দ মেডিকেল হল। তারই মালিক ষষ্ঠীপদবাবু। বয়স্ক মানুষ। দিনকে মাঝে মধ্যে নাচের স্কুলে দিতে আসেন। থাকেন গোবিন্দ আঢ্যি রোডে। ভদ্রলোককে খুব ভাল করে চিনি। ঝুলনের জ্বরের সময় প্রায় দিন ওঁর দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে গেছি। রাস্তা পেরিয়ে দোকানে ঢুকতেই ষষ্ঠীপদবাবু বললেন, "অর্কবাবু, নাচের স্কুলটা আপনার দিদি ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো?"

নাচের স্কুল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার খবরটা ঝুলন আমাকে দিয়েছিল। বললাম, "শ্যামাপাদিত্য রোডে।"

"তা হলে তো চেতলার মেয়েদের খুব অসুবিধে হবে। বিদিশা, মানে আমার ছোট নাতনি পাগল, দাদু তোমারই কষ্ট হবে। মেয়েটাকে রোজ অতদূর কে নিয়ে যাবে, বলুন তো পাটি?"

বললাম, "হ্যাঁ, অনেকের অসুবিধে হবে।"

"নাচের স্কুলটা এমনিতেই ছাড়িয়ে দিতাম। এ বছর ও হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। কিন্তু বাপের দিদি নাকি দল নিয়ে একটা ট্রিপ করছে বাংলাদেশে। বিদেশ যাওয়ার লোভও সংবরণ ছাড়তে পারছে না।"

কিছু না-বলাটা অভদ্রতা। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন শিখছে বিদিশা?"

"বউমা তো বলে, ভালই। টিচার হিসাবে আপনার দিদির তো তুলনা নেই। আর যে দু'টো মেয়ে আছে, তাদেরও খুব ধৈর্য। তা, আপনাকে যে কথাটা বলার জন্য ডাকলাম, সেটা বলি। হ্যাঁ মশাই, আমার নাতনিটা চান্স পাবে? আপনার দিদি তো পাশপোর্ট করিয়ে রাখতে বলেছে।"

দেওয়াল ঘড়িতে ঢংঢং করে ন'টা বাজল। ইস, অনেক দেরি হয়ে গেল। দশটার মধ্যে ইন্দ্রদার বাড়ি যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বলে উঠলাম, "চিন্তা করবেন না, তেমন হলে বুলুদিকে বলে দেওয়া যাবে।"

ষষ্ঠীপদবাবু বললেন, "এই কথাটাই মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না মশাই। মন্মথ কাল আমাকে বলল, ওর মেয়েটা নাকি চান্স পেয়ে গেছে। সবাইকে আগ বাড়িয়ে বলে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে গেছে। প্লিজ, একটু দেখবেন, আমার নাতনিটা যেন বাদ পড়ে না যায়।"

কথাটা শুনে মনে মনে হাসলাম। মন্মথবাবুকেও আমি চিনি। লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক। দু'জন মানুষের মধ্যে অদৃশ্য এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। ফয়দা তুলবে বুলুদি। ডোনেশন চেয়ে। বুলুদি যা ইচ্ছে করুক, আমার কী। "চলি তা হলে।" বলে আমি বেরিয়ে এলাম নিত্যানন্দ মেডিকেল হল থেকে। একই কারণে মিষ্টির দোকান থেকে মন্মথবাবু আমাকে ডাকতে পারেন। এই ভয়ে আমি আর দাঁড়ালাম না। হাঁটতে লাগলাম হিজড়ার মোড়ের দিকে।

শেতলা মন্দিরের কাছে পৌঁছতে, ঘ্যাচ করে একটা অটো এসে থামল আমার পাশে। চমকে উঠে দেখি, ছট্টু। সামনে নিজের পাশে জায়গা করে দিয়ে ও বলল, "উঠে আসুন অর্কদা, অফিসে যাচ্ছেন?"

ওর পাশে বসে বললাম, "না, বাজারে।"

"কাল বিকেলে আপনাদের ওখানে কী একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনলাম। আমি অবশ্য সন্ধের শিফটে গাড়ি চালাইনি। ভাইকে চালাতে দিয়েছিলাম। রাতে ও বাড়ি ফিরে বলল।"

যে ঘটনাটা এতক্ষণ ভুলে ছিলাম, ছট্টু সেটাকেই মনে করিয়ে দিল। সংক্ষেপে বললাম "হ্যাঁ। একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।"

"আমার ভাইটাকে তো আপনি চেনেন অর্কদা? এবার এম কম পরীক্ষা দিল। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। বাড়িতে বসে আছে। বললাম, বসে থেকে কী করবি। সন্ধের শিফটে গাড়িটা চালা। আমি একবেলা রেস্ট পাব। তোরও কিছু রোজগার হবে। দিন কয়েক হল চালাচ্ছে। ভালই কামাচ্ছে।"

ছট্টু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাল বিকেলের ঘটনাটা আমি মনে করতে চাই না। করলেই সুজাতার মুখটা ভেসে উঠছে। খবর পেয়ে ও যখন কালীঘাট স্টেশনে এল, তখন আমি আর ইন্দ্রদা মিলেও ওকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ও শুধু জিজ্ঞেস করছিল, "কাকু এবার আমাদের কী হবে? আমাদের কে বাঁচাবে?"

অটো চালাতে চালাতে ছট্টু ভাইয়ের কথা বলে যাচ্ছে। আগে বলত, "অটোর লাইনটা খুব বাজে, বুঝলেন অর্কদা। আমি এসে পড়েছি। হয়তো আর ফিরতে পারব না। কিন্তু ভাইটাকে এ লাইনে ভেড়াব না। অটোর লাইন, ভদ্রঘরের ছেলেদের জন্য না।" আজ বলল,

pathagar.net

ভাইটাও গাড়ি চালাচ্ছে। কী করবে, চাকরি বাকরির যা বাজার, পাস কোর্সে এম কম-দেরও কিছু জোটানো খুব মুশকিল। পিছনের সিটে তিন জন যাত্রীর মধ্যে একজন মহিলা। লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখলাম, ছট্টুর কথা শুনে তিনি মিটিমিটি হাসছেন।

"জানেন অর্কদা, রিসেন্টলি একটা জিনিস খুব চোখে পড়ছে। খুব খারাপ সেটা। সন্ধের দিকে কয়েকটা বাজে মেয়ে আপনাদের গেটের মুখে এসে সেজেগুজে রোজ দাড়িয়ে থাকছে। ওপেনলি পার্টির সঙ্গে দরদাম করছে। তারপর ট্যাক্সিতে তুলে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।"

মেয়েগুলোকে আমাদেরও যে চোখে পড়েনি, তা নয়। এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট আর ময়দান স্টেশন থেকে তাড়া খেয়ে ওরা এদিকে চলে এসেছে। দুর্গা ব্যানার্জি সে দিন একজনকে ধরেছিল। দু'টো চড় মারতেই সে বলে ফেলে, নিউ ব্যারাকপুরে থাকে। তবে পার্টি তুলে নিয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউর এক ফ্ল্যাটে যায়। ছট্টুদেরও তা হলে চোখে পড়েছে। গেটের সামনে থেকে রোজ ওরা প্যাসেঞ্জার তোলে। দেখলেই বুঝতে পারে, কে ভদ্রঘরের মেয়ে, কে নয়।

"পাতাল রেলের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অর্কদা। আপনারা একটু দেখুন। পুলিশকে বলে অবশ্য লাভ হবে না। আমাদের কাছে পয়সা খায়। ওদের কাছ থেকেও নেবে। পুলিশ হচ্ছে হারামিতে ভরা।" বেশ রাগ প্রকাশ পেল ছট্টুর কথাতে।

রাসবিহারীর মোড়ে অটো থেকে নেমে, লেক মার্কেটের দিকে যাওয়ার মুখে সুজয়দার বাড়িটা চোখে পড়ল। বেশ কয়েকবার এই বাড়িতে এসেছি। সুজয়দা আজ সকালের ডিউটিতে আছে। এখন পাওয়া যাবে না। হাতে সময় থাকলে বিপিন পাল রোডে নার্সিং হোমে গিয়ে একবার মিতা বউদির সঙ্গে কথা বলে যেতাম। অবশ্য কী কথাই বা বলব, একজন ক্যান্সার রোগীর সঙ্গে? ঝুলনের অসুখের সময় সেদিন উদভ্রান্তের মতো আমাদের বাড়িতে গিয়ে সুজয়দা যা বলেছিল, তাতে আর মাস তিনেকের বেশি বাঁচার সম্ভাবনা নেই মিতা বউদির। শুনে খারাপ লেগেছিল।

চাপ দিয়ে সুজয়দা সেদিন আমার কাছ থেকে হাজার দু'য়েক টাকা নিয়ে গেছিল নার্সিং হোমে বউদির কেমোথেরাপির জন্য। ভেতরে আমার ঘরে ঝুলন তখন শুয়ে। সুজয়দাকে কাটানোর জন্যই টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্যটা চোখে পড়লে স্ক্যান্ডাল রটাতে এক মিনিটও সময় নিত না সুজয়দা। জোর বেঁচে গেছিলাম সেদিন। অফিসের সবাই মিলে কিছু টাকা বউদির চিকিৎসার জন্য আমরা দেব ভাবছিলাম। এর মধ্যে কাল নিবারণদার ঘটনাটা ঘটে গেল।

লেক মার্কেটে ঢুকেই বেশ বড় সাইজের দশটা পাবদা মাছ কিনে ফেললাম। বুলুদি তপসে মাছও নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু মাছের বাজার পুরোটা ঘুরে কোথাও তপসে মাছ পেলাম না। না নিয়ে গেলে বুলুদি চটে যাবে। বলবে, "ভাই, কোনও কাজই কি পুরোটা তোর দ্বারা হবে না? গড়িয়াহাট মার্কেটে চলে গেলেও তো পারতিস।" এ কথাটা বুলুদি বলবেই। কিন্তু অতদূর যাওয়ার সময় এখন আমার হাতে নেই। যা টাকা হাতে আছে, তা দিয়ে বরং মুরগির মাংস কিনে নিয়ে যাই। সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমি মাংসের দোকানের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

খাঁচা থেকে মুরগি বের করে আনছে দোকানের মালিক। ওজন করে তুলে দিচ্ছে আমারই বয়সী একটা ছেলের হাতে। ছেলেটা নির্লিপ্তভাবে প্রথমে গলা জবাই করে, দ্রুত হাতে ছাল

ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে মাংস তুলে দিচ্ছে বাড়ানো থলিতে। ছেলেটার স্যান্ডো গেঞ্জিতে রক্তের দাগ কালচে হয়ে গেছে। গত বছর এই দোকানেই ছিটকে আসা রক্তের দাগে আমার একটা শৌখিন পাঞ্জাবি বরবাদ হয়ে গেছিল। ফের যাতে না হয়, যে জন্য সামনে দাঁড়ানো লোকটার আড়ালে সরে গেলাম।

ডান পাশের ফুটপাথে কাগজের স্টলের দিকে হঠাৎই চোখ গেল। সামনের পাতার নীচের দিকে ওটা কার ছবি? নিবারণদার না? হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে দেখি, বড় বড় হেডিং, "মহিলা বাঁচলেন, প্রাণ দিলেন মেট্রোর দধীচি নিবারণ।" সকালে বাড়িতে কাগজ দেখার সময় পাইনি। কালকের ঘটনাটা তা হলে বেরিয়েছে? দ্রুত পড়তে শুরু করলাম।

"নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এক মহিলাকে বাঁচিয়ে, নিজের মৃত্যু টেনে আনলেন মেট্রো রেলের ট্রাফিক সুপারভাইজার নিবারণ প্রামাণিক। নাকতলার গৃহবধূ ওই মহিলা মরতে চেয়েছিলেন। তিনি বেঁচে গেলেন। কারণ, চলন্ত ট্রেনের সামনে লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিবারণবাবু তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু নিবারণবাবুর মাথা ততক্ষণে গুড়িয়ে দিয়েছে সেই মেট্রো রেল, যেখানে তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘ পনেরো বছর। শনিবার সন্ধ্যায় কালীঘাট স্টেশনে নিবারণবাবুর ওই আত্মদানে সহকর্মীরা যুগপৎ বিস্মিত এবং শোকস্তব্ধ। তাঁদের মনে পড়ে গেল দধীচি মুনির কথা। যেন সেই পুণ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল তাঁদেরই চোখের সামনে। তাঁরা অভিভূত।"

'শনিবার বিকেল চারটের সময় যতীন দাস পার্ক থেকে ট্রেনটি কালীঘাট স্টেশন ঢুকছিল। ডাউন লাইনের প্ল্যাটফর্মে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন নিবারণবাবু টালিগঞ্জে তাঁর কোয়ার্টারে ফেরার জন্য। কিছুক্ষণ ধরেই তিনি লক্ষ করছিলেন প্ল্যাটফর্মে এক মহিলা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। মহিলাকে দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়। একবার তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে এভাবে ঘুরছেন কেন? ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে দেখতে মহিলাটি উত্তর দেন, 'এক আত্মীয় এসপ্লানেড থেকে আসবেন। তাই তিনি অপেক্ষা করছেন।'

ডাউন চারটে বারোর ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ার পরই মহিলাটি "আমি মরব, আমি মরব" বলে ট্রেনের দিকে ছুটে যান। তা দেখে নিবারণবাবু ঝাঁপিয়ে তাঁর শাড়িটি ধরে ফেলেন। কিন্তু ভারী শরীরের মহিলাকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি। ওই মহিলার সঙ্গে তিনিও মেট্রোর লাইনে পড়ে যান। ট্রেনের চাকা নিবারণবাবুর মাথা থেতলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার শরীরটা ঘষটাতে ঘষটাতে কিছুটা এগিয়ে যায়। যাত্রীদের চিৎকারে মেট্রোর তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

নিবারণবাবুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাঁর সহকর্মীরা যতটা হতবাক, ততটাই আশ্চর্য মহিলা বেঁচে যাওয়ায়। নিবারণবাবুর সহকর্মী অর্ক রায় চৌধুরী জানান, মহিলা নীচে পড়ার পরই, দুই লাইনের মাঝে নালায় গড়িয়ে যান। সৌভাগ্যবশত ট্রেনের চাকা তাঁর দেহ স্পর্শ করেনি। দেহের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। অর্কবাবুই প্রথমে লাফিয়ে নীচে নেমে আবিষ্কার করেন, মহিলা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন।"

'নাকতলার বাসিন্দা ওই মহিলা দুই সন্তানের জননী। তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভবানীপুর থানার ওসি জানান, মহিলা ইদানীং মনোরোগে ভুগছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর দুই প্রতিবেশী কালীঘাট স্টেশনে এসে হাজির হন। এই প্রতিবেদককে তাঁরা বলেন, সাংসারিক অশান্তির কারণেই তিনি জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে

পড়েন।'

'নিবারণবাবু এক সময় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ভারোত্তোলক ছিলেন। টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। কিন্তু অর্থাভাবে যেতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান। মেট্রো রেলের চিফ অপারেশনাল ম্যানেজার অরবিন্দ ঘোষ জানান, কর্তব্য পালনে নিবারণবাবু যে নজির রেখে গেলেন, মেট্রোর ইতিহাসে তা নেই। তিনি আরও বলেন, নিবারণবাবুর স্ত্রী অথবা মেয়েকে মেট্রোতে চাকরি দেওয়া হবে।'

খবরটা পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কাল সন্ধেবেলায় নিবারণদার দলা পাকানো দেহটা যখন সাদা চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছিল, তখন একদল ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টার এসেছিলেন। কেউ হয়তো তখন আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমার অত মনে নেই। একটা মানুষ আধঘণ্টা আগেও আমার সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করছিল, সেই মানুষটা এমনভাবে দলা পাকিয়ে যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি। সিঁড়ির উপর তখন ঝর্না বউদি পাথর প্রতিমা। এক ফোঁটা জল ফেলতে দেখিনি। কী ভাবছিলেন উনি তখন? জীবনে আরেকটা ভুল করে গেলেন নিবারণদা? না, নিবারণদার কথা আমি আর ভাববই না। আমার মতো রাফিয়ানের চোখেও জল এসে যাচ্ছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মাংস কিনে বড় রাস্তায় উঠে এলাম। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। মাছ নিয়ে অটোতে ওঠা যাবে না। লেক মার্কেট থেকে চেতলা—এত অল্প রাস্তা ট্যাক্সিওয়ালারা যেতে চায় না। কী করব ভাবছি; এমন সময় হঠাৎ চোখ গেল সুজয়দার বাড়ির দিকে। মিতা বউদি না? ভাল করে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ মিতা বউদিই। সুজয়দার ভেজা জামা-প্যান্ট শুকোতে দিচ্ছে, কাপড় মেলার তারে। আশ্চর্য! এই তো কালও সুজয়দা অফিস যায়নি, নার্সিং হোমে বউদির অবস্থা খারাপ বলে।

তা হলে বউয়ের অসুখ নিয়েও সুজয়দা দু'নম্বরি করছে?

PathagarNet

৮

পায়েলকে পয়সা দেওয়ার জন্য পেপসি কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, চেয়ারে বসে দুর্গা ব্যানার্জি লিটল ম্যাগাজিন পড়ছে। কোনও পুলিশকে আজ পর্যন্ত আমি লিটল ম্যাগাজিন পড়তে দেখিনি। বেশ মজা লাগল দেখে। ঠাট্টা করে বললাম, "বেশ সুখেই আছ তোমরা। ডিউটিতে এসে স্রেফ বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছ। কোনও কাজ-টাজ নেই। সাহিত্য পড়ার সেরা চাকরি।"

দুর্গা হেসে বলল, "হিংসে হচ্ছে বুঝি।"

বললাম, "না, হিংসে হবে কেন? দুঃখ পাচ্ছি। তোমাদের জন্য সরকারের কত টাকা জলে যাচ্ছে বলো তো?"

"আমাদের কত দরকার, এবার টের পাবেন।"

"কেন বলো তো?"

এদিক ওদিক তাকিয়ে দুর্গা তারপর বলল, "আজকের কাগজটা দেখেছেন? কিছু পড়েননি?"

"না, কাগজ আমি পড়ি না। পড়ার ইচ্ছে হয় না। টিভি-তে নিউজ দেখি। তাতেই সব জানা হয়ে যায়। একেকটা কাগজ একেক রকম লেখে। কোনটা ঠিক, বুঝতে পারি না।"

"বাপরে, এত কথা তো আমি জানতে চাইনি। আপনি পারেন বটে!"

"সরি। এবার বলে ফ্যালো, আজকের কাগজে স্পেশাল কী বেরিয়েছে।"

"বসিরহাটে একজন আই এস আই এজেন্ট ধরা পড়েছে। তার কাছ থেকে এমন কিছু ইনফর্মেশন পাওয়া গেছে, যা মারাত্মক। কলকাতায় ওরা প্রচুর আর ডি এক্স মজুত করেছে। এখানে কয়েকটা জায়গায় ওরা ব্লাস্ট করাতে চায়।"

"আই এস আই এজেন্ট, মানে পাকিস্তানের গুপ্তচর! তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো দুর্গা? এখানে ব্লাস্ট করানোর জন্য লোক পাঠিয়ে পাকিস্তানের কী লাভ?"

দুর্গা হেসে বলল, "লোক পাঠাবে কেন? এখানকার লোককে দিয়েই কাজটা করাবে। বসিরহাটে যে লোকটা ধরা পড়েছে, তার কাছে কলকাতার কয়েকজনের ফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। সম্ভবত তারাই আই এস আইয়ের হয়ে কাজটাজ করে। গত সপ্তাহে প্রতিটা থানায় রেড অ্যালার্ট করে দিয়েছেন সিপি। আমাদের কালীঘাট থানাও নড়েচড়ে বসেছে। আমাদের সুখের দিন বোধহয় গেল অর্কদা। কেননা, যতদূর আমরা খবর পেয়েছি, ওদের প্রাইম টার্গেট পাতাল রেল।"

বললাম, "ওদের সঙ্গে দেখা হলে প্লিজ বোলো, পাতাল রেলে এমন সময় যেন ব্লাস্টটা করে, যখন আমার ডিউটি নেই।"

"ঠাট্টা করছেন অর্কদা? আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব বুঝতে পারবেন। পাতালের প্রত্যেকটা স্টেশনে আমাদের লোক বাড়ানো হচ্ছে। তবে প্লেন ড্রেসে। দেখে আপনারাও বুঝতে পারবেন না। পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে অলরেডি ফোর্স বাড়ানো হয়েছে। এরপর থেকে প্রত্যেকটা লোককে চেক করে, তবেই নীচে নামতে দেওয়া হবে।"

"তা হলে তোমার সাহিত্য পড়া বন্ধু?"

"কেন পেছনে লেগেছেন আমার? আমার ভাই কবিতা-টবিতা লেখে। এই ম্যাগাজিনটা ওরা দু'চারজনে মিলে বের করে। প্রায়ই ধার-বাকি পড়ে যায়। তখন এসে আমার কাছে হাত পাতে। আজ ডিউটিতে আসার সময় ম্যাগাজিনটা ও গছিয়ে দিল। পাতাল রেলের ওপর একটা কবিতা ওরা রিপ্রিন্ট করেছে। বসে বসে সেটাই আমি পড়ছিলাম।"

পাতাল রেলের ওপর কবিতা? কখনও আমার চোখে পড়েনি তো! শুনে আগ্রহই জাগল। বললাম, "কই দেখি, কার লেখা?"

"অমরেশ বসু চৌধুরী। পড়ে মনে হচ্ছে, অনেকদিন আগের লেখা।" লিটল ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম। কবিতা সংখ্যা। কলকাতার উপর। আধুনিক কবিতা পড়তে আমার ভাল লাগে না। আসলে মানে বুঝি না। কী সব শব্দ ব্যবহার করে, আমার খুব কঠিন বলে মনে হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা কবিতার দিকে নজর গেল। কাশ ডুংরি পাতাল টিলায়। পড়তে শুরু করলাম।

'মাঘি চাঁদ আলো দেয় না
কাঁপুনি ধরায় না উত্তুরে হাওয়া
ধর্মতলায় আর পাবে না
কাশ ডুংরির নিকানো দাওয়া'

যাক বাবা, প্রথম চারটে লাইন বেশ সহজ। পড়ে অন্তত মানে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই

লাইনগুলোর সঙ্গে পাতাল রেলের সম্পর্ক কোথায় বুঝলাম না। পরের লাইনগুলো পড়তে শুরু করলাম।

'দেহাত থেকে তুলে আনা
টুকরো সাঁওতাল পরগনা
মহুয়া নাচ, মাতাল গান
এই শহরে আর পাবে না।'
'অনন্যোপায়া কুমারী মা
আর টানটান এই ধনুক ছিলা
ঘামের দাম মেলেনি ওদের
ঠিকানা ছিল পাতাল টিলা।'

পেপসি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারতিনেক এই কবিতাটা পড়লাম। একেবারে শেষ লাইনটা বেশ ধাক্কা দিল। 'ঠিকানা ছিল পাতাল টিলা।' অর্থাৎ কি না, পাতাল রেলের মাটি তুলে যে টিলাটা তৈরি হয়েছিল, তার কথাই কবি বলতে চেয়েছেন। কলকাতা জুড়ে বহু জায়গায় এ রকম ছোট ছোট টিলা তখন দেখা যেত পাতাল রেল তৈরি হওয়ার সময়। ইন্দ্রদার মুখে শুনেছি, ময়দানে গাঁধী মূর্তির সামনে এই রকম একটা টিলাতে একটা ছোটখাটো সাঁওতাল পরগনাই তৈরি হয়ে গেছিল। ওখানে থাকতেন সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, মিহিজাম থেকে আসা শ্রমিকরা। মাটি কাটানোর জন্য ওঁদের কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন ঠিকাদাররা।

ইন্দ্রদা বলেছিলেন, "বুঝলি অর্ক, ওই সময় রাতের দিকে ময়দানের পাশ দিয়ে গেলে সাঁওতালি নাচ দেখা যেত। সারাদিন খাটাখাটনির পর মহুয়া খেয়ে পুরুষরা মাদল নিয়ে বসত। আর মেয়েরা কোমর জড়িয়ে ধরে নাচত। খবরের কাগজে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে দেখে একদিন গেলাম ওখানে। ওদের ডুংরি দেখে তো আমি তাজ্জব। কলকাতায় আছি, না সাঁওতাল পরগনায়—সেদিন বুঝতেই পারছিলাম না। পাতাল রেলের কাজ শেষ হয়ে গল। ওরাও আস্তে আস্তে চলে গেল। ঠিকাদাররা ওদের খুব ঠকিয়েছিল, বুঝলি। অনেকের টাকা-পয়সাই ওরা মেরে দিয়েছিল। প্রায়ই মেয়েগুলো রেপড হত।"

কবিতাটা পড়ে হঠাৎই ইন্দ্রদার বলা ওই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। একটা লাইন মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল, 'অনন্যোপায়া কুমারী মা।' অর্থাৎ উপায়হীনা যে কুমারী মা হয়েছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে যে মেয়েটিকে মা হতে বাধ্য করা হয়েছে। সেটা তো ধর্ষণ করারই সমান। কাজ করতে এসে মেয়েটির কোনও উপায় ছিল না। তাকে লালসার শিকার হতে হয়েছে হয়তো। এই মেয়েগুলো নিশ্চয়ই এখনও সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর বা মিহিজামে বেঁচে আছে। কত দিন আগেকার কথা? যোলো-সতেরো বছর। তার বেশি অবশ্যই নয়। এই মেয়েগুলো বা তাদের অবৈধ সন্তানগুলো এখন কোথায় এবং কেমনভাবে আছে, কেউ কি তার খবর রাখে? মনে হয় না।

..... দুর্গা এতক্ষণ আমার দিকে কৌতূহল ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল। বলল, "অর্কদা, আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন, তা তো জানতাম না। লিটল ম্যাগাজিনটা আপনি রেখে দিন।"

"দেবে আমাকে?"

"নিয়ে যান। আমার বাড়িতেই এক গাদা ম্যাগাজিন ডাঁই করা আছে। কেউ এলেই ভাই তাকে গছিয়ে দেয়। তা, সত্যিই আপনি কবিতা পছন্দ করেন নাকি? আপনাকে দেখে অবশ্য তা মনে হয় না।"

বললাম, "কী মনে হয় বলো তো আমাকে দেখে?"

"আগে এক রকম মনে হত। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে অবশ্য ধারণাটা বদলেছে।"

আমি মজা পেয়ে বললাম, "আগে কী মনে হত?"

"আপনি একেবারে রসকষহীন। রোজ নিমপাতা খান। এমন কড়া মুখে বসে থাকতেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম, এই ছেলেটা কী রে, একটু হাসতেও জানে না?"

"ডিউটির ঠিক কোন সময়টায় তোমরা এই আলোচনাটা করতে দুর্গা? যখন কাউন্টারে বসতাম? মুখটা তো তেতো থাকবেই।"

"না। না। অন্য সময়ও। দেখে মনে হত, আপনি কারও প্রেম ভালবাসার ধার ধারেন না।"

দুর্গার সঙ্গে এতক্ষণ মজাই করছিলাম। কিন্তু শেষ কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কেন বলল এ কথা? খুব অল্প দিন হল, ও আমাকে দেখছে। আমাকে দেখলে বোঝা যায়? না জেনেই, একটা মোক্ষম জায়গায় ছুরি চালিয়ে দিল কেন মেয়েটা? ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎই মনে হল, বুকের মাঝখান দিয়ে কোথায় যেন টপটপ করে রক্ত পড়ছে। আমার ক্ষতটা দুর্গাকে দেখানো যাবে না। ওর সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক নেই।

আমার মুখের রং পাল্টে যেতে দেখে দুর্গা বোধহয় বুঝতে পারল, ওর মন্তব্যটা আমার ভাল লাগেনি। লজ্জা পেয়ে বলল, "রাগ করলেন অর্কদা? আমি কিন্তু অত ভেবে-টেবে কিছু বলিনি।"

বললাম, "না। রাগ করিনি। তোমার শেষ কথাটার উত্তর আমি দিতে পারি। এখন না। কোনও দিন সুযোগ পেলে দেব।"

কথাটা বলেই আমি আর দাঁড়ালাম না। এসএস-দের ঘরের পিছনকার বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে। জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার। বাথরুমের আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিই আমাকে দেখে মনে হয়, আমি অন্য কারও প্রেম-ভালবাসার ধার ধারি না? কোনও মানুষকে দেখে তা বোঝা যায়? নিজেকে দেখার তেমন সুযোগ হয় না। তাই চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলাম। কই, তেমন কিছু তো বুঝতে পারছি না।

নিজেকে শান্ত করে আমি ইন্দ্রদার ঘরে এসে বসলাম। সকালে জরুরি তলব পেয়ে ইন্দ্রদা মেট্রো ভবনে গেছেন। চক্রবর্তীদা প্যানেল রুমে। এসএস-দের ঘর এখন ফাঁকা। আধ ঘণ্টা আগে চক্রবর্তীদা আমাকে বলে গেছেন, "অর্ক, তুই তো গেটের ডিউটিতে আছিস, কানটা একটু খোলা রাখিস। আমাদের ঘরে ফোন-টোন এলে দৌড়ে এসে ধরিস।" চক্রবর্তীদা একটা কাজ দিয়ে গেছেন। ফাঁকা ঘরে বসে তাই লিটল ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলাম।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আমারও একবার ইচ্ছে হয়েছিল, লিটল ম্যাগাজিন বের করার। আসলে ইচ্ছেটা উসকে দিয়েছিল পিণ্টু। বনমালী নস্কর রোডে পাড়ার এক বন্ধু। তিন

pathagar.net

ভাগ খরচ ওর। বাকিটা আমাদের কয়েকজনকে জোগাড় করতে হবে। আমরা কয়েকজন ঝটপট কবিতা আর গল্প লিখে ফেলেছিলাম। হঠাৎ একদিন একটা লেখা এনে পিন্টু বলল, "অর্ক, বোনের এই লেখাটা ছাপতে হবে ভাই। না হলে বাড়ি থেকে মালকড়ি পাওয়া যাবে না। বোন বাগড়া দিয়ে দেবে।"

লেখাটা পড়ে দেখলাম, ছাপা যাবে না। এ নিয়ে পিন্টুর সঙ্গে আমার বেশ এক চোট রাগারাগি হয়ে গেছিল। অনেক বছর আগেকার কথা। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, পিন্টু বলেছিল, "তোর এত গোঁ কেন রে অর্ক? বোনের লেখাটা ছাপলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?" আমি বলেছিলাম, "তা হলে আমাকে ছেড়ে দে। ম্যাগাজিনটা তুই এডিট কর।" কথা হচ্ছিল পিন্টুদের বাড়ির সামনেই বড় মাঠটায় বসে। আমরা সেখানে ফুটবল খেলতাম। আমি, পিন্টু, অমিয়, প্রতাপ, ব্রজ, স্বপন...সবার নাম এখন আর মনে নেই।

এসএস-দের ফাঁকা ঘরে বসে ছোট বেলাকার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই নিজেকে আমি বনমালী নস্কর রোডে, বুলুদিদের সেই বাড়িতে আবিষ্কার করলাম। ওই বয়সেই তখন অমিয়র সঙ্গে আরতির প্রেম- ভালবাসা চলছে। প্রধান পরামর্শদাতা আমি। অমিয়কে দেখে তখন মনে হত, সত্যিই প্রেম বলে একটা জিনিস আছে। মাঝে মাঝে মজাও পেতাম। তিন জনে কোথাও দেখা হলে, গল্প গুজবের পর আরতি জিজ্ঞেস করত, "অর্কদা, কোনও মেয়েকে আপনার ভাল লাগে না।" তখন বলতাম, প্রেম-ট্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। সেই সময় অমিয় মিটিমিটি হাসত। একদিন বলেও ফেলেছিল, "অর্ককে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। খুব শিগগিরই দেখবে, আমরা চারজন হয়ে যাব।"

ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় একদিন সন্ধেবেলায় বাড়িতে ফেরার পর বুলুদি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ভাই শুক্লা নামে কোনও মেয়েকে তুই চিনিস?"

চট করে নামটা তখন মনে পড়েনি। বলেছিলাম, "না তো।"

চোখ পাকিয়ে বুলুদি বলেছিল, "ফের মিথ্যে কথা। পিন্টুর ছোট বোনটাকে তুই চিনিস না?"

আমার মনে কোনও পাপ নেই। বলেছিলাম, "চিনব না কেন? রোজই তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।"

"মেয়েটা হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে গায়ে পড়ে আলাপ করে গেল কেন রে? কোনও বদ মতলব নেই তো?"

"তা, আমি কী করে জানব?"

"ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল কেন? ওর দিদিটাকে চিনি, কৃষ্ণা। আমাদের স্কুলেই পড়ত। হাবা ক্যাবলা টাইপের ছিল। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না, ভাই। মেয়েটাকে এড়িয়ে চলিস।"

সেদিন কথা না বাড়িয়ে আমি সরে পড়েছিলাম। পরে লক্ষ করতাম, মাঠে আমি ফুটবল খেলতে নামলেই দোতলার বারান্দায় শুক্লা এসে হাজির হত। পিন্টুর বাবাকে ও পাড়ার সবাই এক ডাকে চিনতেন। পয়সাওয়ালা লোক, পাড়ার পুজোর প্রেসিডেন্ট। পিন্টুর সঙ্গে মেশার কোনও যোগ্যতাই ছিল না আমার। লজ্জায় ওদের বাড়িতে আমি ঢুকতামও না। লক্ষ্মী পুজোর দিন পিন্টু আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করত। সেদিনটা আমি পালিয়ে

বেড়াতাম। ওই ষোলো বছর বয়েসেই মনের ভেতর কে যেন সিগন্যাল দিয়েছিল, খবর্দার। কোনও রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না।

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে শুক্লার সঙ্গে দেখা হলে আমি মাথা নিচু করে হাঁটতাম। মনে একটা ভয়ই কাজ করত, ও যদি কথা বলে, আর সেটা যদি বুলুদির কানে যায়, আমাকে তা হলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। শুক্লা পড়ত সেন্ট টেরিজা স্কুলে। কাছেই আমাদের স্কুল সেন্ট টমাস। মিনিবাসে একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলাম, ও ঠিক আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে আরও দু'তিনটে মেয়ে। আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠেছিল, একই সঙ্গে দু'জনকে বাস থেকে নামতে, পাড়ার কেউ দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ভয়ে আমি তারাতলায় নেমে পড়েছিলাম।

কলেজে ওঠার পরই পাড়ায় আমার খুব বদনাম হয়ে গেছিল। বুলুদির সঙ্গে রাস্তায় অসভ্যতা করেছিল জয় নামে পাড়ারই একটা ছেলে। বাড়িতে ফিরে সে কথা শোনার পর আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ওর বাড়িতে গিয়ে মারধর করে এসেছিলাম। পাড়ায় রটল, বুলুর ভাইটা মাস্তান হয়ে গেছে। আমিও তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেলাম। পিন্টুদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। লক্ষ্মী-পুজোয় ও আর আমাকে নেমন্তন্ন করত না। আমাকে দেখলে শুক্লাও আর এসে বারান্দায় দাঁড়াত না। রাস্তায় কখনও দেখা হলে তখন ও-ই মুখ নিচু করে হেঁটে যেত।

পাড়ার নিত্যনতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তাম। বুলুদি ইচ্ছে করলে ওই সময় আমাকে সরিয়ে আনতে পারত। তা না করে, উল্টে আমাকে ভাঁতিয়ে দিত, "ভাই রঞ্জনটাকে একটু টাইট দিস তো।" অথবা "পরিমলটা খুব বাড়াবাড়ি করছে। রনিকে উল্টো পাল্টা বলেছে। ভাই, একটু দেখিস তো।" বুলুদি তখন রনিদার প্রেমে পাগল।

পাড়ায় অমিয় ছাড়া আর কেউ তখন আমার সঙ্গে মেশে না। একদিন ও এসে বলল, "অর্ক জানিস, পিন্টুর সঙ্গে রতার এক চোট ঝামেলা হয়ে গেছে।"

রতা আমাদের পাশের পাড়ার টপ মাস্তান। কথায় কথায় পেটে চাকু মেরে দেয়। শুনেছিলাম, ওর কাছে নাকি একটা পিস্তলও আছে। পিন্টুর মতো ভাল ছেলের সঙ্গে ওর তো লাগার কথা নয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন রে?"

"শুক্লাকে নিয়ে ঝামেলা। ইলোরায় সিনেমা দেখতে গেছিল শুক্লা। ওখানে রতার দলের একটা ছেলে নাকি ওর হাত ধরে টেনেছিল। শুক্লা সোজা বেহালা থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসে। পুলিশ বোধহয় অ্যাকশন নিয়েছিল। পরদিন রতা দু'তিন জন ছেলেকে নিয়ে এসে পিন্টুকে ভয় দেখিয়ে গেছে। বলেছে, 'তোর বোনকে যদি রেপ না করি, আমার নামে কুকুর পুষবি।'

অমিয়কে বলেছিলাম, "রতাটা খুব ডেঞ্জারাস ছেলে। শুক্লাকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলিস।"

"একটা কথা বলব তোকে?"

"বল।"

"তোর সম্পর্কে শুক্লার কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে।"

"কী করে বুঝলি?"

"আমাকে প্রায়ই তোর কথা জিজ্ঞেস করে। বলে, ও হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন অমিয়দা?"

"তুই কী উত্তর দিস?"

"কী উত্তর দেব বল তো? আমি নিজেও তো মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। তোর বুলুদিই তোর সর্বনাশ করে দিল। কিছু মনে করিস না। কথাটা বললাম বলে।"

"না। না। তুই ঠিকই বলেছিস।"

"পার্ট ওয়ান পরীক্ষাটা দিবি না।"

"কী করি বল তো। কিছুই যে পড়িনি। আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি।"

"তোর যা ট্যালেন্ট, তোর জন্য পাঁচ মাসই যথেষ্ট। প্লিজ, মারপিট ছেড়ে এখন পড়াশুনোটা কর। যা নোটস তোর দরকার আমি দেব।"

ঠিক তারপরই শুভজিৎ স্যার বাড়িতে এসে আমাকে পড়াতে শুরু করলেন। আমি নিয়মিত কলেজ যাওয়া শুরু করলাম। মোটামুটি একটা সুস্থজীবনে ফিরে এসেছিলাম। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছিল। অমিয় পাড়ার সব্বাইকে বলে বেড়িয়েছিল, "অর্ককে তোরা ফালতু ছেলে বলতিস, দ্যাখ, ছেলেটার মধ্যে কত পার্টস আছে।" আমরা দু'জন ঠিক করেছিলাম, কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসব। বুরোক্র্যাট হব।

ওই সময় দিবাকরদাকে কীভাবে বুলুদি পাকড়াও করেছিল, আমার তা মনে নেই। সম্ভবত নাচের কোনও প্রোগ্রামে। একদিন কথায় কথায় জেঠিমাকে বলেছিল, "মা, আমি দিবাকরের সঙ্গে রেজেস্ট্রি করে ফেলেছি। তুমি যদি কোনও অনুষ্ঠান করতে চাও, করতে পারো। আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই, ও সব ন্যাকামির।" জেঠিমা কোনও অনুষ্ঠান করেননি। একদিন হঠাৎই বুলুদি দিবাকরদাদের চেতলার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। রনিদার বাড়ির লোক তো বটেই, পাড়ার লোকও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

প্রায় একটা বছর আমি ভাল ছেলের মতো পড়াশোনা করে পার্ট টু পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম। এরপরই শুক্লাকে নিয়ে সেই ঘটনাটা ঘটল। অমিয়দের বাড়িতে বসে সন্ধেবেলায় আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ পাড়ার একটা ছেলে এসে খবর দিল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে অমিয়দা। পিন্টুদাকে প্রচণ্ড মারধর করে রতা শুক্লাদিকে তুলে নিয়ে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, "কোথায় গেছে রে?"

"পুকুরের ধারে নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটাতে।"

মিনিট তিনেকের মধ্যেই সেই ফ্ল্যাট বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে। প্রথমেই আমি একটা রড তুলে নিয়ে ভ্যানের ড্যাশবোর্ডটা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম। ভেতর থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে এসেছিল। অন্ধকারে সে আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই রডের আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিল। আমার সারা শরীরে তখন আগুন জ্বলছে। ফ্ল্যাট বাড়িতে জানলা-দরজা কিছু বসানো হয়নি। একলাফে আমি জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, ফের নেমে এসে অমিয় ফিসফিস করে বলেছিল, "শুয়োরের বাচ্চাটা ওপরে নেই। নীচেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।"

দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম, "অমিয়, তুই বেহালা থানায় চলে যা। রতাকে আমি একাই বুঝে নিচ্ছি।"

অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই অন্ধকারের মাঝে দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠেছিল। হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে রতা বলেছিল, "তোর নামই তা হলে অর্ক। বনমালী নস্কর রোডের এক নম্বর খানকিটার ভাই।"

খানকি কথাটা শুনে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছিল। ধমকে উঠেছিলাম, "চুপ শালা,

কাওয়ার্ড কোথাকার। একটা মেয়েকে তুলে এনে বীরত্ব দেখাচ্ছিস। সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে লড়। বাস্টার্ড।"

দেশলাইয়ের কাঠিটা পুড়ে শেষ হয়ে যেতেই রতা বলেছিল, "তা হলে ঠিকই শুনেছি, তোর সঙ্গে প্রেম ভালবাসা আছে এই মাগি-টার। তুই নতুন মাস্তান হয়েছিস, তাই না? হিরোইনকে বাঁচাতে এসেছিস। কিন্তু .....।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই হাতের রডটা ছুড়ে মেরেছিলাম। 'ওয়াক' বলে রতা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছিল। এই সব গুণ্ডা বদমাশকে সময় দিতে নেই জানতাম। ও নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে ওর কাছে গিয়ে ডান পায়ে লাথি চালিয়েছিলাম। অন্ধকারে আশপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামনে একটা দরজা। পুকুরের ওপার থেকে কোনও একটা বাড়ির আলো তেরছাভাবে এসে পড়েছে। সেই আবছা আলোয় চোখে পড়েছিল, পাশের ঘরের মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে শুক্লা। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

এক লাফে সেই ঘরে পৌঁছে গেছিলাম। পায়ে ঠেলা লেগে একটা বোতল গড়িয়ে গিয়েছিল। তার মানে, রতা বসে মাল খাচ্ছিল। হাতে একটা কিছু অস্ত্র রাখা দরকার ভেবে হামাগুড়ি দিয়ে কাচের ভাঙা বোতলটা তুলে নিয়েছিলাম। ঠিক করেই ফেলেছিলাম, রতার পেটে বোতলটা ঢুকিয়ে দেব। ঠিক তখনই রতা এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ডান পাশে এক হাত দূর থেকে রতার চোখ তখন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সময় দিলে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। বাঁ হাতের মুঠোয় বোতলটা শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আমি ফের এক লাথি মেরেছিলাম।

দেওয়ালের ওপাশে রতা ঠিক কোথায়, বুঝতে পারছিলাম না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে আমি দরজার দিকে যেতেই, হঠাৎ আমার পেটের মধ্যে কী যেন একটা ঢুকিয়েই ফের বের করে নিয়েছিল রতা। যন্ত্রণায় ডান হাত দিয়ে পেটটা চেপে, আমি বসে পড়েছিলাম। রতার হাতটা ফের উঠছে। সেটা নেমে আসার আগেই আমার কিছু করা দরকার। কথাটা মনে হতে, বিদ্যুৎগতিতে বাঁ হাতে ধরা ভাঙা বোতলটা আমি ওর তলপেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। দরজার ওপাশে দড়াম করে আছাড় খেয়েছিল রতা। এমন চিৎকার করে উঠেছিল, আমাকে আর পরে লোক ডাকতে হয়নি।

আমার পেট দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল। তারপর কী হয়েছিল, আমার আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরেছিল বিদ্যাসাগর হাসপাতালে। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল দু'দিন। যা সত্যি, তাই বলেছিলাম। রতার চাকুতে আমার পেটে বারোটা সেলাই করতে হয়েছিল। পরে শুনেছি, রতার অণ্ডকোষ দু'টো বাদ দিতে হয়েছে। তবে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেনি। কেননা, শুক্লা নাকি স্বীকারই করতে চায়নি, রতা ওকে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট বাড়িতে নিয়ে গেছিল। শুক্লার বাবা পুলিশকে বলেছিলেন, "দু' দল রাফিয়ানের মধ্যে লড়াই। এর মধ্যে আমার মেয়েকে আপনারা জড়াবেন না।"

বারোটা সেলাইয়ের দাগ এখন আমার পেট থেকে মেলায়নি। ওই ঘটনার পর বহুদিন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, কেন সেদিন শুক্লাকে বাঁচানোর জন্য অমন একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম! আমি রাফিয়ান? অমিয় অবশ্য শুক্লাকে দোষ দিতে চায়নি। বলত, "এ ছাড়া ওর অন্য কোনও উপায় ছিল না রে। আফটার অল একটা মেয়ে তো।" শুনে মনে মনে হাসতাম। ওর মান-মর্যাদার ব্যাপার আছে। আমার নেই। দুঃখ হত, যখন ভাবতাম, পিন্টু অথবা শুক্লা দু' জনের কেউই আমাকে হাসপাতালে দেখতে পর্যন্ত আসেনি।

ওই ঘটনার পরই বুলুদি জোর করে আমাকে চেতলায় নিয়ে আসে। বনমালী নস্কর রোডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়ে যায় একমাত্র অমিয়র জন্য। রোজই ও ফোন করত। মাঝে মধ্যে চেতলায় আসতও। শুক্লাদের উপর রাগ আমার ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মেয়ে ভীরু ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকত। পরনে স্কুলের পোশাক। কথা বলার সাহসটুকুও যার নেই। পুজোর দিন সামনে ঘোরাঘুরি করত বটে চোখাচোখি হলে মুখ নামিয়ে নিত।

এই মেয়েটা যদি সেদিন পুলিশকে সত্যি কথাটা বলত, হয়তো আমিও প্রেম-ভালবাসার ধার ধারতাম। "দুর্গা, কী করে বলি, তোমাকে এত কথা!"

৯

সুজয়কে নিয়ে সমস্যায় পড়েছি আমরা। রোজ একেক জনের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। টাকার জন্য হাত পাতছে। এসএস-দের ঘরে আমাদের কয়েকজনকে বাধ্য হয়েই ডেকেছেন ইন্দ্রদা। বললেন, "সুজয়টাকে নিয়ে কী করা যায় বল তো তোরা?"

সে দিন মিতা বউদিকে বাড়িতে দেখে আমার মনে একটা খটকা লেগেছে। তাই বললাম, "আমাদের কারও উচিত, মিতা বউদিকে একবার দেখে আসা। ঠিক কী স্টেজে আছে, জেনে আসা দরকার। তারপর না হয় বউদির ট্রিটমেন্টের জন্য কিছু টাকা পয়সা তুলে দেওয়া যাবে।"

সীতাংশু বলল, "অর্ক ঠিক বলেছে ইন্দ্রদা। সুজয়দা এক নম্বর চিটিংবাজ। ওঁর কথা বিশ্বাস করা যায় না।"

ইন্দ্রদা বললেন, "মিতা আছে কোথায় এখন, কেউ জানিস?"

বললাম, "আমি জানি। বাড়িতে।"

"তা হলে ডিউটির পর একবার খোঁজ নিয়ে আসবি? শুনলাম, এখন নাকি কেমোথেরাপি চলছে। এ অবস্থায় নাকি মানুষ দেখতে বিচ্ছিরি হয়ে যায়। চুল উঠে যায়। অত সুন্দর লাইভলি একটা মেয়ে কী রোগে পড়ল, দ্যাখ।"

সুমন্ত বলল, "অর্ক, তুই একবার আজ যা না। তোর বাড়িটা তো সব থেকে কাছে।"

বললাম, "যেতে পারি। আমার কোনও অসুবিধে নেই। সুজয়দা সেই সময় বাড়িতে না থাকলে ভাল হয়।"

ইন্দ্রদা বললেন, "ভালই হল। সুজয়ের আজ বিকেলের ডিউটি। তবে আসবে কি না, জানি না। ও তো আজকাল অফিসে আসাই ছেড়ে দিয়েছে। হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউন্ড। কিছু বলতেও পারি না। যাকগে। তা হলে ওটাই ঠিক রইল। অর্ক, তুই আজ মিতাকে দেখে আসতে যাচ্ছিস। কাল রিপোর্ট দিবি।"

সীতাংশু, সুমন্ত আর চিত্ত কাউন্টারে চলে গেল। আমি বসে রইলাম। ইন্দ্রদা আজ পুরো ইউনিফর্মে রয়েছেন। খুব হ্যান্ডসাম লাগছে দেখতে। আমাদের মতো বয়সে কত মেয়ের মাথা ঘুরিয়েছেন, কে জানে? নিবারণদার মুখে শুনেছি, একটা সময় ইন্দ্রদা ফার্স্ট ডিভিসন ক্রিকেট খেলেছেন। কয়েকবার কাগজে নামও বেরিয়েছে। নিজের সম্পর্কে ইন্দ্রদা কিছু বলতে চান না। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। ইন্দ্রদা কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন, "ছাড় তো, সব পুরনো দিনের কথা।"

ইন্দ্রদার স্ত্রীকে আমরা কেউ দেখিনি। অনেকদিন আগে মারা গেছেন। ইন্দ্রদার ছেলে মৃগাঙ্ক বাঙ্গালোরের কোনও এক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন মুম্বইয়ে চাকরি করে। ইন্দ্রদার কোনও পিছুটান নেই। আমি খুব শ্রদ্ধা করি লোকটাকে। কারও ওপর রাগ পুষে রাখেন না। সুজয়দার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল নয়। তবুও আমি জানি, ইন্দ্রদা মিতা বউদির জন্য টাকা তুলে দেবেন।

উল্টো দিকের চেয়ারে বসে ইন্দ্রদাকে লক্ষ করে যাচ্ছি। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন টেলিফোনে। চোখ-মুখের রংই বদলে গেছে। অফিসের কেউ হলে এত ফিসফিস করে কথা বলতেন না ইন্দ্রদা। হতে পারেন সেই মহিলা, যার কথা মিত্তিরদা বলেছিলেন। আচ্ছা, এই চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছর বয়সেও কি কারও পক্ষে প্রেম করা সম্ভব? নাকি সেটা শুধু দৈহিক প্রেম। ইন্দ্রদা এখনও যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান। শরীরের চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। সেটা যদি এক মহিলার সম্মতি নিয়ে মেটান, তাতে ক্ষতি কী? সেটা এত খারাপ ভাবেই বা আমাদের দেখতে হবে কেন?

"এই যে মশাই শুনুন।" চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি, দরজার সামনে মুখ তেতো করে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। বোধহয় অফিসে যাচ্ছেন। ঘাড় ঘোরাতেই ভদ্রলোক রুক্ষ গলায় বললেন, "গুরুদ্বারার গেটের দিকে আজ দু'দিন ধরে দেখছি, ইলেকট্রিক ঘড়িটা খারাপ হয়ে আছে। ট্রেনের টাইম বুঝতে পারছি না। ওটা ঠিক করার ব্যবস্থা করবেন?"

ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া, আর টিকিট খারাপ হওয়া—এ দু'টো অভিযোগ শুনতে আমরা অভ্যস্ত রোজ। সামান্য ত্রুটি দেখলেই কেউ না কেউ এসে বলে যাবেন। একদিন একটু জোরে গান বাজানো হচ্ছিল, এক ভদ্রমহিলা এসে বিরক্তি দেখিয়ে গেলেন, "ভলিউমটা একটু কম করে দিতে পারছেন না আপনারা?" চৌধুরী সাহেবের স্লোগানটা মনে হয় লোকের মনে গেঁথে গেছে, "আই কেয়ার ফর ইউ, ইউ কেয়ার ফর মেট্রো।" একেক সময় ভালও লাগে, যাত্রীরা যখন এসে অভিযোগ করেন। মেট্রোর প্রতি ভালবাসা না থাকলে এটা হয় না।

"আমাদের কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে।"

ভদ্রলোক কথাটা একটু জোরেই বললেন। মনে হল, রেগে আছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এখুনি দেখছি।"

"কালও কিন্তু কমপ্লেন করে গেছিলাম।"

দু'দিন ঘড়িটা বন্ধ; সাধারণত এ অবস্থা হয় না। ঘড়ির নীচেই বসে থাকে ওয়াচার-রা। তাদের কেউ না কেউ এসে তা হলে খবর দিয়ে যেত। মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, "আশ্চর্য, এ রকম তো হওয়ার কথা নয়।"

"কী ডিউটি করেন আপনারা? বসে বসে শুধু মাইনে নেন।" ভদ্রলোক সহজে নিষ্কৃতি দেবেন বলে মনে হল না। উনি ফের বলেন, "মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়েই আছি, আপনারা ফোনে কথাই বলে যাচ্ছেন।"

ইন্দ্রদা ফোনটা নামিয়ে রেখেছেন। এ ধরনের ঝামেলাবাজ প্যাসেঞ্জারদের খুব সুন্দর ম্যানেজ করেন ইন্দ্রদা। আমাকে বললেন, "অর্ক, যা তো এখুনি গিয়ে ঘড়িটা ঠিক করে আয়। ওয়াচারগুলো সত্যিই আজকাল কাজকর্ম করছে না।" তারপরই ভদ্রলোককে বললেন, "আপনার হাতে কি দু'তিন মিনিট সময় আছে? প্লিজ, একটা চিঠি লিখে যান।"

কথাটা শুনে একটু যেন নরম হলেন ভদ্রলোক। বললেন, "আমার হাতে সময় নেই। ন'টা চোদ্দোর ট্রেনটা আমায় ধরতে হবে। প্লিজ, মেট্রোটাকে আপনারা একটু ঠিকঠাক রাখুন। একেক দিন খুব বিরক্ত লাগে, কোনও কিছু বেঠিক দেখলে।"

ইন্দ্রদা বলল, "স্বাভাবিক। কোনও ডিস-অর্ডার দেখলে অবশ্যই আমাদের বলবেন।"

"এই তো সেদিন....যতীন দাস পার্কে দরজা কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। আপনাদের ড্রাইভাররা দৌড়োদৌড়ি করে ডিটেক্ট করতে পারলেন না, গণ্ডগোলটা ঠিক কোথায়। প্রায় আধ ঘণ্টা লেট। অফিস পৌঁছলাম দশটা আঠারোয়। ব্যস, হাফ ডে ক্যাজুয়াল নিতে হল।"

ইন্দ্রদা বলল, "আসলে কী জানেন, যখন মেট্রোর জন্য রেক কেনা হয়েছিল, তখনই আমাদের একটা ভুল হয়েছিল। কিছু রেক কেনা হয়েছিল ভেল থেকে। আর কিছু কর্নাটকের এন জি ই এফ থেকে। যত সমস্যা এখন দেখা দিচ্ছে এন জি ই এফ-এর রেক থেকে। দরজায় মুখোমুখি মাইক্রো সুইচ আছে। দু'পাশ থেকে এই সুইচ এসে ঠিকমতো লাগলে তবেই মোটরম্যানের কেবিনে আলো জ্বলে ওঠে। মোটরম্যান তখন বুঝতে পারেন দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে। অনেক সময় হয় কী, কেউ দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালে অথবা ঠাসাঠাসি ভিড় হলে ওই মাইক্রো সুইচ ঠিকমতো লাগে না। ফলে গাড়ির মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। মাইকে বারবার বলা সত্ত্বেও দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানোটা আমরা বন্ধ করতে পারছি না। ফলে অসুবিধেয় পড়ছেন আপনাদের মতো কিছু প্যাসেঞ্জার।"

ভদ্রলোক আরও নরম হয়ে গেলেন। বললেন, "আসলে কী জানেন, আমরাই অনেকে অশিক্ষিত। সেদিন মহাত্মা গাঁধী রোডে দেখি, একটা লোক কফ ফেলছে জানলা দিয়ে। চাঁদনি চক থেকে কিছু আনকা লোক ওঠে, সহ্য করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ধরলাম। এটা কী করলেন? আরও কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো। তখন বলে কি না, হামকো মাফ কিজিয়ে জনাব।"

শুনে ইন্দ্রদা বললেন, "আপনি ঠিক করেছেন। লোকটা আর কোনওদিন অসভ্যতামি করবে না।"

ভদ্রলোক ইন্দ্রদার সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন। টি ভি সেটে দেখলাম, ন'টা চোদ্দোর আপ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। ফের দশ মিনিট পর ট্রেন এই অফিস টাইমে। সে কথা বলতেই উনি "এ হে হে, লেট হয়ে গেল" বলে দ্রুত নীচে নেমে গেলেন। ইন্দ্রদাকে বললাম, "আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে ইন্দ্রদা। দারুণ ট্যাকল করলেন কিন্তু।"

ইন্দ্রদা বললেন, "কিছুই না। শুধু ধৈর্য ধরে এদের কথা শোনা। দেখলি যেই চিঠি লেখার কথাটা বললাম, অমনি বলল সময় নেই। যা, তুই একটু ঘড়িটা চালু করার জন্য খবর দিয়ে আয়। রাস্তা থেকে ট্রেনের টাইমটা দেখতে না-পেলে সত্যিই লোকের অসুবিধে হয়।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় ফোন। ইন্দ্রদার সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, ময়দান স্টেশন থেকে করেছেন মোহিনীদা। দু'টো একটা কথা বলেই ইন্দ্রদা হাত তুলে আমাকে দাঁড়াতে বলল। কী ব্যাপার, কোনও ঝামেলা হল নাকি? ফের চেয়ারে বসে পড়লাম। ফোনটা ছেড়েই ইন্দ্রদা বলল, "অর্ক, আয় তো, গেটের দিকে একটু নজর রাখতে হবে।"

"কেন ইন্দ্রদা?"

"ময়দান স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে এক ভদ্রলোকের পকেটমারি হয়েছে। মোহিনীদা বলল, তিনজনের একটা দল। দু'টো ছেলে আছে, টি শার্ট আর জিনস পরা। মেয়েটার পরনে নীল

সালোয়ার-কামিজ। চোখে আবার সানগ্লাস। চল, ধরতে হবে।"

বললাম, "যদি রবীন্দ্র সদন বা নেতাজি ভবনে নেমে যায়?"

"বোধ হয় নামবে না। সক্কাল বেলা পকেটমারি করতে বেরিয়েছে। মনে হয়, সারফেস ট্রেন কানেকশন আছে, এমন জায়গায় নামবে। হয় কালীঘাট, না হয় রবীন্দ্র সরোবর। এই দু'টোই আউটলেট। হয় বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে উঠবে, না হয় লেক গার্ডেন্স থেকে। কেননা, ওখান থেকে বজবজ লাইনের ট্রেন পাওয়া যায়। যা, গেটটা তুই লক করে দে। আমিও থাকছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালাম এ এফ সি গেটের কাছে। একটা ডাউন ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্মে। আন্দাজ অনুযায়ী, এই ট্রেনটাতেই পকেটমারি হয়েছে। গলগল করে লোক উঠে আসছে। এসকালেটর আর সিঁড়ি—দু'দিকেই নজর রাখবি। হ্যাঁ, নীল সালোয়ার-কামিজ পরা একটা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। চোখে সানগ্লাস, কাঁধে সাইড ব্যাগ। দেখে বোঝার উপায় নেই, একটু আগে ময়দান স্টেশনে দুষ্কর্মটি করে এসেছে।

গেটের কাছে এসে মেয়েটা থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখছে। সম্ভবত, আর দুই সঙ্গীকে খুঁজছে। ইন্দ্রদার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার টিকিট অন্য কারও কাছে আছে বুঝি? তা হলে একটু সরে দাঁড়ান।"

মেয়েটা বলল, "আমার সঙ্গে আরও দু'জন আছে। টিকিট তাদের কাছে।"

"তারা কোথায়?"

"আসছে। ওই তো.....জিনসপরা দু'জন।"

তিনজন একসঙ্গে হতেই আমি বললাম, "আপনাদের টিকিটটা একবার দেখাবেন?"

একটা ছেলে টিকিটটা এগিয়ে দিল। উল্টে দেখলাম, তিনজন উঠেছে শোভাবাজার স্টেশন থেকে। গেট দিয়ে প্রচুর লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সময় কিছু করা মানে, ঝুঁকি নেওয়া। তাই বললাম, "টিকিটে গণ্ডগোল আছে। আপনারা একবার আসবেন এস এস-দের ঘরে? এই টিকিটটা মেশিনে ফেলে দেখতে হবে।"

ছেলেদুটো চোখাচোখি করে বলল, "যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের তাড়া আছে।"

তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রদার ঘরে এসে বসলাম। ময়দান স্টেশনে ফোন করা দরকার। যার পকেটমার হয়েছে, সেই ভদ্রলোক এসে শনাক্ত না করলে এই তিনজনকে পুলিশে দেওয়া যাবে না। ময়দান স্টেশনে ফোন করতেই ও প্রান্তে ধরলেন মোহিনীদা। বললাম, "অর্ক বলছি। তিনজনকে পাওয়া গেছে। বসিয়ে রেখেছি। আপনি কালীঘাট স্টেশনে ভদ্রলোককে নিয়ে আসুন।"

মোহিনীদা উচ্ছ্বসিত, "ওদের ধরেছ? ওয়ান্ডারফুল। আমি দশ মিনিটের মধ্যে তোমাদের ওখানে আসছি।"

একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুকে তাঁকে বসিয়ে দিলেন ইন্দ্রদা। পাশেই দুর্গা ব্যানার্জি আর আই বি-র দু'জন। দুর্গাকে দেখেই মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, "এটা কী হচ্ছে? একজন ভদ্রমহিলাকে আপনারা আননেসেসারি হ্যারাস করবেন?"

এতদিন পর দুর্গা একটা কাজ পেয়েছে। চুলের মুঠি ধরে মেয়েটাকে তুলে বলল, "এই,

কদ্দিন ধরে পকেটমারি করছিস, বল। একদম চেল্লাবি না।"

যন্ত্রণাতেই হোক, অথবা পাবলিক জড়ো করার জন্য, মেয়েটা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, "আপনি কিন্তু ঠিক করছেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। লাগছে।"

চিৎকার শুনে দরজার সামনে দু'চারজন উঁকি মারছেন। দেখি, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মনোময়বাবু। বোধহয় কিছু বলার জন্য এ দিকে এসেছিলেন। ভেতরের নাটক দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বয়স্ক মানুষ। কিছু না বললে ভাল দেখায় না। তা ইশারায় অপেক্ষা করতে বললাম।

ঠাস করে চড় মারার একটা শব্দ হল। মেয়েটার সানগ্লাস ছিটকে পড়ল। দুর্গার এই রূপ আগে কখনও দেখিনি। মেয়েটাকে বলল, "এই, ঢপ দিবি না। পার্সটা কার কাছে আছে, বল। না হলে মারতে মারতে তোকে শেষ করে দেব।"

আই বি-র দু'জনও ছেলে দু'টোকে মারধর করছেন। ওদের পকেট হাতড়েও পার্সটা পাওয়া গেল না। আমি আর ইন্দ্রদা একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমরা ঠিক লোককে ধরেছি তো? যদি তা না হয়, আমাদের স্টেশনের খুব বদনাম হয়ে যাবে। খবরের কাগজে ঘটনাটা বেরলে, মেট্রো ভবন থেকে শো কজের চিঠি আসবেই। মেয়েটা সমানে হম্বিতম্বি করে যাচ্ছে। "পার্স, কীসের পার্স? আপনি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।"

দুর্গাও হার মানার মেয়ে নয়। হঠাৎ বলল, "অর্কদা, আমার মনে হচ্ছে, পার্স এরা এ দিক-ও দিক ফেলে দিয়েছে। দেখুন তো। চেয়ার, টেবল বা কম্পিউটারের তলায় পান কি না?"

কথাটা শুনে আই বি-র একজন বললেন, "আমি দেখছি।"

এর মধ্যেই মোহিনীদা এসে পড়লেন। সঙ্গে সেই ভদ্রলোক। মেয়েটাকে দেখে উনি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেই মেয়েটা। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এরই কাজ।"

ইন্দ্রদা জিজ্ঞেস করলেন, "কত টাকা ছিল পার্সে?"

"পাঁচ হাজার টাকা। পাঁচশো টাকার দশটা নোট। মেয়ের বিয়ে। তাই গড়িয়াহাটের দোকানে যাচ্ছিলাম, বেনারসী কিনব বলে। ভাবলাম, পাতাল রেলটা অনেক সেফ। রাসবিহারী পর্যন্ত যাই। ওখান থেকে একটা অটো বা ট্যাক্সি ধরে নেব। এখন দেখছি, পাতাল রেলেও পকেটমারি হচ্ছে।"

ইন্দ্রদা চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, "আগে কখনও হয়নি। এই প্রথম। আর এই যাতে শেষ হয়, তা দেখছি।"

আই বি-র ভদ্রলোক এই সময় উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, "ইন্দ্রবাবু, পেয়েছি। এই দেখুন, পার্স। কম্পিউটরের তলায় পড়েছিল। ম্যাডাম ঠিক আন্দাজ করেছেন।" পার্সটা তলা থেকে তুলে এনে উনি টেবলের ওপর রাখলেন। সেটা দেখে মোহিনীদার সঙ্গে আসা ভদ্রলোক বললেন, "এই তো, এটা আমার।"

পার্স দেখে দুর্গা দ্বিগুণ উৎসাহে মেয়েটার হাত মুচড়ে ধরেছে। হিসহিস করে বলল, "বাথরুমে চল। দেখি, তোর শরীরে আর কোথায় কী আছে। মেট্রো রেলে পকেটমারি? দ্যাখ, আজ তোর কী অবস্থা করি।"

নির্মমভাবে ধাক্কা আর লাথি মারতে মারতে দুর্গা মেয়েটাকে পিছনের বাথরুমে নিয়ে গেল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। চড়-চাপড় খেতেই ছেলে দু'টো সব স্বীকার করে ফেলল। তিনজনের বাড়িই ক্যানিং লাইনে। মেয়েটার নাম, পুতুল দাস। হায়ার সেকেন্ডারি পাস। না, কোনও গ্যাংয়ের সঙ্গে নেই। মেয়েটা একবার চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল। তারপর

থেকে পকেটমারি করে। মেট্রোয় আগে কখনও এ কাজ করেনি। কাল দুপুরে মেয়েটাই ওদের দু'জনকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে।

বাথরুম থেকে মারধরের আওয়াজ পাচ্ছি। দুর্গার চোটপাট আর মেয়েটার গোঙানি। ইন্দ্রদা কালীঘাট থানায় ফোন করে দিলেন। ছেলেদু'টো মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। বোধহয় ভাবতেও পারেনি, এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে খবর চলে আসবে। আর আমরা ওঁত পেতে থাকব। মোহিনীদা বারবার বলতে লাগলেন, "অর্ক, তোমরা আজ একটা প্রিসিডেন্ট করে রাখলে। খবরটা আমি কাগজে দিয়ে দিচ্ছি। লোকে জানুক, আমাদের মেট্রো কতটা সেফ।"

মিনিট খানেকের মধ্যেই মেয়েটাকে মারতে মারতে দুর্গা ঘরে নিয়ে এল। তারপর ধাক্কা মেরে মেঝেতে ওকে বসিয়ে দিয়ে বলল, "ইন্দ্রবাবু, শুধু পকেটমারি নয়, পুতুলরানির আরও ইনকাম আছে। রাতে সোনাগাছিতে ছিলেন। শ' পাঁচেক টাকাও উনি কামিয়েছেন। বেশি লোভ করতে গিয়ে এই হাল। এখান থেকে অটো ধরে এঁরা তিনজন বালিগঞ্জ স্টেশনে যেতেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে ক্যানিং। প্ল্যানটা আপনাদের জন্য ভেস্তে গেল।"

মনে মনে দুর্গাকে তারিফ করছি। পরনে পুলিশের পোশাক। সিঁথির দু'পাশে টান টান আঁচড়ানো চুল। পিছনে বেণী খোঁপা। লাবণ্যভরা মুখ। আগে যাতায়াতের পথে চোখাচোখি হলে মিষ্টি মিষ্টি হাসত। ইদানীং ভাল পরিচয় হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করে। কিন্তু এই মেয়েটা যে প্রয়োজনে এত টাফ হতে পারে, কল্পনাতেও আনতে পারিনি। মিনিট পনেরোর মধ্যে তিন পকেটমারকে কালীঘাট থানায় চালান করে দুর্গা ফের ওর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

দরজার সামনে থেকে ভিড় সরে গেছে। ম্যাগনেটিক গেটের সামনে ফের সেই পুরনো ব্যস্ততা। একদল দ্রুত উঠে আসছে। আরেক দল ট্রেন ধরার তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে যাচ্ছে। মেট্রোর কালচারই বোধহয় এ রকম। কোনও কিছু দীর্ঘমেয়াদি নয়। যতক্ষণ কিছু ঘটছে, ততক্ষণই তা নিয়ে উত্তেজনা। তারপর আর তার চিহ্ন থাকে না।

"জানেন ইন্দ্রবাবু, একটা পুরনো ঘটনার কথা আজ মনে পড়ল।" মনোময়বাবু হঠাৎ বললেন। খেয়ালই করিনি, ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। এতক্ষণ চুপচাপ বসে নাটক দেখছিলেন। কিছু বলার জন্য বোধহয় এসেছেন। ভদ্রলোককে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তার অনেক কারণ আছে।

"একবার লস অ্যাঞ্জেলিসের মেট্রোতে কোথায় যেন যাচ্ছিলাম।" মনোময়বাবু বললেন, "মাসখানেক হল আমেরিকায় গেছি। তেমন অভিজ্ঞতাও নেই। তা, মেট্রোতে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম, একটা লম্বা চওড়া কালো ছেলে কোনও একটা স্টেশন থেকে উঠে, সাদাদের গালিগালাজ করতে লাগল। কামরায় খুব বেশি লোক নেই। যারা ছিল, তারাও কেউ প্রতিবাদ করল না। হঠাৎ দেখি, কালো ছেলেটা প্যান্টের জিপার খুলে, সিটে বসা একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে যা তা বলছে। তা সত্ত্বেও, কেউ কোনও কথা বলল না। আমি তো অবাক। এই আমেরিকা পৃথিবীর সব থেকে সুসভ্য দেশ!"

ইন্দ্রদা বললেন, "তারপর?"

"স্টেশনে গাড়িটা থামতেই দেখলাম, মেয়েটা তড়িঘড়ি নেমে গেল। তখন কালো ছেলেটা হি হি করে হাসতে হাসতে সাদাদের উদ্দেশে আরও গালাগাল করতে লাগল।

দেখেই বুঝলাম, ড্রিংক করে উঠেছে। আমাদের দেশে হলে প্যাসেঞ্জাররাই ছেলেটাকে পিটিয়ে মারত। ওখানে কাউকে প্রতিবাদও করতে দেখলাম না। দু'মিনিট অন্তর একেকটা স্টেশন। ঠিক পরের স্টেশনে গাড়িটা থামতেই দেখি, দু'জন পুলিশ কামরায় ঢুকে বেধড়ক মারতে মারতে ছেলেটাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই অ্যাকশন। তখনই বুঝলাম, কেন ওই দেশটা এত বড়।"

ইন্দ্রদা বললেন, "সত্যিই অবিশ্বাস্য।"

মনোময়বাবু বললেন, "এতক্ষণ আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ভাবছিলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও পারি। আপনারা তো ভাগ্যবান, এখানকার মেট্রো ফ্রি অব অ্যান্টিসোসাল অ্যাকটিভিটি। ইউরোপে সন্ধের পর মেট্রোতে ট্রাভেল করাই ডেঞ্জারাস। আমি বিশ্বের অনেক দেশের মেট্রোতে চেপেছি। আমার খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে।"

মেট্রো রেল নিয়ে ইন্দ্রদা কথা বলতে শুরু করলেন মনোময়বাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ বছর খানেক আগে। এই কালীঘাট স্টেশনেই। দুপুরের ডিউটিতে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে নর্থ কাউন্টারে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, এক বয়স্কা মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া দিচ্ছেন এই মনোময়বাবু। আমাকে দেখে উনি বললেন, "ভাই, কাছাকাছি কোনও ডাক্তারকে পাওয়া যাবে? আমার স্ত্রীর ব্লাড সুগারের প্রবলেম আছে।"

চাকরিতে ঢোকার পর আমাদের ফার্স্ট এইডের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। স্টেশনে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে আমাদেরই ছুটে যাওয়ার কথা। বললাম, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমি মেডিকেল ইউনিটে খবর দিচ্ছি।"

আমি পা বাড়াতেই ভদ্রমহিলা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমার ব্লাড সুগার ফল করে গেছে। একটু চিনি বা লজেন্সজাতীয় কিছু এনে দিতে পারো?"

তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গিয়ে আমি একটা চকোলেট এনে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। দু'জনকে দেখে খারাপই লেগেছিল। এঁদের বাড়ির লোকজনই বা কেমন, একা ছেড়ে দিয়েছেন? জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনারা কোথায় যাবেন?"

মনোময়বাবু বলেছিলেন, "এই কাছেই। বিপিন পাল রোডে।"

"আপনাদের সঙ্গে আমি যাব?"

"তার আগে একটা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করতে পারেন? এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উনি ওপরে উঠতে পারবেন না।"

সে দিন দু'জনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। কারমেল স্কুলের কাছে তিনতলা বাড়ি। দেখেই মনে হয়েছিল, মনোময়বাবু বনেদি বড়লোক। চাকরি করতেন ফরেন সার্ভিসে। প্রচুর দেশে ঘুরেছেন। ওই স্বল্প আলাপেই উনি বলেছিলেন, "আমার একটাই ছেলে। মায়ের উপর রাগ করে সে আমেরিকায় চলে গেছে। তারপর থেকে তোমার মাসিমার ব্লাড সুগারের প্রবলেম। এত বড় বাড়িতে আমরা মাত্র দু'টো লোক। দিন কাটতে চায় না। পারলে মাঝে মধ্যে এসো।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মনোময়বাবু আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছিলেন। বাড়িতে ঢোকার সময় গ্যারেজে একটা মারুতি দেখেছি। তা সত্ত্বেও, কেন এঁরা মেট্রো রেলে চড়লেন, সেদিন বুঝতে পারিনি। চলে আসার সময় মনোময়বাবু বলেছিলেন, "অর্ক, তোমাকে একটা

কথা বলব?"

"বলুন?"

"আমাদের মতো সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য মেট্রো স্টেশনে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা উচিত। অথবা একটা রিটায়ারিং রুম। সারফেস রেলে যেমন থাকে। বিদেশের মেট্রোতে কিন্তু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে।"

এতদিন মেট্রোতে কাজ করছি, অথচ কেউ কোনওদিন এ কথাটা বলেনি। তাই বলেছিলাম, "আপনি মেট্রো ভবনে এ নিয়ে চিঠি লিখতে পারেন।"

"তাতে কাজ হবে?"

"হতে পারে। আপনি অবশ্যই চিঠি লিখবেন।"

"ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, নিশ্চয়ই পাঠাব।"

ওই ঘটনার পর থেকে কালীঘাট স্টেশন দিয়ে কোথাও গেলে মনোময়বাবু একবার আমার সঙ্গে কথা বলে যান। কোনও কোনও দিন এটা-ওটা নিয়েও আসেন। বিদেশি ক্যালেন্ডার, লাইটার, হেয়ার ড্রায়ার। কখনও মিষ্টি, কেক। প্রথম প্রথম নিতাম না। পরে দেখলাম, না নিলে ভদ্রলোক কষ্ট পান। মাঝে দু'দিন ওঁর বাড়িতেও গেছি। মনোময়বাবুর অধ্যবসায় দেখে সত্যিই আমি অবাক। গত দশ মাস ধরে উনি প্ল্যাটফর্মে চেয়ার বসানো নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন।

এই ক'দিন আগে আমাকে বলে গেলেন, "মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে এলাম, বুঝলে। এ বার বোধহয় সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা যাবে।" তারপর দীর্ঘ দিন বাদে আজ মনোময়বাবু ফের এলেন। পাতাল রেলের নিরাপত্তা নিয়ে ইন্দ্রদার সঙ্গে উনি আলোচনায় মেতে গেছেন। ইন্দ্রদাকে একবার বলতেও শুনলাম, "বাঃ, দারুণ আইডিয়া। আপনি পুরো ব্যাপারটা লিখে আমাকে দিন।"

গলাটা শুকিয়ে গেছে। পেপসি খাওয়ার জন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে দুর্গা ব্যানার্জি একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটা প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। বোধহয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। পেটানো শরীর। পেপসি খেতে খেতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, কোথাও আগে দেখিছি। এক হাতে হেলমেট। একবার কাউকে দেখলে চট করে আমি ভুলি না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, রাসবিহারীর মোড়েই ছেলেটাকে দেখেছি। ট্রাফিক সার্জেন্ট। লাল রঙের একটা বুলেট নিয়ে ঘোরে।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর দুর্গা ব্যানার্জি আমার কাছে এসে বলল, "আমাকে দেখে আজ আপনি অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?"

ঠাট্টা করে বললাম, "আমার পছন্দের মেয়েদের র‍্যাংকিংয়ে তুমিই এখন এক নম্বরে।"

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল দুর্গা। তারপর বলল, "আস্তে বলুন, আমার র‍্যাংকিংয়ে যে এক নম্বরে আছে, সে এখুনি দেখা করে গেল। সে শুনতে পেলে এখানে চাকরি করা আপনার মুশকিল হয়ে যাবে।"

১০

কাল রাতে এ এক্স এন চ্যানেলে ভলকানো বলে একটা সিনেমা দেখেছি। আজ সকালে

ডিউটিতে এসেও সিনেমাটার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা গ্রাস করেছে শহরটাকে। ঢুকে পড়েছে পাতাল রেলের সুড়ঙ্গেও। ট্রেনের মোটরম্যান তা জানেন না। সুড়ঙ্গে ট্রেন চালানোর সময় বাঁকের মুখে হঠাৎই তিনি দেখতে পেলেন, লাইনের উপর দিয়ে আগুনের গোলার মতো কী যেন এগিয়ে আসছে।

ট্রেন থামিয়ে তিনি ফোন করলেন কন্ট্রোল রুমে। সেখানে কেউ ফোন তুলছে না। মোটরম্যান তো জানেনই না, উপরে কী ঘটছে। সবাই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। জ্বলন্ত লাভা আর গরম ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, রাস্তা-রেস্তোরাঁ। একদল উদ্ধারকারী শহরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা পৌঁছেও গেছেন পাতাল রেলে। মোটরম্যানকে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাঁরা বলছেন। কিন্তু কেবিনের জানলা-দরজা সব বন্ধ। মোটরম্যান কিছুই বুঝতে পারছেন না। আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোত ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল ট্রেনটাকে। মোটরম্যান শেষ মুহূর্তে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।

মোটরম্যানের আতঙ্কগ্রস্ত মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। হলিউডের পরিচালকরা কী করে এই সব ফিল্ম বানান, আমার কোনও ধারণা নেই সে সম্পর্কে। তবে সিনেমাটা দেখতে দেখতে শিউরে উঠেছিলাম। সত্যিই কি এই ধরনের ঘটনা আমেরিকার কোনও শহরে ঘটেছিল? নাকি পুরোটাই লেখকের কল্পনা? ছবিটায় শেষ পর্যন্ত লাভাস্রোতকে আটকে দিতে পেরেছিলেন উদ্ধারকারীরা। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গহ্বর তৈরি করে সেই স্রোত তাঁরা সমুদ্রমুখী করে দিয়েছিলেন। আমাদের এখানে যদি কোনও দিন এরকম কোনও ঘটনা ঘটে, তা হলে কী হবে?

কলকাতার ধারে কাছে কোথাও আগ্নেয়গিরি আছে বলে আমি অন্তত শুনিনি। আন্দামানের ব্যারেন আইল্যান্ডসে আছে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, কলকাতার নীচে কোনও জ্বালামুখী হয়তো ঘুমিয়ে আছে। পাঁচশো বছর পর পর সে লাভা উদ্গীরণ করে। কলকাতার মানুষ তা জানে না। হঠাৎ একদিন সকালে আমরা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখব, ঠিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নীচ থেকে আগুনের গোলা বেরিয়ে আসছে। জ্বালামুখীর গহ্বর ওই বিস্ফোরণে ক্রমশ বড় হতে হতে রাজভবনকেও গিলে ফেলেছে। সকাল সাতটায় ডিউটি করতে আমরা ঢুকে যাই। জানতেও পারব না, এসপ্ল্যানেড স্টেশনের টানেল দিয়ে লাভাস্রোত কালীঘাটের দিকে আসছে।

কলকাতা শহরের ঢাল অবশ্য দক্ষিণ দিকে নয়। পশ্চিম দিকে। লাভাস্রোত কালীঘাটে পৌঁছতে যত সময় নেবে, তার আগে কেউ না কেউ আমাদের খবর দিয়ে দেবেন। ওই পরিস্থিতির কথা ভাবতেই আমার হাসি পেয়ে গেল। যাঃ, কী আলতু-ফালতু কথা আমি ভাবছি। সিঁড়ি থেকে উত্তর দিকে তাকালে প্ল্যাটফর্মের অনেকটা অংশ দেখা যায়। উজ্জ্বল আলোর নীচে মার্বেল বসানো প্ল্যাটফর্মটা ঝকঝক করছে। কিছুদিন আগে ওজন মাপার একটা মেশিন বসানো হয়েছে। উঠে দাঁড়ালেই সুন্দর একটা বাজনা বাজে। মেশিনটা যেদিন প্রথম বসে, সেদিন ওজন নিয়েছিলাম। একষট্টি কেজি। টিকিটের পিছনে লেখা ছিল, "শীঘ্রই প্রেমে পড়বেন।"

প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, কোনও কারণে যদি পাতাল রেলে লোডশেডিং হয়? এবং অফিসে আওয়ার্সে? কী হবে? গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে

পুরো স্টেশনটা। যাত্রীরা মারাত্মক ভয় পেয়ে যাবেন। তাঁরা হুড়োহুড়ি করে সামনে অথবা পিছনের দিকে ছুটবেন। অনেকেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে জখম হবেন। শ্বাসকষ্টে ভুগবেন। কেউ কেউ হার্টফেলও করে ফেলতে পারেন। এমন ঘটনা ঘটতে পারে? অনেক সময় ঘটেও তো। জাপানের কোন শহরে নাকি উগ্রপন্থীরা পাতাল রেলের এয়ার সিস্টেমের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল একবার। প্রচুর লোক মারা যান।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লোডশেডিংয়ের দৃশ্যটা কল্পনা করতে লাগলাম। পাতালপুরী তখন মৃত্যুপুরী হয়ে যাবে। আমরা যাত্রীদের কোনও সাহায্য করতে পারব না। কন্ট্রোল রুমে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সুইচ আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ আনার কোনও উপায় নেই। পাতাল স্টেশনে কত কী নেই। অটোমেটিক লাইট, টর্চ। নিদেনপক্ষে হ্যারিকেন, মোমবাতিও নেই। এ সব জোগাড় করে আনতে আমাদের যে সময়টা যাবে, তার মধ্যেই অনেক লোক মারা পড়বেন।

পাতাল রেলে আজ পর্যন্ত অবশ্য কোনওদিন লোডশেডিং হয়নি। হতে পারে ধরে নিয়ে সুনীল-শীর্ষেন্দুরা কোনওদিন রোমাঞ্চকর গল্প লেখারও চেষ্টা করেননি। কয়েক লক্ষ লোকের জীবন জড়িয়ে আছে এই পাতাল রেলে। অথচ বাংলা গল্প-উপন্যাসে পাতাল রেল তেমনভাবে আসেনি। এটাই আশ্চর্যের। সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেন নাকি সিনেমায় কলকাতার পাতাল রেল দেখিয়েছিলেন। তাও একটুখানির জন্য। ইন্দ্রদার মুখে শুনেছি, রেলওয়ে বোর্ড নাকি শুটিং করার জন্য সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমানত চেয়েছিল। শেষে চৌধুরী সাহেব সেই সব নিয়ম এড়িয়ে শুটিংয়ের অনুমতি জোগাড় করে দেন।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন, অর্কবাবু? তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না?"

তাকিয়ে দেখি, পিঙ্কির মা। লজ্জা পেয়ে বললাম, "একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। কিছু মনে করবেন না।"

"আসলে আমিও আপনাকে এই ড্রেসে প্রথমে চিনতে পারিনি। পিঙ্কিই বলল, মা দ্যাখো, আঙ্কল দাঁড়িয়ে আছে।"

"ও কোথায়?"

"ওই যে পেপসি কাউন্টারে। তা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলেন, ভাই। ভাই বলেই ডাকলাম কিন্তু।"

"স্বচ্ছন্দে। সত্যি কথাটা বলব? দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, পাতালে এখন যদি লোডশেডিং হয়ে যায়, তা হলে কী হবে?"

"সত্যি কোনওদিন হয়েছে নাকি?" খানিকটা যেন ভয় পেয়েই প্রশ্নটা করলেন পিঙ্কির মা।

"না, না। কোনওদিন হয়নি। হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আমাদের এখানে বিদ্যুৎ আসে সরাসরি ব্যান্ডেল ইউনিট থেকে। একটা প্যারালাল লাইনও করা আছে। কোনও কারণে একটা লাইন ফেল করলে যাতে, আরেকটা লাইন কাজ করতে পারে। আপনি স্বচ্ছন্দে ট্রাভেল করতে পারেন।"

"যাক বাবা, ভয়টা ভাঙিয়ে দিলেন। পাতাল রেলে আমার খুব ভয়, জানেন। কোনওদিন চাপিনি। ক'দিন ধরে পিঙ্কি খুব জেদাজেদি করছে। তাই আজ এলাম।"

"অনেকদূর যাবেন?"

"হ্যাঁ, শোভাবাজার পর্যন্ত। ওখানেই আমার বাপের বাড়ি।"

pathagar.net

"পাতাল রেলে আপনার এত ভয় কেন?"

"আমার জীবনে পাতাল রেল একটা অভিশাপ।"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন বলুন তো?"

"সে অনেক ইতিহাস। একদিন বাড়িতে আসুন। বলব। এই পাতাল রেলের জন্যই আমার বাবা মারা গেছেন। আমার দাদা সর্বস্বান্ত। অভিশাপ না তো কী? শুনলে আপনিও তা বলবেন।"

"অদ্ভুত তো।"

"অদ্ভুতই বটে। এই পাতাল রেল যখন তৈরি হচ্ছে, সেই সময় সাব কন্ট্রাক্টে আমার বাবা কিছু কাজ করেছিলেন। সেটা চুরাশি সাল। আপনার মনে থাকা সম্ভব না। সেই সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ভবানীপুরে একটা বিরাট ক্রেন আনা হয়েছিল মাটি সরানোর জন্য। সেটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। আমার বাবা তখন গাড়িতে বসে কথা বলছিলেন। ক্রেনটা ওই গাড়ির ওপর পড়ে। পুরো গাড়িটা চেপ্টে গেছিল। বাবার ডেড বডির অনেক অংশ পাওয়াই যায়নি।"

চুরাশি সালে আমার বয়স তখন দশ বছর। আমি সেই সময় দেশের বাড়িতে। কলকাতায় এসে কোনওদিন থাকব, স্বপ্নেও তা ভাবিনি। পাতাল রেলের কথাই তখন শুনিনি। দুর্ঘটনায় কে মারা গেছেন, জানব কী করে? অবাক হয়ে বললাম, "আপনারা কোনও ক্ষতিপূরণ পাননি?"

পিঙ্কির মা বললেন, "কে দেবে? যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তখন পাতাল রেলের কাজ করছিল, সেখানে ধর্মঘট হয়ে যায়। বহুদিন কাজ বন্ধ ছিল। বাবার কাজটা পরে দেখাশোনা করত আমার দাদা। পাছে সাব কন্ট্রাক্টটা চলে যায়, সেই কারণে দাদা চুপ করে রইল।"

"কিন্তু উনি সর্বস্বান্ত হলেন কী করে?"

"ধর্মঘটের আগে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছিল দাদা। সময় মতো তা ফেরত পেল না। ব্যবসা লাটে উঠল। একদিন আমার বাড়িতে আসবেন, ডিটেল বলব।" পিঙ্কিকে ফিরে আসতে দেখে পুরনো কথা হঠাৎ বন্ধ করলেন ওঁর মা। "চলি" বলে মেয়েকে নিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

আমি এস এস-দের ঘরে এসে বসলাম। আজ ইন্দ্রদা আসেননি। দায়িত্বে আছেন চক্রবর্তীদা। টিফিন সারছেন। থাকেন সেই ব্যারাকপুরে। ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। দমদম অবধি উনি আসেন সারফেস ট্রেনে। পাতাল রেলের একটা পাইলট কার দমদম স্টেশন থেকে ছাড়ে সাড়ে ছ'টায়। লাইন সব ঠিক আছে কি না, পরীক্ষা করার জন্য। সেই ট্রেনে চেপে চক্রবর্তীদা চলে আসেন কালীঘাট স্টেশনে সাতটার আগেই। সকালে ডিউটি থাকলে উনি রোজ টিফিন নিয়ে আসেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, "অর্ক, তোর বউদি আজ কয়েকটা মালপোয়া পাঠিয়েছে। এখন খাবি?"

সকালে কিছু খাওয়া হয়নি। বললাম, "দিন।"

চক্রবর্তীদা টিফিন কেরিয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ইন্দ্রটা মাঝে মধ্যে এমন গোয়ার্তুমি করে, একদিন দেখবি বিপদে পড়ে যাবে।"

মালপোয়া মুখে দিয়ে বললাম, "কেন, ইন্দ্রদা আবার কী করল?"

"এই যে সেদিন নন বেঙ্গলি ছেলেগুলোকে মার খাওয়াল, জানিস, পরে কী হয়েছে? জল কতদূর গড়িয়েছে?"

অজানা আশঙ্কায় আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বললাম, "না।"

"একটা মেয়ের বাবা আমাদের জি এমের কাছে গিয়ে নালিশ করে এসেছে। জি এম বোধহয় ইন্দ্রকে ডাকবে।"

"কিন্তু চক্রবর্তীদা, ওই ছেলেমেয়েগুলো সেদিন বাস্টার্ড বলে গালাগাল দিয়েছিল। আমি তখন ছিলাম। আপনি থাকলে, আপনিও ওদের অসভ্যতা বরদাস্ত করতেন না।"

"সব শুনেছি রে। কিন্তু ফলটা হল কী? ইন্দ্রকে বোধহয় মহাত্মা গাঁধী রোডে বদলি করে দেবে।"

"কী বলছেন চক্রবর্তীদা?"

"আমি অবশ্য কথাটা শুনেছি। সত্যি-মিথ্যে জানি না।"

"কিন্তু এটা যদি হয়, তা হলে তো আমরা কেউ আর কোনও দিন বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জারদের ধরতেই যাব না।"

"কে দিব্যি দিয়েছে তোদের ধরতে? জগৎটা কী নিয়মে চলছে, দেখছিস না? বোকা কোথাকার।"

আমি জেদ করে বললাম, "ইন্দ্রদার ওপর যদি কোনও রকম অবিচার হয়, তা হলে কিন্তু বলে দিচ্ছি, রেল মিনিস্টার পর্যন্ত দৌড়ব। তিনি কলকাতার লোক। অবশ্যই মন দিয়ে সমস্যাটা শুনবেন।"

চক্রবর্তীদা হেসে বললেন, "ইন্দ্র আর কিছু না পারুক, তোদের মতো কয়েকটা গোঁয়ার তৈরি করে রেখেছে।" কথা বলতে বলতেই চক্রবর্তীদা ক্লোজড সার্কিট টি ভি-টা চালিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আমি একটু প্যানেল রুম থেকে ঘুরে আসছি। তুই ততক্ষণ কোথাও যাস না।"

টি ভি সেটের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। আজ সরকারি ছুটির দিন। পাতাল রেলে লোকজন কম। বিকেলের দিকে বাড়বে। ইন্দ্রদা কাল আমাকে ডাবল ডিউটি দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিইনি। বিকেলে রেখা আসবে। বরাহ অবতার সম্পর্কে আমি যা কিছু জেনেছি, সব লিখে রেখেছি। সেই কাগজটা ওকে দিতে হবে। তথ্যটা জোগাড় করেছি চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে। কালীঘাট স্টেশনে পটুয়াদের মতো ওই ছবিগুলো এঁকে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর ছেলে-মেয়েরা। তাঁর তত্ত্বাবধানে, তিনি তখন কলাভবনের প্রফেসর ছিলেন। বিশ্বভারতী থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন থাকেন সল্ট লেকের সি ব্লকে।

উফ্ এই খবরটার জন্য মাঝে রেখা আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। রোজই এসে তাগাদা মারত। স্টেশনে ওই বরাহ অবতারের ছবিটার দিকে মাঝে মাঝে যাতায়াতের পথে তাকাই। কী বিশেষত্ব আছে, কে জানে? ওই ছবিটার কোনও প্রয়োজন নেই আমাদের কাছে। কিন্তু গবেষকদের কাছে তুলির কয়েকটা ওই টানই মহামূল্যবান। তিরিশটা ছবির মধ্যে আমার সবথেকে প্রিয় সূর্যদেবের ছবিটা। না, শৈল্পিক সৌন্দর্যের জন্য নয়। সূর্যদেবের ছবিটা যেখানে আছে, ঠিক সেখান থেকে ট্রেনে উঠলে রোজ বসার জায়গা পাই। কেন যে ওই কামরায় সিট খালি থাকে, জানি না। আমি অবশ্য কোনওদিন অফিস আওয়ার্সে মেট্রো ভবনে যাইনি। তাই বলতে পারব না, অফিস আওয়ার্সে কী হয়।

টি ভির পর্দায় হঠাৎ নজরে পড়ল পিঙ্কি আর ওর মাকে। এখনও যাননি? আশ্চর্য! প্রায়

আধ ঘণ্টা আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এর মধ্যে দমদমের দিকে তিনটে ট্রেন চলে গেছে। এমনও হতে পারে, উনি কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। পিঙ্কি প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছে। ও জানেও না, কতদূর থেকে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটা সেদিন বলল, ওর বাবা আলাদা কোথাও থাকে। নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল না। ভদ্রমহিলাকে দেখে তো খুব হাসি-খুশি মনে হল। সেই সঙ্গে প্রত্যয়ীও। নিজেদের সাংসারিক বিপর্যয়ের কথা অবলীলাক্রমে বলে গেলেন। অথচ কথাবার্তায় একবিন্দু আবেগ লক্ষ করলাম না।

আজ ব্যস্ততা কম বলেই বোধহয় আলসেমিতে পেয়ে বসেছে আমাকে। পা সামনের দিকে টানটান করে শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিলাম। আর তখনই আমার চোখে পড়ল ক্যাসেটটা। টেবলের ওপর পড়ে আছে। ক্যাসেটের কভারে ওটা সুমন্ত্রর ছবি না? সুমন্ত্রর গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে তা হলে? বাঃ। হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটটা তুলে এনে দেখি, এইচ এম ভি থেকে বের করা। মাস দুয়েক আগে ও গানের মেলাতে গাইতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলেছিল, এইচ এম ভি-র এক ভদ্রলোক ওকে পরে দেখা করতে বলেছেন। এরই মধ্যে ক্যাসেট বেরিয়ে গেল? আশ্চর্য তো, আমাকে জানাল না!

সুমন্ত্র অবশ্য বরাবরই কম কথা বলে। ও পাতাল রেলে চাকরি করার ছেলে না। ওর মধ্যে আলাদা একটা প্রতিভা আছে। গান গেয়েই একদিন ও প্রচুর টাকা কামাতে পারবে। পিকনিকে প্রথম যেদিন ওর গান শুনি, সেদিনই অবাক হয়ে গেছিলাম। শ্রীকান্ত আচার্য, ইন্দ্রনীল সেনের থেকেও ভাল গলা। শোভাবাজারের মল্লিক বাড়ির ছেলে সুমন্ত্র। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর কথা। কিন্তু ওদের অবস্থা এখন ততটা ভাল নয়। ওর বাবা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন বটে, তবে মক্কেলদের ঠকাতে পারেন না। সুমন্ত্রটাও একই রকম। কোনও সাতে পাঁচে থাকে না।

"প্যানেল রুমের ছাদ থেকে জল পড়ছে রে অর্ক। পি ডবলিউ আইয়ের লোকেদের খবর দেওয়া দরকার।" চক্রবর্তীদা ফিরে এসেছেন। ঘরে ঢুকে কথা বলতে বলতে উনি চেয়ারে বসলেন।

শুনে অবাক হয়ে বললাম, "আগে তো কোনওদিন এ রকম হয়নি।"

চক্রবর্তীদা বললেন, "সতেরো-আঠারো বছর আগে তৈরি। কনস্ট্রাকশনের নানা খুঁত এখন ধরা পড়ছে। কাট অ্যান্ড কভার সিস্টেমে আমাদের পাতাল রেল তৈরি হয়েছে, বুঝলি। ওপরে ফিলিং আপ ভাল করে হয়নি সব জায়গায়। গর্ত ভরাট করেছে আবর্জনা দিয়ে। কেমিকেল রিঅ্যাকশনে কোনও কোনও জায়গায় গ্যাস তৈরি হয়ে এমন ফাঁক-ফোকর হয়ে গেছে। সেই ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট।"

"আমি উঠি চক্রবর্তীদা। খবর দিয়ে আসি। এখানকার ফোনটা কাল থেকে খারাপ। বাইরে থেকে করতে হবে।"

"যা, তা হলে।"

ফোন করলেও যে পি ডবলিউ আইয়ের লোকেরা আজ আসবে, তার কোনও মানে নেই। ইন্দ্রদা বলে বলেও প্ল্যাটফর্মে জল চুঁইয়ে পড়া এখনও বন্ধ করতে পারেননি। ওরা এসে ভারী ভারী কথা বলবে। তারপর একটা প্ল্যাস্টিকের বালতি বসিয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম আর প্যানেল রুম এক না। ওখানে শর্ট সার্কিট হলে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে

পারে। সেই কারণেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। চক্রবর্তীদা ঠান্ডা মাথার লোক। পি ডবলিউ আইয়ের লোকেরা ওঁর কথায় গুরুত্ব দেবে না। ওখানে স্বরূপ বলে একটা ছেলে আছে। আমার খুব চেনা। ওকে ধরতে হবে।

অটো স্ট্যান্ডে যাওয়ার সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কে যেন ডেকে উঠলেন, "অর্ক।"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, দীপঙ্করদা। দিবাকরদার ভাই। দাঁড়িয়ে পড়তেই উনি কাছে এসে বললেন, "অর্ক, শোনো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

দীপঙ্করদাকে এর আগে আমি চার-পাঁচবার দেখেছি। থাকেন নাগপুরের দিকে কোথাও। জায়গাটার নাম ঠিক জানি না। দিবাকরদার মতো শান্ত স্বভাবের না। বরং একটু রগচটা ধরনের। বুলুদির সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ দীপঙ্করদার। দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই। আমি বুলুদির লোক বলে, দীপঙ্করদা কোনওদিন আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি। কলকাতায় কবে এলেন জানি না। চেতলাতেও বোধহয় যাননি। গেলে খবর পেতাম ঝুলনের কাছ থেকে। হঠাৎ স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে উনি কথা বলতে চান শুনে অবাকই হলাম।

"কী বলবেন, বলুন।"

দীপঙ্করদা বললেন, "এখানে নয়। কোথাও বসতে হবে।"

সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, "আসুন তা হলে।"

মন বলল, ভাল কিছু শোনানোর জন্য নিশ্চয়ই দীপঙ্করদা এতদূর আসেননি। সুতরাং তৈরি থাকা দরকার। আজ যদি উনি কটু কথা বলেন, আমিও তা হলে ছাড়ব না। দিবাকরদার ভাই বলে খাতির করার কোনও দরকার নেই। মুহূর্তের মধ্যে আমি বেহালার সেই অর্ক হয়ে গেলাম। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আমি বললাম, "দু' মিনিট একটু ওয়েট করবেন। আমি একটা ফোন করে আসছি। অফিসের দরকার।"

অটো স্ট্যান্ডের কাছে মেলোডি বলে একটা দোকান আছে। আমাদের ফোন কোনও সময় খারাপ হলে ওই দোকানটাই ভরসা। ফোনে স্বরূপের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হল, দীপঙ্করদাকে আরও কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা দরকার। ঝুলনকে ফোন করে বললাম, "দীপঙ্করদা যে কলকাতায় এসেছেন, তা তুই জানিস?"

"হ্যাঁ, কাল দাদাভাইকে ফোন করেছিল। কেন গো?"

"পরে শুনিস।" বলেই ফোনটা রেখে, বাইরে বেরিয়ে এলাম। মুক্তাঙ্গনের কাছে নতুন একটা রেস্তোরাঁ হয়েছে। রিমঝিম। সেখানে গিয়ে বসতেই দীপঙ্করদা বললেন, "অর্ক, তুমি কি জানো, নাগপুর থেকে বদলি হয়ে আমি কলকাতায় চলে এসেছি?"

নিস্পৃহভাবে বললাম, "না, শুনিনি।"

"তুমি কি জানো, চেতলায় যে বাড়িটায় তুমি থাকো, তার অর্ধেক অংশীদার আমি?"

"জানি।"

"তুমি একতলাটা অকুপাই করে থাকলে তো আমি ও বাড়িতে থাকতে পারব না ভাই।"

কথাটা শুনে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ঘুরিয়ে দীপঙ্করদা বলেই দিচ্ছেন, মানে মানে কেটে পড়ো ভাই। কী বলব, বুঝতে পারলাম না। একটু নার্ভাস হয়ে গেলাম।

"কী, আমার কথাটা বুঝতে পারলে না?"

"না, মানে..."

"অর্ক, শোনো ভাই, তোমার সঙ্গে আমি একটা স্ট্রেটকাট ডিল করতে চাই। শুনেছি, তুমি

ভাল ছেলে। তাই ভালভাবে বলছি। এক মাসের মধ্যে তুমি ও বাড়ি ছেড়ে দাও। না হলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে।"

দীপঙ্করদা সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন। শুনে আমার ভাল লাগল না। ওই বাড়িতে আমাকে থাকতে দিয়েছে বুলুদি। তাকে না জানিয়ে আমি এক পা-ও নড়ব না। কিন্তু তর্ক করে লাভ নেই। তাই বললাম, "ভেবে দেখি।"

দীপঙ্করদা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। রাগ সামলে তারপর বললেন, "শোনো ভাই, ভাবার সময় নিচ্ছ, নাও। আমি কিন্তু আর সময় দেব না। দরকার হলে গায়ের জোরে ও বাড়িতে ঢুকে যাব। তবুও আমার বাবার তৈরি বাড়িতে কাউকে বেশ্যাবৃত্তি করতে দেব না।"

মনে হল, দীপঙ্করদা আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলেন। বেশ্যাবৃত্তি?

দীপঙ্করদা বেশ্যা বলছেন বুলুদিকে?

"অবাক হচ্ছ কেন ভাই?" দীপঙ্করদা বললেন, "ও পাড়ায় তো সবাই জানে, তোমার দিদির কাছে এত লোকের আনাগোনা কী কারণে। সুখবিন্দর নামে লোকটাকে তুমি দেখোনি? ওই বাস্টার্ডটা তো প্রায় রাত্তিরেই থেকে যায় তোমার দিদির বেডরুমে।"

"কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেও না অর্ক। লোকটা হলদিয়াতে একটা থ্রি-স্টার হোটেল করেছে। তোমার দিদি তো সপ্তাহে তিনদিনই ওখানে যায়। ওখানে অবশ্য সবাই জানে, তোমার বুলুদি সুখবিন্দরের শালী।"

সুখবিন্দরের সঙ্গে যে বুলুদি হলদিয়ায় যায়, এ কথাটা অবশ্য সত্যি। কিন্তু সে তো হলদিয়া উৎসব না কোথায়, নাচের প্রোগ্রাম পাওয়ার জন্য? দীপঙ্করদা কী এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন? আমি জোর গলায় বললাম, "আপনি ঠিক বলছেন না।

"নাচের প্রোগ্রাম পাওয়ার জন্যই বুলুদি ওই লোকটার সাহায্য নেয়।"

দীপঙ্করদা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অর্ক, আমাদের রিলেশনটা এমন যে, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। তবে এটুকু বলতে পারি, হলদিয়ায় কয়েকটা বড় কোম্পানির এমন কিছু অফিসার আছেন, যাঁরা চোখ বুজে বলে দিতে পারেন, তোমার বুলুদির শরীরে কোথায় কী আছে।"

আর সহ্য করা সম্ভব না। বললাম, "এসব নোংরা কথা বলার জন্যই কি আপনি আমাকে ডেকেছেন?"

দীপঙ্করদা সমান তেজে বললেন, "সত্যি কথা সব সময় তেতো লাগে, তাই না? তোমাকে হলদিয়ায় যেতে হবে না। এই গড়িয়াহাটেই একটা হোটেল আছে। নাম হোটেল দিনরাত। সেখানে খোঁজ নিও, অনেক কথাই জানতে পারবে।"

হোটেল দিনরাতের কথা শুনে আমি মনের জোরটা হারিয়ে ফেললাম। আমি জানি, বুলুদি ওই হোটেলে যায়। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। আমার অসহায় মুখটা দেখে ফের দীপঙ্করদা বললেন, "খারাপ লাগছে আমার দাদার জন্য। সব জেনেশুনেও লোকটা কিছু করতে পারছে না। দাদাকে আমি বলে দিয়েছি, ও বাড়িতে হয় ওই মহিলা থাকবে, না হয় আমি। আমার মেয়ে বড় হয়েছে। ওই নোংরা পরিবেশে মেয়েকে রাখা যায় না। সুখবিন্দর মাফিয়া টাইপের লোক। দাদাও জানে, ট্যাঁ-ফুঁ করলে, লোক দিয়ে কোনও দিন মার্ডার করিয়ে দেবে। আমার পিছনেও লোক লাগিয়েছে। তবে আমার একটা লোমও ছিঁড়তে

পারবে না। তা, এখন তুমি কী করবে, বলো।"

"ভেবে দেখি।" বলেই উঠে পড়লাম। চিনচিনে একটা রাগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দীপঙ্করদা এরপর একটা বাজে কথা বললেই আমার হাত উঠে যাবে। অফিসের ইউনিফর্মে আছি, আমি সেটা চাই না।

১১

সকালে দীপঙ্করদা আসার পর থেকে পুরো দিনটাই আমার বিচ্ছিরি কাটল। ডিউটি শেষ করে বেরনোর সময় হঠাৎ চক্রবর্তীদা বললেন, "অর্ক, ভাই আমার একটা উপকার করবি? করুণাময়ী ব্রিজের নীচেই আমার এক ভায়রাভাই থাকে। তার বাড়িতে একটা জিনিস দিয়ে আসতে পারবি? রোজ তোর বউদি খ্যাচখ্যাচ করছে। আমি যেতে পারছি না। তুই জিনিসটা দিয়ে এলে, আমি এখান থেকেই সোজা ব্যারাকপুরে চলে যেতে পারি।"

আমার হাতে কোনও কাজ নেই। মনটাও খারাপ। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে করবটাই বা কী? তাই বললাম, "দিন।"

ব্যাগ থেকে চক্রবর্তীদা একটা প্যাকেট বের করে আমাকে বললেন, "ভায়রাভাইয়ের নাম সম্বরণ চ্যাটার্জি। ঠিকানা ১৩বি করুণাময়ী রোড। প্লিজ, কিছু মনে করিস না ভাই।"

নীচে নেমে ডাউন ট্রেন ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে গেলাম টালিগঞ্জ। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে করুণাময়ী ব্রিজের দিকে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। অটোরিকশা, মিনিবাস আর ট্রামে—ওই জায়গাটার যা অবস্থা, নিশ্চিন্তে হাঁটা যায় না। দৌরাত্ম্য বেশি অটোরিকশার। একটা প্রাইভেট বাস ভিড় কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে একটা মারুতিতে। লোক জড়ো হয়ে গেছে। এমন কিছু ক্ষতি হয়নি মারুতির। তবুও বেরিয়ে এসে মারুতির মালিক হম্বিতম্বি করছেন বাসড্রাইভারের ওপর।

বাস থেকে কালো ধোঁয়া বেরচ্ছে গলগল করে। দেখে দ্রুত ট্রামলাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই কালো ধোঁয়া যে শরীরের পক্ষে কত ক্ষতিকর, তা নিয়ে কারও হুঁশ নেই। পাতাল রেলে আমরা বেশ ভাল আছি। কোনও রকমের দূষণ নেই। কলকাতায় যদি পাতাল রেল না থাকত, তা হলে আরও বিষাক্ত ধোঁয়ায় ভরে যেত শহরটা।

পাতাল রেলের স্টেশন থেকে করুণাময়ীর মোড় অনেকটা পথ। হেঁটে গেলে মিনিট দশেক তো লাগবেই। তবুও বাসে উঠতে ইচ্ছে করল না। দক্ষিণমুখী হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশ আজ মেঘলা। প্রায় দিন এই সময়টায় কালবৈশাখীর ঝড় হচ্ছে। ঝড়ের আগেই যাতে বাড়ি পৌঁছতে পারি, তার জন্য পা চালালাম। রাস্তাটা বেশ নির্জন। পাশ দিয়ে হুস করে বাস অথবা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে খুব ছিনতাই হত এই অঞ্চলটায়। মেট্রো রেলের কোয়ার্টার হওয়ার পর তা কমেছে।

করুণাময়ী ব্রিজের উপর উঠে এলাম। বেশ জোরে বাতাস বইছে। আকাশে মেঘেরা তৈরি হচ্ছে। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে হঠাৎই মনে হল, অনেক দিন বৃষ্টিতে ভিজিনি। বেহালায় সকালের দিকে বৃষ্টি হলে অনেক দিন বুলুদি বলত, "চল ভাই, বৃষ্টিতে ভিজবি?" দু'জনে ছাদে উঠে যেতাম। বৃষ্টির জলে বুলুদির শরীরের রেখাগুলো ফুটে উঠত। জেঠিমা বকাবকি করলে বুলুদি পাত্তা না দিয়ে বলত, "কে কী ভাবল, তাতে আমার বয়ে গেল। আমার যা ভাল লাগে, আমি তা করব।"

সেই বুলুদি ধীরে ধীরে কত পাল্টে গেল! চেতলাতেও, আগে হুটহাট আমার ঘরে ঢুকে, গল্পগুজব করে তারপর বুলুদি দোতলায় উঠত। এখন বাড়িতে আছে কি না, জানতেও পারি না। এই সুখবিন্দর লোকটা উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বুলুদি অনেক দূরে সরে গেছে। ইদানীং যে বেশ টাকাপয়সা করেছে, চালচলন দেখে সেটা খুব টের পাই। বাড়ির সামনে সব সময় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। দামি শাড়ি, দামি গয়না পরে বুলুদি সেই গাড়িতে ওঠে। আগে নিজে বিউটি পার্লারে যেত। এখন বিউটি পার্লারের লোক এসে মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায়।

দীপঙ্করদা খুব খারাপ খারাপ কথা বলে গেল আজ বুলুদির সম্পর্কে। ছোটবেলা থেকে আমি তা শুনে আসছি। মনটা আমার সেজন্য খারাপ হয়নি। সারাদিন একটা কথাই ভাবছি, চেতলা থেকে যদি চলে আসতে হয়, তা হলে কী দাঁড়াবে? মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আমাকে জোগাড় করতেই হবে। এই শহরে কোনওদিন একা আমি থাকিনি। সতেরো-আঠারোটা বছর বলতে গেলে বুলুদির ছত্রচ্ছায়াতেই কাটিয়েছি। একা থাকার অভ্যেস আমার নেই। একা থাকব কী করে, সেই চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। দেশ থেকে বাবা আজকাল প্রায় চিঠিতে লিখছেন, "সম্ভব হইলে অন্য কোথায়ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিও।" বোধহয় বুলুদি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন।

করুণাময়ী ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, আমার সামনে এখন তিনটে রাস্তা খোলা। এক, কাছাকাছি কোথাও একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া। দুই, কোথাও পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকা। তিন, কোনও মেস খুঁজে নেওয়া। এই তিনটে সম্ভাবনা নিয়ে সারাটা দিন ভাল-মন্দ ভেবেছি। কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি। এক কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া যায়। হাজারখানেক টাকা ভাড়া গুনতেও আমি রাজি। কিন্তু রান্না-বান্না আর আনুষঙ্গিক কাজগুলো তা হলে আমাকেই করতে হবে। সে না হয় কষ্টেসৃষ্টে করা গেল। একটা অবিবাহিত ছেলেকে বাড়ি ভাড়া দেবেটা কে?

কোনও পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে পারলে, খারাপ না। অন্তত একা থাকার চেয়ে সুবিধেজনক। কিন্তু পরিবারটা কেমন হবে, তার গ্যারান্টি কে দেবে? তার চেয়ে মেস অনেক ভাল। যখন ইচ্ছে আসো-যাও, কেউ কিছু বলার নেই। শুধু খাওয়া-দাওয়ার স্ট্যান্ডার্ডটাই ভাল হবে না। পেটের অসুখ হয়ে যেতে পারে। ইন্দ্রদার ক্ষেত্রেই হয়েছে। বিয়ে করার আগে একটা সময় উনি মেসে খেতেন। পেটে আলসারটা তখনই হয়। ওঁর কপালটা ভাল, কলকাতায় এসে ইউনিয়নকে ধরাধরি করে কোয়ার্টার পেয়ে যান। সেই চেষ্টা আমিও করতে পারি। তবে এত তাড়াতাড়ি কিছু হবে না।

ইন্দ্রদার সঙ্গে পরামর্শ করলে, হয়তো একটা উপায় বেরিয়ে আসতে পারত। কিন্তু কথাটা তুললে, আমি জানি, ইন্দ্রদা বলবেন, "আমার কাছে তুই ইমিডিয়েটলি চলে আয়। আমার একটা ঘর তো কাজেই লাগে না। তুই এসে থাক। পরে কোনও একটা ব্যবস্থা করে নিস।" আমি নিশ্চিত, এটা উনি বলবেন। কিন্তু ইন্দ্রদাকে আমি বিব্রত করতে চাই না। এদিকে, দীপঙ্করদারও যা মনোভাব দেখলাম, তাতে চেতলার বাড়িতে বেশিদিন থাকা যাবে না। বুলুদিই থাকতে পারবে না। আমি থাকতে চাইলে ওদের পারিবারিক ঝগড়ায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। তার চেয়ে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা, অনেক শ্রেয়। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আমি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললাম, না, চেতলার বাড়িতে আর থাকব না।

মন খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল। ব্রিজ থেকে নামতে শুরু করলাম। কাল থেকেই ফ্ল্যাট

খোঁজা আরম্ভ করে দেব। খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখি। অটো স্ট্যান্ডের ছট্টুকেও বলে রাখব। এ সব ছেলে কাজে লেগে যেতে পারে। নানা জায়গায় ঘোরে। ফ্ল্যাটের সন্ধান দিলেও দিতে পারে। বেহালা, কসবা, করুণাময়ী—একটা জায়গাতে কি একটা ছোট একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ও সব অঞ্চলে থাকতে আমার অসুবিধে নেই। অটো ধরলে কালীঘাট স্টেশনে যাওয়া যায়।

মনে মনে এ সব ভাবছি, এমন সময় ডান পাশে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। চমকে উঠে দেখি, ট্যাক্সির ভেতরে মনোময়বাবু। আমাকে বললেন, "অর্ক, এক্ষুনি উঠে এসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।"

মনোময়বাবুকে আমি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি। ওর অনুরোধ ফেলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তেমন হলে, চক্রবর্তীদার ভায়রাভাইয়ের বাড়ি পরে আসা যাবে। কোনও কথা না বলে আমি ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। মনোময়বাবুর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল, যেদিন আমরা পকেটমারদের ধরি। প্রায় দিন কুড়ি আগে। নিশ্চয়ই কোনও কারণে উনি ব্যস্ত। সে জন্য কালীঘাটের দিকে যাননি।

"তোমাদের মেট্রো রেলের যা অবস্থা হয়েছে অর্ক, ভাবা যায় না।" হঠাৎ বলে উঠলেন মনোময়বাবু।

"কেন? সেই চেয়ারের ব্যবস্থাটা বুঝি হল না?" মাস কয়েক ধরে মনোময়বাবু প্রত্যেকটা স্টেশনে যাত্রীদের বসার জন্য কিছু চেয়ার বসানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভাবলাম, সেই প্রসঙ্গটাই তুলবেন বোধহয়।

"আরে না।" মনোময়বাবু বলেন, "তার চেয়েও বড় ব্যাপার। চেয়ারের ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। অর্ডারটা তোমাদের স্টেশনে আর কয়েকদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। আজ কোথায় গেছিলাম জানো, মেট্রো রেলের কাছ থেকে আমার জমি উদ্ধার করতে।"

"তার মানে?"

"এই চণ্ডীতলায় বহুদিন আগে আমি কিছু জমি কিনে রেখেছিলাম। টালির নালার গায়েই। প্রায় এক বিঘের মতো জমি। অনেক দিনের ইচ্ছে, ওখানে একটা স্কুল করব। হঠাৎ খবরের কাগজে একটা নোটিসে দেখলাম, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মেট্রো রেল বাড়ানো হচ্ছে। সে জন্য শিবপুর মৌজার কয়েকটা প্লটের জমি মেট্রো নিয়ে নেবে। দেখি, তাতে আমার জমিটাও পড়ছে। দেখে তখন তো আমার মাথায় হাত।"

টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত পাতাল রেলের আরও সাতটা নতুন স্টেশন হচ্ছে। এ খবর আমরা শুনেছি। সেই ট্রেন যাবে টালির নালা বরাবর। প্রায় নয় কিলোমিটার। এমন ভাবে, যাতে ওখানে বসবাসকারী কোনও লোকের অসুবিধে না হয়। ইন্দ্রদা বহুদিন আগে একটা নকশাও দেখিয়েছিলেন। টালিগঞ্জের পর প্রথম স্টেশনটার নাম হবে চণ্ডীতলা। এ টুকু মনে আছে। হঠাৎ এতদিন পরে ফের নোটিস দিয়ে মেট্রো জমি নিচ্ছে কেন? তা জানার আগ্রহেই বললাম, "তারপর?"

মনোময়বাবু বললেন, "দৌড়লাম মেট্রো ভবনে। গিয়ে একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করলাম। কেউ বা কারা নকশাটাই বদলে দিয়েছে। আগে যে নকশাটা ছিল, তাতে আমার জমির ওপর দিয় পাতাল রেল যাচ্ছিল না। হঠাৎই সামান্য হেরফের করে রেলওয়ে বোর্ডের কাছে নতুন একটা নকশা পাঠানো হয়েছে। আমি খোঁজাখুজি না করলে লোকে জানতেই পারত না।"

বললাম, "অদ্ভুত ব্যাপার তো। কারা করল, জানতে পেরেছেন?"

"ওই অঞ্চলের এক প্রোমোটার। লোকটা আমার জমিটা কেনার জন্য বহুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল। আমি দিইনি। সেই রাগে টাকা পয়সা খাইয়ে এই বদমাইসিটা করেছে। আমি নিজে তোমাদের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সব বুঝিয়ে এসেছি। উনি ফের একটা নোটিস দিচ্ছেন খবরের কাগজে। দেখা যাক, কী হয়।"

"সত্যি আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।"

মনোময়বাবু কথাটা শুনে হাসলেন। তারপর বললেন, "একদিন বাড়িতে চলে এসো। জমিয়ে গল্প করা যাবে। তোমার মাসিমা কালকেই আমাকে বলছিল, অর্ক ছেলেটা অনেকদিন আসে না।"

"কেমন আছেন এখন উনি?"

"ভাল না। অযথা টেনশনে ভোগেন। এই কয়েকদিন আগে আমেরিকা থেকে ছেলে চিঠি দিয়েছে, এক ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। ব্যস, খবরটা শুনে ফের তোমার মাসিমা অসুস্থ। এ দিকে, জমিটা বাঁচানোর জন্য দৌড়োদৌড়ি করছি। ও দিকে তোমার মাসিমার জন্য ডাক্তারখানায়। সাহায্য করার জন্য একটা লোক পর্যন্ত নেই।"

"কলকাতায় আপনার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"আছে। আমার এক দাদা। আর তার মেয়ে। ভাইঝি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সে মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু তারও তো লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব আছে। কাঁহাতক সময় দেবে আমাদের মতো বুড়োবুড়ির জন্য।"

"কোনও কাজের লোক নেই?"

"ছিল। মাস কয়েক আগে তোমার মাসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কেন?"

"আর বোলো না। ভয়ে। আমাদের পাড়ায় একটা ঘটনা ঘটল। বাড়ির মালকিনকে খুন করে, টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল কাজের লোক। দুপুরে সেই সময় বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমাদের খুব জানাশুনো পরিবার। ব্যস, ওই ঘটনার পর, তোমার মাসিমা কাজের লোকটাকে তাড়িয়ে দিলেন।"

হঠাৎই মাথায় খেলে গেল কথাটা। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা মনোময়বাবুকে বললে কেমন হয়? সরাসরি যদি না করে দেন, তা হলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার একতলাটা তো ভাড়া দিতে পারেন।"

"একবার দিয়েছিলাম ভাই। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক পাইলটকে। সে এমন উৎপাত শুরু দিল, কনট্রাক্ট আর রিনিউ করলাম না।"

"খুব চেনাশুনো কেউ যদি নেয়, দেবেন?"

"দিতে পারি, তবে তোমার মাসিমা রাজি হলে, তবেই।"

কথাটা বলেই মনোময়বাবু চুপ করে গেলেন। বাইরে তাকিয়ে দেখি, টালিগঞ্জ স্টেশন এসে গেছে। এখানে নেমে গেলে ট্রেন ধরে কালীঘাট চলে যাওয়া যাবে। মনোময়বাবু যাবেন আনোয়ার শাহ রোডে। ওখানে নেমে আমার লাভ নেই। তাই দু'একটা কথা বলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, অন্য কোথাও ফ্ল্যাট না পেলে মাসিমাকে গিয়েই ধরতে হবে। আমাকে উনি না করতে পারবেন না।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি, একটা আপ ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে শেষ কামরায় উঠলে

pathagar.net

কালীঘাট স্টেশনের এসকালেটরটা কাছে পাওয়া যায়। তাই পিছন দিকে হাঁটতে লাগলাম। দু'টো মাত্র স্টেশন, চার মিনিট লাগবে। যাত্রীদের ভিড়ও কম। এর থেকে আরামদায়ক গাড়ি আর নেই।

মোটরম্যানদের কামরার কাছে গিয়ে দেখি চন্দন প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে বলল, "আরে অর্ক, তুই এখানে?"

চন্দন আগে ছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলের ড্রাইভার। চার বছর আগে বদলি হয়ে পাতাল রেলে এসেছে। পাতাল রেলে যাঁরা ট্রেন চালান, তাঁদের বলা হয় মোটরম্যান। চন্দন এখন ড্রাইভার নয়, মোটরম্যান। অনেকদিন পর ওকে দেখলাম। আগে রোগা ছিল। এখন স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে। বললাম, "এই একটা কাজে এসেছিলাম। আছিস কেমন?"

"চলে যাচ্ছে। যত অত্যাচার তো আমাদের উপরই। এইমাত্র শুনলাম, আজ আমাকে রাত একটা অবধি থাকতে হবে। পাতাল রেলে শুটিং আছে।"

এক হাত দূরে চন্দন দাঁড়িয়ে, অথচ কথা বলছে বেশ জোরে জোরে, বললাম, "কীসের শুটিং রে?"

"কী বললি? রিপোর্টিং? সে তো দু'টোর সময়ই হয়ে গেছে।"

"রিপোর্টিং নয়, শুটিং। কারা করবে?"

"দূরদর্শনের লোকেরা। পয়লা বৈশাখের নববর্ষ প্রোগ্রামের জন্য। সুমন-ইন্দ্রনীলরাও থাকবে। ইন্দ্রদা তোদের কিছু বলেনি?"

"না। বোধহয় ভুলে গেছে।"

"কী বললি? ইন্দ্রদা চলে গেছে? কোন স্টেশনে?"

চন্দনকে দেখে একটা সন্দেহ হচ্ছিল। শেষ প্রশ্নটা শুনে বললাম, "কানটা একবার ডাক্তারকে দেখাস তো চন্দন। মনে হচ্ছে, প্রবলেম হয়েছে।"

"ঠিক ধরেছিস। বাঁ কানটা গেছে। ইদানীং কিছু শুনতে পাচ্ছি না। টানেলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাই। এত শব্দদূষণ। আমাদের মোটরম্যানরা অনেকেই আজকাল কানে শুনতে পাচ্ছে না। প্রায় একশো জন তো হবেই।"

শুনে খুব খারাপ লাগল। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। মোটরম্যানদের কেবিনে ঢুকে চন্দন বলল, "উঠে আয়। দু'জনে কথা বলতে বলতে কালীঘাট এসে যাবে।"

ছোট্ট কেবিন। মাত্র একটা চেয়ার। সামনে নানা ধরনের সুইচ। বোর্ডের ওপর একটা হ্যান্ড মাইক। আগে কখনও মোটরম্যানদের কেবিনে ঢুকিনি। ওই ছোট্ট জায়গায় একটা স্টিলের মই দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। চন্দন প্রথমেই সুইচ টিপে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিল। শুনলাম, "মেট্রো রেল সমস্ত যাত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছে।" টেপে কথাটা শেষ হতেই, গাড়ি ছেড়ে দিল।

"জানিস অর্ক, যখন সারফেস রেলে কাজ করতাম, তখন দু'টো স্টেশনের মাঝে অনেক সময় পেতাম। পাতালে এক স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়লে হুস করে পরের স্টেশনটা এসে যাচ্ছে। দেড় মিনিটের মধ্যে কত কাজ। টেপ চালানো, দরজা খোলা, বন্ধ করা, পেছন থেকে গার্ডের কাজ করা—এক সেকেন্ড মনটা অন্য দিকে সরে গেলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাবে।" কথা বলতে বলতেই চন্দন এটা ওটা করে যাচ্ছে। "কদ্দিন টানতে পারব, জানি না।"

রবীন্দ্র সরোবর স্টেশন এসে গেল। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে চন্দন বলল, "অর্ক, ভাল একটা মেয়ে আছে। বিয়ে করবি?"

আচমকা এই প্রশ্নটা শুনে মজা করে বললাম, "ভাল মেয়ে বলে পৃথিবীতে কেউ আছে নাকি রে? যদি থাকেও, তা হলে সে ভাল ছেলে খুঁজবে। আমার মতো সাধারণ একটা ছেলেকে সে বিয়ে করবে কেন?"

"ইয়ার্কি ছাড় তো। সত্যি বলছি। ভেরি গুড গার্ল। আমার বউয়ের মামাতো বোন। দেখলে তোর পছন্দ হবে।"

এ সব অনুরোধ পরে ঘ্যানঘানানিতে দাঁড়ায়। আর যাতে না করে তাই বললাম, "না রে। একটা মেয়েকে আমার কথা দেওয়া আছে।"

শুনে চন্দন খুব হতাশ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থেকে বলল, "তাই বুঝি? আমি অবশ্য প্রথমে সীতাংশুর কথাই ভেবেছিলাম। ওদের অত বড় বাড়ি। ছেলেটাও হ্যাণ্ডসাম। আমার শালির সঙ্গে হাইটেও ও মানিয়ে যাবে। ও এখন কোন শিফটে, জানিস?"

"সকালের দিকে। ওকে ভাল করে ধর। বাড়ির লোকেরা ওর জন্য মেয়ে খুঁজছে।"

"তুই ঠিক জানিস?"

"বললাম তো। যত তাড়াতাড়ি পারিস, ওর সঙ্গে কথা বল।"

কালীঘাট স্টেশনে ট্রেন এসে গেল। কেবিন থেকে আমি নেমে পড়লাম। মনে মনে হাসছি। বেচারা সীতাংশু! ওর জীবনটা এরপর অতিষ্ঠ করে তুলবে চন্দন। ভাগ্যিস, মিথ্যে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছিল। না হলে আমার পিছনেও ও লেগে থাকত। ব্যাচেলর থাকার যে কী অসুবিধে, এবার টের পাচ্ছি।

বাড়ি ফিরে এলাম, প্রায় পাঁচটা নাগাদ, নাচের স্কুলের মেয়েরা একে একে আসতে শুরু করেছে। এখন আর গা ধোওয়া যাবে না। জামা খুলে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিলাম। আমার ঘরটা এমনিতে খুব ঠান্ডা। কিছুক্ষণ বসলে গা-টা জুড়িয়ে যায়। এত সুন্দর ঘরটা ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। দীপঙ্করদার কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিনচিনে রাগ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে।

চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম, দীপঙ্করদারই বা দোষ কোথায়? বুলুদি যদি আর পাঁচজনের মতো হত, তা হলে কি দীপঙ্করদা বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা তুলতে পারতেন? নাচের ক্লাস, ড্রয়িংরুম আর ডাইনিংরুম নিয়ে স্বচ্ছন্দে উনি এখানে থাকতে পারতেন। আমাকে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই তখন উঠত না। আসল দোষী তো বুলুদি। অনেকের জীবন নষ্ট হয়ে গেল বুলুদির জন্য। ও পাড়ার রনিদা, শুভজিৎ স্যার, দিবাকরদা। অথচ বুলুদি আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। না, ভুল বলা হল। বুলুদি আগের থেকে এখন অনেক ভাল আছে।

রনিদার কথা ভাবতে ভাবতেই, আশ্চর্য, দেখি রনিদা এসে হাজির। আমাদের স্টেশনের সুড়ঙ্গ দিয়ে হেঁটে আসছে। অদ্ভুত তো। এইমাত্র আমি চেতলায় ছিলাম। প্ল্যাটফর্মে এলাম কী করে? লাইন দিয়ে হেঁটে আসার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে রনিদা বলল, "অর্ক, তুই এখানে? এই পাতালে কী করছিস?"

"আমি তো এই স্টেশনেই চাকরি করি রনিদা। তুমি কোত্থেকে? আমেরিকা থেকে দেশেই বা কবে ফিরলে?"

হাত বাড়িয়ে রনিদা বলল, "আগে আমাকে প্ল্যাটফর্মে তোল তো। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে।"

রনিদার হাতটা খুব তুলতুলে। ঠান্ডাও। টেনে প্ল্যাটফর্মে তুলে আনতেই মনে হল, রনিদা আরও লম্বা হয়ে গেছে। সেই কবে আমেরিকায় গেছে। হয়তো ভাল খায়দায়। লম্বা হতে

পারে। কিন্তু এই বয়সে লম্বা হওয়া যায়? জানি না। প্ল্যাটফর্মে কোনও লোক নেই। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে রনিদা বলল, "কী জিজ্ঞাসা করলি তখন অর্ক?"

"কবে এলে?"

"এই তো এখন। খুব দরকারে এলাম রে। তা, তোর বুলুদি কেমন আছে, আগে বল তো? আগেরবার এসে শুনলাম, বিয়ে-থা করেছে। চেতলায় থাকে। তুই কি এখনও ওর সঙ্গে লেপ্টে আছিস?"

লেপ্টে আছিস শুনে খারাপ লাগল। তবুও বললাম, "হ্যাঁ। তুমি বিয়ে করোনি?"

"না রে। বিয়ে করা হয়নি। তোর বুলুদি বিয়ের আগে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, আমি পুরুষ কি না, সেই বিশ্বাসটাই চলে গেছিল। তা, আমেরিকায় গিয়ে তিনটে মেয়ের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে দেখলাম, না আমার সব ঠিকঠাক আছে। আমি পুরুষ। এইবার দুটো উদ্দেশ্যে দেশে এসেছি। এক, একটা ভাল মেয়ে দেখে রেখেছে বউদি। বিয়ে করব। আর দুই, আমার জীবনের এতগুলো বছর যার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে ; তার ওপর বদলা নেব।"

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে রনিদার অত সুন্দর মুখটা কেমন যেন নিষ্ঠুরের মতো হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বললাম, "কোথাকার মেয়ে রনিদা।"

"এই কলকাতারই। কসবার। আমার থেকে বছর কুড়ি ছোট। তোরা হয়তো নাক কোঁচকাবি। আমেরিকায় কেউ ছোট-বড় মেপে দেখে না। বউদি ছবি পাঠিয়েছিল। ছবি দেখেই সেক্সচুয়ালি খুব এক্সাইটেড হয়ে যাই। তুই চিনবি না। মেয়েটার নাম জুঁই...জুঁই সিংহরায়।"

নামটা শোনার পরই মনে হল, কে যেন আমার কানের সামনে একটা বোমা ফাটাল। জুঁই...জুঁইকে বিয়ে করার জন্য আমেরিকা থেকে রনিদা এখানে এসেছে?

কোন জুঁই? প্রিয়াঙ্কার বন্ধু, না অন্য কেউ? যদি আমার চেনা জুঁই হয়, তা হলে এ বিয়ে আমি হতে দেব না। অমন ফুলের মতো মেয়েটা, তার ছবি দেখে রনিদা সেক্সচুয়ালি এক্সাইটেড হয়ে গেল? রনিদা তো এরকম ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, "বিয়েটা তোমার কবে রনিদা?"

"দিনক্ষণ এখনও ঠিক করিনি। আগে বদলা নেওয়ার কাজটা সারি। তারপর ধীরেসুস্থে বিয়েটা করে নেব। যাক সে কথা, তোর বুলুদির ঠিকানাটা দে তো। আমি তৈরি হয়েই এসেছি। যা করার দু' একদিনের মধ্যে করে ফেলব। বউদি বলল, বুলুর বাড়িটা দুর্গাপুর ব্রিজের কাছে। ঠিকানা দে ওকে একটা শিক্ষা দিয়ে যাই।"

রনিদা কি পাগল হয়ে গেছে? কী শিক্ষা দিতে চায় বুলুদিকে? পনেরো বছর আগে সত্যিই বুলুদি অন্যায় করেছিল। তার জন্য এতদিন পর রনিদা বদলা নিতে আসবে? হঠাৎ কী মনে হল, বললাম, "বুলুদি তো নেই। বাংলাদেশ গেছে। নাচের প্রোগ্রাম করতে। এখন পাবে না।"

"গুল মারছিস? রাস্কেল কোথাকার?" বলেই খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল রনিদা, "ভাবছিস, গুল মেরে তুই বুলুদিকে বাঁচাবি। তোর সঙ্গে তোর বুলুদির সম্পর্কটা আমি জানি না ভেবেছিস, তাই না? বুলু কেন আমাকে সেদিন বলেছিল, তোমার থেকে অর্কর পেনিসটা অনেক বড়? তোদের দুজনকেই আমি ছাড়ব না। এই দ্যাখ, রিভলবারটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি।"

রনিদার হাতে অসম্ভব জোর। হাতটা আমি ছাড়াতে পারছি না। হঠাৎই টানেল থেকে গুম-গুম শব্দ শুনতে পেলাম। আপ ট্রেন আসছে। রনিটা হঠাৎ লাফিয়ে লাইনে নেমে গেল। হ্যাঁচকা টানে আমিও গিয়ে পড়লাম একেবারে থার্ড লাইনের ধারে। ছোঁয়া লাগলেই

অবধারিত মৃত্যু। আমি চিৎকার করে উঠলাম।

হঠাৎই ঝুলনের গলা শুনতে পেলাম, "অর্কদা, এই অর্কদা। চেঁচাচ্ছ কেন? স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?

চোখ খুলে দেখলাম, সোফায় ঝুঁকে রয়েছে ঝুলন। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ওর স্তনের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। ওর ঠোঁট দুটো আমার মুখের সামনে। ওর শরীর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে। অসম্ভব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। ওর চোখে চোখ রেখে বলতে চাইলাম, "ঝুলন, বুলুদি এখন কোথায় রে?" বলে ফেললাম, "তুই এত কেন সুন্দর রে।"

১২

হোটেল দিনরাতে পার্টি হচ্ছে বুলুদির জন্মদিনে। আসার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু না এলে অশান্তি হত। সন্ধে সাতটার সময় হোটেলে পৌঁছে দেখি, নাচের স্কুলের মেয়েরা এসেছে। সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও। ব্যাঙ্কোয়েট হলে বেশ ভিড়। কেক কাটা হয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়া চলছে। বুলুদি আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, "ভাই, তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? এত পরে এলি? সুখি কখন থেকে তোর খোঁজ করছে।"

"কোথায় উনি?"

"ওই তো, তোদের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলছে।"

তাকিয়ে দেখি, সুখবিন্দর সিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন শুভঙ্কর দত্তের সঙ্গে। মাঝে একটা রবিবার শুভঙ্কর দত্তের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম সুখিজিকে। মেট্রো রেলের সেই কন্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যাওয়ার ধৃষ্টতাই আমার হত না, যদি না উনি শুক্লার স্বামী হতেন। শুক্লা বোধহয় আমার সম্পর্কে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেক কিছু বলেছে। সেই কারণে শুভঙ্কর দত্ত আমার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী ছিলেন।

সেদিন সুখিজিকে পাত্তাই দেননি দত্তসাহেব। আজ দেখছি, হেসে হেসে কথা বলছেন। দু'জনের হাতেই গ্লাস। ড্রিঙ্ক করছেন। সেদিকে তাকিয়ে বুলুদি আমাকে বলল, "ভাই, তুই সেদিন আমাকে বলিসনি কেন, আমাদের পাড়ার সেই পাকা মেয়েটার সঙ্গে তোদের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বিয়ে হয়েছে? আগে জানলে আমি নিজেই চলে যেতাম রে লোকটার কাছে।"

বললাম, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম।"

"ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর যোগাযোগ নেই? আগে তো তোর জন্য খুব ঘুরঘুর করত আমার কাছে। ফের রিলেশনটা তৈরি কর তো ভাই। আমার আর সুখির খুব সুবিধে হবে তা হলে।"

শুনে মনে মনে হাসলাম। এই বুলুদিই একদিন বারণ করেছিল আমাকে, 'ওই পাকা মেয়েটার সঙ্গে কোনওদিন যদি তোকে কথা বলতে দেখি, তা হলে তোর ছালচামড়া তুলে নেব।' আর আজ আমাকে সম্পর্কটা ফের তৈরি করতে বলছে! সত্যি, বুলুদি পারে বটে!

বুলুদিই টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেল শুভঙ্কর দত্তের কাছে। বলল, "আপনি কিন্তু ভারী অন্যায় করেছেন মিঃ দত্ত। শুক্লাকে না এনে। ছোটবেলায় কত আসত আমাদের বাড়িতে। একেবারে আমার ছোট বোনের মতো ছিল।"

শুভঙ্কর দত্ত বললেন, "সে সব গল্প শুক্লার মুখে আমি শুনেছি।"

সুখিজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী, আপনার হাতে গ্লাস নেই কেন? ড্রিঙ্কস নিন।"

বললাম, "থ্যাঙ্কস। আমার অভ্যাস নেই।"

"দূর মশাই, আমাদেরও অভ্যাস ছিল নাকি? হয়ে গেছে। অন্য কিছু না খান, এক গ্লাস বিয়ার তো খেতে পারেন।"

বুলুদি বলল, "সুখি যখন রিকোয়েস্ট করছে, খা না। এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

চমকে আমি বুলুদির দিকে তাকালাম। কলেজে পড়ার সময় একবার একটা সিগারেট খেয়েছিলাম বলে আমাকে প্রচণ্ড বকাবকি করেছিল। আর সেই বুলুদিই আমাকে আজ বিয়ার খেতে বলছে?

সুখিজি উৎসাহ পেয়ে গেছেন। হাতের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "সাহেবকো ড্রিঙ্কস দো।"

বুলুদি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেয়ারার হাতে ট্রে-ভর্তি ড্রিঙ্কসের গ্লাস। কোনটা বিয়ার, কোনটা হুইস্কি আমি জানি না। নেব কি না, ইতস্তত করছি। এমন সময় হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস তুলে, আমার হাতে দিয়ে সুখিজি বললেন, "নিন, চুমুক দিন। চিয়ার্স।"

বুলুদির যখন আপত্তি নেই, তখন খেতে দোষ কী? গ্লাসে চুমুক দিয়ে তরল পদার্থ গিলে ফেললাম। গলা জ্বলে গেল। চোখ-মুখ কোঁচকাতে দেখলে অন্যরা মজা পেতে পারে। তাই জ্বলুনি সহ্য করেও মুখটা স্বাভাবিক করে রাখলাম। আমাকে দেখে সুখিজি একটু অবাক হয়েই বললেন, "অর্কবাবু, আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না, জীবনে প্রথমবার ড্রিঙ্ক করছেন। সত্যিই আমি সারপ্রাইজড।"

আমি মুখ টিপে হাসলাম। শুভঙ্কর দত্ত-ও বললেন, "রিয়েলি, আমিও সারপ্রাইজড।"

শুভঙ্কর দত্ত যে এই পার্টিতে আসবেন, আমি জানতাম না। নিশ্চয়ই সেদিনের আলাপের পর সুখবিন্দর সিং নিজেই যোগাযোগ করেছেন ওঁর সঙ্গে। ব্যবসা করে খান। সুখিজিরা জানেন, কাকে কীভাবে মাখন দিতে হয়। এ ক'দিনে হয়তো সম্পর্কটা এমন স্তরে নিয়ে গেছেন, শুভঙ্কর দত্ত নিমন্ত্রণ ফেলে দিতে পারেননি। নামেই বুলুদির জন্মদিনের পার্টি। এটা উপলক্ষ। আসলটা হল শুভঙ্কর দত্তকে বাগে আনা।

এক ভদ্রলোক এসে সুখিজির কানে কানে কী যেন বলতেই উনি 'এক্সকিউজ মি' বলে ব্যাঙ্কোয়েট হল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নাচের কয়েকটা মেয়ে এসে টেনে নিয়ে গেল বুলুদিকে। আমাকে একা পেয়ে শুভঙ্কর দত্ত নিচুস্বরে বললেন, "অর্ক ভাই, কাজ দিলে এই সুখবিন্দরের কোম্পানি তা অনেস্টলি করবে তো? চারটে স্টেশনের পুরো রিনোভেশনের কাজ আমি ওকে দেব। প্রায় আড়াই কোটি টাকার কাজ। দেখবেন, যেন আমাকে না ডোবায়।"

বললাম, "চিন্তা করবেন না। আমি জানি, উনি পারবেন।"

"রিনোভেশনের কথা আমি বলছি না। পাতাল রেলে, বুঝতেই তো পারছেন, কাউকে কোনও কাজ দেওয়া কতটা ঝুঁকির। এই লোকটা সম্পর্কে আপনি যদি গ্যারান্টি দেন, তবেই আমি এগোতে পারি।"

বললাম, "আপনি একশোভাগ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে শুভঙ্কর দত্ত বললেন, "এবার আমি যাব। আর দিন সাতেক পর

টেন্ডারগুলো খোলা হবে। মিঃ সিং কী কোটেশন দেবেন, আজ বলে দিয়েছি। পরে একদিন আপনি আমার বাড়িতে আসুন। জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

কথা বলতে বলতে আমি ব্যাঙ্কোয়েট হলের দরজা পর্যন্ত গেলাম। সুখিজি দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন। আমি সরে এসে হলঘরের এককোণে চেয়ার নিয়ে বসলাম। জীবনে কখনও এসব পার্টিতে আসিনি। আদবকায়দাও জানি না। মনে মনে হিসেব কষতে লাগলাম। ব্যাঙ্কোয়েট হলের ভাড়া, ড্রিঙ্কস আর খাওয়াদাওয়ার খরচ—সব মিলিয়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার ধাক্কা। এক রাত্তিরে টাকাটা উড়ে যাবে। আমার প্রায় পাঁচ মাসের মাইনে। সুখিজি সেদিন ঠিকই বলেছিল, চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্যভাবে টাকার ধান্দাও করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে দ্বিতীয় চুমুকটা দিলাম। ফের গলাটা জ্বলে গেল। এখানে আমাকে লক্ষ করার কেউ নেই। চোখ-মুখ কুঁচকে সেই জ্বলুনি সহ্য করলাম। তারপর হঠাৎই চোখে পড়ল পিঙ্কি আর ওর মাকে। ভদ্রমহিলার পরনে কাঞ্চিপুরম শাড়ি। দূর থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হাতে খাবারের প্লেট। খেতে খেতে উনি কথা বলছেন অন্য এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এদিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। কয়েক পা এগিয়ে এসে উনি বললেন,

"কেমন আছেন অর্কবাবু?"

"ভাল আছি। আপনি?"

"চলছে।" পাশে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন পিঙ্কির মা। বললেন, "সুমিতাদি খুব করে আসতে বলেছিলেন। পার্টিতে না এসে পারলাম না। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব অর্কবাবু?"

"বলুন।"

"ওই যে, সুমিতাদির পাশে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তার নামটা কি সুখবিন্দর সিং?"

"হ্যাঁ। দিবাকরদার বন্ধু। দিবাকরদা, মানে সুমিতাদির হাজবেন্ড।"

পিঙ্কির মা একটু অবাক হয়েই বললেন, "আপনি ঠিক জানেন?"

"ভালমতো জানি। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

"এই লোকটাকে আমি আসানসোলে দেখেছি। মাফিয়া টাইপের। ওই অঞ্চলে খুব বদনাম ছিল লোকটার। হেন কু-কাজ নেই, যা করেনি। এই রকম একটা লোকের সঙ্গে দিবাকরের...মানে দিবাকরবাবুর আলাপ হল কী করে? ওকে তো ভদ্রলোক বলে জানি।"

"আপনি আসানসোলে ওকে দেখলেন কী করে?"

"বিয়ের পর আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে কিছুদিন ওখানে ছিলাম। উনি তখন চাকরি করতেন আসানসোলে। এখন অবশ্য আমার কোনও সম্পর্ক নেই হাজবেন্ডের সঙ্গে। সে যাক। এই সুখবিন্দর লোকটা কিন্তু ভাল নয়। আমার নাম করে বলার দরকার নেই। সুমিতাদির কানে কথাটা কিন্তু আপনি তুলে দেবেন। উনি যে কোনওদিন বিপদে পড়ে যাবেন।"

"নিশ্চয়ই বলব।"

"এসব বললাম, কিছু মনে করলেন না তো?"

"একেবারেই না।" বলে আমি প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, "পাতাল রেলে চড়ে সেদিন কেমন লাগল আপনার?"

pathagar.net

"বাস-ট্রামের থেকে অনেক ভাল। তবে পিঙ্কির মোটেই ভাল লাগেনি। দোকানপাট, রাস্তায় লোকজন দেখা যায় না। ও বলল, মা তুমি আর কখনও পাতাল রেলে নিয়ে যাবে না।"

কথাটা শুনে হেসে ফেললাম। গ্লাসে তৃতীয় চুমুকটা দিয়ে বললাম, "ঠিকই বলেছে পিঙ্কি। পাতাল রেলে চড়লে বাইরের জীবনপ্রবাহ কিছুই বোঝা যায় না।"

"আপনারা চাকরি করেন কীভাবে? ভাল লাগে?"

"অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন উপরে উঠলেই আর ভাল লাগে না।"

পিঙ্কির মা একবার আমার দিকে তাকিয়েই আবার খাওয়ায় মন দিলেন। নাভির নীচে শাড়ি পরেছেন। হঠাৎ সেদিকে চোখ চলে গেল। মসৃণ ত্বক ঢাল খেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। একেবারে মেদহীন। একেকজন এত সুন্দর ফিগারটা রাখেন কী করে? আড়চোখে আরেকবার নাভির দিকে তাকালাম। আমার নিজের শরীরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখটা সরিয়ে নিলাম। মনে একটা বিচ্ছিরি চিন্তা আসছে। সেটা মদ্যপানের জের কি না, বুঝতে পারলাম না।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন পিঙ্কির মা। প্লেটটা এক কোণে নামিয়ে রেখে এসে আমাকে বললেন, "অনেক রাত্তির হয়ে গেল। কাল আবার সকাল আটটার মধ্যে অফিসে বেরতে হবে। পিঙ্কাইয়ের স্কুলও সকাল সাড়ে সাতটায়। আমি চলি। আপনি কি এখন যাবেন? তা হলে আপনার সঙ্গেই চলে যেতাম।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে আটটা। আরও আধঘণ্টা স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। বললাম, "আপনারা যান। আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে হবে।"

"চলি তা হলে।"

পিঙ্কির মা হেঁটে যাচ্ছিল। সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। পিঠের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। কোমরের একটা ভাঁজও। চলার ছন্দে নিতম্ব নাচছে।

আচ্ছা, ওই পিঠে চুমু খেতে কেমন লাগবে?

কথাটা ভেবে ভেতরে ভেতরে এমন উত্তেজিত হলাম যে, এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে দিলাম। তলপেটটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। একবার টয়লেটে গিয়ে হালকা হয়ে আসা দরকার। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় মাথাটা একটু টলে উঠল। নেশা হয়ে গেল নাকি? চেয়ারের হাতলটা ধরে, নিজেকে সামলে হলঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনেই হোটেলের বার। নিশ্চয়ই সেখানে টয়লেট থাকবে। বার-এর ভেতর ঢুকতেই দেখলাম দিবাকরদা এক কোণে বসে ড্রিঙ্ক করছে। পাশ দিয়ে টয়লেটে গেলাম। আমাকে দেখতেই পেল না।

"আপনি অর্কদা না?"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, পরিচিত মুখ। কালীঘাট স্টেশন দিয়ে আমারই বয়সী এই ছেলেটা রোজ যাতায়াত করে। রাতের ডিউটিতে প্রায় দেখা হয়। ছেলেটার নাম জানি না। দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, "হ্যাঁ, তুমি এখানে?"

ছেলেটা বলল, "আমি তো এই হোটেলে চাকরি করি। টেলিফোন অপারেটর। আপনাকে আমি ভাল করে চিনি।"

"তোমার নামটা কী ভাই?"

"সায়ন্তন বসুমল্লিক। আপনি আরতিদিকে তো চেনেন। অমিয়দার স্ত্রী। আমি আরতিদির পিসতুতো ভাই। দিদির মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

সায়ন্তনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "ভাই, কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"বলুন।"

"এই হোটেলে সুখবিন্দর সিং নামে এক ভদ্রলোক প্রায় আসেন, তাঁকে তুমি চেনো?"

"খুব চিনি। মাস দশেক ধরে যাতায়াত করছে। প্রথমদিকে হোটেল রেজিস্টারে আসানসোলের অ্যাড্রেস দিত। এখন দেয় হলদিয়ার। এই ভদ্রলোকের সম্পর্কেই কি কিছু জানতে চান আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এখানে বসে কিছু বলা যাবে না। এক কাজ করুন, কাল যখন আপনাদের স্টেশন দিয়ে আসব, তখন আমাকে ডেকে নেবেন। লোকটার সম্পর্কে আমি এমন কিছু জানি, যা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।"

"কাল ভুলো না কিন্তু।"

"না, না। আমার মনে থাকবে।"

টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসার মুখে হঠাৎই বমি পেয়ে গেল। বেসিনের কাছে গিয়ে হড়হড় করে সব উগরে দিলাম। চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই খানিকটা সুস্থবোধ করলাম। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কোয়েট হলে ফিরে যাওয়াটা উচিত হবে না। চুলোয় যাক, বুলুদি আর তার জন্মদিনের পার্টি। বাড়ি ফিরে এখুনি বিছানায় টানটান হওয়া দরকার। বার-এর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

রাত প্রায় ন'টা। চৈত্র মাসের সেল চলছে গড়িয়াহাটের মোড়ে। বেশ জমজমাট। লোকজনের চোখ-মুখ দেখে মনে হয় না, কারও অভাব আছে, অথবা কোনও দুঃখ। মিনিট দশেক পর একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে আমি উঠে পড়লাম। ভেতরে বেলফুলের গন্ধ। লোকনাথ বাবার ছবিতে মালা ঝুলিয়েছে ড্রাইভার। মিটার ডাউন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন স্যার?"

"দুর্গাপুর ব্রিজের কাছে। চেতলায়।"

জানলার কাচটা নামিয়ে দিতেই ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা দিল। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর দু'পাশে দোকানগুলো ঝলমল করছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই সোজা হয়ে বসলাম। আরে, দিবাকরদা না? ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সঙ্গে পিঙ্কি আর ওর মা। ভদ্রমহিলা এখনও বাড়ি ফেরেননি? দিবাকরদাকেই বা জোটালেন কোত্থেকে? এই তো একটু আগে বার-এ বসে দিবাকরদা ড্রিঙ্ক করছিল। ট্যাক্সিটা এত জোরে ছুটছে, এক পলকের বেশি ওদের দেখতেই পেলাম না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই চেতলায় পৌঁছে গেলাম। দোতলা থেকে বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়েছিল ঝুলন। নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল, "হোটেল থেকে কোথায় গেছিলে অর্কদা? দিদিভাই এখুনি ফোনে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল?"

"কী বলল বুলুদি?"

"তুমি নাকি কিছু না খেয়েই চলে এসেছ? খাবে কিছু?"

"না রে। বুলুদি কখন ফিরবে কিছু বলল?"

"আজ নাও ফিরতে পারে। দাদাভাইয়ের সঙ্গে হয়তো হোটেলেই থেকে যাবে।"

মনে মনে হাসলাম। আজ রাতে দিবাকরদা যদি না ফেরে, তা হলে বুলুদি রাতটা কোথায়

কাটাবে, আমি তা জেনে গেছি। ঝুলনকে বলার কোনও দরকার নেই। ঘরে ঢুকে চুপচাপ জামা-প্যান্ট ছেড়ে তোয়ালে জড়িয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। মাথাটা ঠান্ডা রাখা দরকার। এ বাড়িতে থাকার যখন আর প্রশ্নই নেই, তখন বাড়ির লোকজনদের নিয়ে ভেবে লাভ কী?

রাতের দিকে চৌবাচ্চার জল বেশ ঠান্ডা থাকে। মগে করে মাথায় জল ঢালতেই সারা শরীরটা জুড়িয়ে গেল। হঠাৎ, ভেবে পেলাম না, মনটা এত আশ্বস্ত হয়ে উঠছে কেন? আমি তো সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলেছি। বুলুদি কার সঙ্গে শুলো, সুখিজি আগে আসানসোলে ছিলেন কি না, দিবাকরদা রাতে কেন বাড়ি ফিরবে না, এসব নিয়ে আমি ভাবব কেন? কথাটা মনে হতে মনটা হালকা হয়ে গেল। স্নান সেরে আমি ঘরে এসে দাঁড়ালাম। ফুলস্পিডে পাখা চলছে। আলো নিভিয়ে দিয়ে, আমি পাখার তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে উঠোনও। সেদিকে তাকাতেই মনটা আরও ফুরফুরে হয়ে গেল।

"অর্কদা, শুয়ে পড়েছ নাকি?"

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঝুলন বলল কথাটা। শাড়ি ছেড়ে পাতলা একটা ম্যাক্সি পরে এসেছে। আবছা আলোয় ওর শরীরের চড়াই-উতরাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমি যেন পিঙ্কির মাকে দেখতে পেলাম। হঠাৎই শরীরের ভেতর উত্তেজনা। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যই বললাম, "আজ পার্টিতে তোকে নিয়ে গেল না কেন রে বুলুদি?"

"জানি না।" কথাটা বলে ঝুলন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। "সুখিজি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল। দিদিভাই যেতে দিল না।"

"তোর খারাপ লাগেনি?"

"আমার খারাপ লাগা বা না লাগায়, কার কী এসে যায়, বলো?"

"তা ঠিক। তোর জ্বরের সময়ও কিন্তু বুলুদি হলদিয়া থেকে আসেনি।"

"ছাড়ো তো পুরনো কথা। দক্ষিণ দিকের জানলটা বন্ধ করে রেখেছ কেন, অর্কদা? খুলে দেব? তা হলে জ্যোৎস্নায় ঘরটা ভরে যাবে।"

"তোর যদি ইচ্ছে হয়, দে।"

বিছানায় উঠে হাত বাড়িয়ে জানলাটা খুলে দিল ঝুলন। হাঁটু দুটো এক পাশে ভাঁজ করে মৎস্যকন্যার মতো বসে আছে। ওর চুলে, উন্মুক্ত কাঁধে, গালে চাঁদের রুপোলি স্পর্শ। ঝুলন আমাকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল।

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব অর্কদা?"

"বল।"

"সেদিন সন্ধেবেলায় কী স্বপ্ন দেখে তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে গো?"

"তোকে বলা যাবে না।"

"কী এমন স্বপ্ন যে, বলা যাবে না?"

"কী হবে তোর ওই কথা শুনে?"

"স্বপ্নটা দিদিভাইকে নিয়ে, না?"

"হ্যাঁ। একজন মার্ডার করতে আসছে দিদিভাইকে।"

কথাটা শুনে ঝুলন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এ বাড়িতে যে কোনও দিন একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে যাবে। তুমি দেখো অর্কদা। চোখের সামনে যা দেখছি, এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। দিদিভাই তো নিজের একটা ব্যবস্থা করে রাখছে। আমারই সমস্যা

pathagar.net

হয়ে যাবে।"

"কী ব্যবস্থা করেছে দিদিভাই?"

"তুমি জানো না? প্রতাপাদিত্য রোডে নাচের স্কুলের সঙ্গে দুটো ঘর খুব সাজিয়েছে দিদিভাই। একদিন ফোনে কাকে যেন বলছিল, মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে থাকবে।"

"এই খবরটা তো জানতাম না।"

"জানবে কী করে? কতক্ষণ তুমি থাকো এ বাড়িতে? অত দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন অর্কদা। এখানে এসে দ্যাখো, উঠোনটা কেমন ভরে গেছে জ্যোৎস্নায়? জানো, পূর্ণিমার রাতে আমি একা একা ছাদে ঘুরে বেড়াই। অনেক রাত অবধি আমি জেগে থাকি। সারা পাড়া তখন নিঝুম হয়ে যায়।"

বিছানায় উঠে বসে আমি বললাম, "একা একা ঘুরে বেড়াতে তোর ভাল লাগে?"

"সত্যি বলতে, না। জানো, রেখারা কী করে পূর্ণিমার রাতে? না বাবা, বলব না। শুনলে তুমি রেগে যাবে।"

"না, রাগব না। তুই বল।"

"ভাটপাড়ায় ওদের তিনতলার ঘরে রেখা আর ওর হাজবেন্ড পূর্ণিমার আলোয় একেবারে নেকেড হয়ে শুয়ে থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন একতলায়। তখন ওদের কেউ ডিসটার্ব করারও থাকে না।"

"জ্যোৎস্নার রাতে তুই আমায় ডাকিস না কেন ঝুলন?" বলতে বলতেই আমি বালিশ টেনে পা দুটো টানটান করে ছড়িয়ে দিলাম।

দেখে ঝুলন বলে উঠল, "এ কী, ভিজে চুলে তুমি শুয়ে পড়লে যে? এখুনি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এদিকে এসো। আমার কোলে মাথা রেখে শোও তো। আমি চুল শুকিয়ে দিচ্ছি।"

ঝুলনের কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। চুলের মাঝে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে ও বলল, "তোমাকে ডাকলে তুমি যেতে? একটা সময় তো তুমি সহ্যই করতে পারতে না আমাকে।"

সামান্য ঝুঁকে ও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর গলার লকেটটা আমার চোখের সামনে দোল খাচ্ছে। ভারী দুটি স্তন ইচ্ছে করলেই আমি ছুঁয়ে দেখতে পারি। ওর বুক থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সেই গন্ধটাই আমাকে পাগল করে দিল। কোনও উত্তর না দিয়ে, দু' হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের ওপর টেনে আনলাম। আহ, আমার সারা শরীরে তীব্র একটা সুখ খেলে বেড়াতে লাগল। যেন এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল ঝুলন। পা দুটো টানটান করে, উপুড় হয়ে আমার বুকের ওপর ও উঠে এল। তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইল, "বলো অর্কদা, কেন তুমি কিছু বলছ না?"

ফিসফিস করে বলা কথাগুলোই আমার সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে, কেমন যেন ঘোর লাগা মানুষের মতো বললাম, "তোকে আজ কেন এত সুন্দর লাগছে রে ঝুলন?"

আঙুলটা সরিয়ে দিয়ে ও বলল, "তোমাকেও অন্যরকম লাগছে গো। কলঘর থেকে খালি গায়ে তুমি যখন বেরলে, তখনই মনে হল, তোমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর থাকতে পারলাম না অর্কদা। তোমার কাছে ছুটে এলাম।"

দু' হাত দিয়ে আলতো করে ওর মুখটা টেনে আনলাম। ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। চোখ বোজা। দেখেই মনে হল, আমাকে আজ সব কিছু দিতে এসেছে ঝুলন। ঠোঁটে প্রথম

চুমুটা দিতেই ও কেঁপে উঠল। সেই কম্পন ছড়িয়ে গেল আমার শরীরেও। জীবনে এই প্রথম কোনও মেয়েকে আমি চুমু খেলাম। ভাল লাগার তীব্র স্বাদ আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ছড়িয়ে গেল। ঝড়ের গতিতে ওর মুখের সর্বত্র চুমু খেতে খেতে আমি বললাম, "আয় ঝুলন, আজ আমরা রেখাদের মতো হয়ে যাই।"

লজ্জায় দু' হাতে মুখটা ঢেকে রয়েছে ঝুলন, ফিসফিস করে বলল, "আমি পারব না। আমার শরীর কাঁপছে।"

চাঁদের আলো ওর শরীর থেকে ঠিকরে বেরচ্ছে। কালো পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তি বলে মনে হচ্ছে ওকে। ধীরে ধীরে ওকে শুইয়ে দিলাম।

আমার রক্তে তুফান উঠল। ওর তপ্ত প্রশ্বাস আমার সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

১৩

ময়দানে কোনও পার্টির সমাবেশ আছে বোধহয়। সকাল থেকে দেখছি পাতাল রেলে প্রচুর লোক। দেখেই বোঝা যায়, মফস্বল থেকে আসা। ভোরবেলার ট্রেনে এঁদের হয়তো তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে কোনও নেতা। শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে হাঁটিয়েছে এসপ্লানেড পর্যন্ত। দুপুরে সমাবেশ। মাঝে কিছু সময় হাতে থেকে যায়। সেই সময় পাতাল রেল ভ্রমণ আর কালীঘাটের মায়ের মন্দির দেখানো—দুটোই একসঙ্গে হয়ে যায়। তাই সমাবেশের দিন আমাদের স্টেশনে চাপটা পড়ে বেশি।

গঙ্গাসাগর মেলা, দুর্গাপুজো, ঈদের সময়ও এই ধরনের লোকগুলোকে সামলাতে গিয়ে আমাদের হিমসিম খেতে হয়। পাতাল রেলের চাকচিক্য, আলোর ঝলকানি, ঠাঁটবাটওয়ালা মানুষ—সব মিলিয়ে এদের কাছে যেন রূপকথার জগৎ। আমাদের দেশের বাড়ির লোকজন কখনও সখনও এলে, বুঝতে পারি। বছরে একবার করে ভগীরথপুরে যাই। তখন মানুষজন ছেঁকে ধরে পাতাল রেলের গল্প শোনার জন্য।

মফস্বল বা গ্রামের মানুষের সব থেকে ভয় এসকালেটরকে নিয়ে। অনেকেই চড়তে চায়। অথচ সাহসে কুলোয় না। ম্যাগনেটিক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আজ এই রকম একদল প্যাসেঞ্জারকে লক্ষ করে যাচ্ছি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী একটা ছেলে এসকালেটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তার স্ত্রী। ছেলেটা সাহস জোগাচ্ছে, অথচ মেয়েটা রাজি নয়। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে চাইছে। পথ আটকে থাকায় পিছনের যাত্রীরা বিরক্ত। তা বুঝে ছেলেটা তার স্ত্রীকে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

চলন্ত সিঁড়িতে পা দিয়ে ডান অথবা বাঁদিকের রেলিং ধরে থাকলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। যারা জানেন না, তারাই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর তখন দুর্ঘটনা ঘটে। অবশ্য যন্ত্র বিভ্রাটেও কখনও কখনও দুর্ঘটনা হয়। এই তো কিছুদিন আগে চাঁদনি চক স্টেশনে হঠাৎই এসকালেটর উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। ওপরে ওঠার বদলে হঠাৎ নীচের দিকে নামতে শুরু করে। বেশ কিছু লোক পড়ে গিয়ে চোট পান।

এসব ক্ষেত্রে আমরা অস্বস্তিতে পড়ি। লোকজন আমাদের ওপর খেপে যান। এসকালেটর বিগড়ে গেলে একটাই কাজ করতে পারি। সুইচ টিপে সেটা বন্ধ করে দেওয়া। ওপরের দিকে একটা জায়গায় লেখাও রয়েছে, চলন্ত সিঁড়ি বন্ধ করার জন্য এখানকার বোতাম টিপুন। যে কোনও যাত্রীই এটা করতে পারেন। কিন্তু বিপদের সময় কারও খেয়াল

থাকে না। তাঁরা ঝালটা ঝাড়েন আমাদের ওপর।

আপ-ডাউন দুটো ট্রেন একসঙ্গে চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। ইন্দ্রদার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় আর্ত চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দৌড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখি, সেই মেয়েটা এসকালেটরে কাত হয়ে পড়ে আছে। শাড়ির একটা অংশ চলন্ত সিঁড়ির খাঁজে ঢুকে গেছে। অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মেয়েটা চিৎকার করছে। এমন একটা কিছু ঘটবে, আন্দাজ করেছিলাম। তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে এসকালেটর থামিয়ে দিলাম। শাড়ির একটা অংশ ছিঁড়ে, পাঁজাকোলা করে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এলাম ইন্দ্রদাদের ঘরে।

ঘষটানিতে উরুর কাছটায় অনেকটা কেটে গেছে। অঝোরে রক্ত পড়ছে। রক্ত দেখে মেয়েটা কান্নাকাটি করছে। আমাদের কাছে ফার্স্ট এইডের বক্স থাকে। কিন্তু চোটের পরিমাণ এত বেশি, মেয়েটাকে এখুনি হাসপাতালে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার। কান্নার আওয়াজ শুনে সিট ছেড়ে দুর্গা ব্যানার্জি উঠে এসেছে। বলল, "অর্কদা, এদের বাঙুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। এখানে ফেলে রাখবেন না।"

সাদা তুলো ডেটলে ভিজিয়ে চোটের জায়গায় লাগাতে যাব, মেয়েটা কিছুতেই লাগাতে দেবে না। লজ্জায় শাড়ি দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে উরুর কাছটা। মেঝেতে রক্তের ধারা দেখে দুর্গা বলল, "অর্কদা, মনে হচ্ছে অন্য কেস। এই সামান্য কাটার জন্য এত ব্লিডিং হতে পারে না। মেয়েটা বোধহয় প্রেগনেন্ট। আপনি সরে দাঁড়ান। আমি দেখছি।"

দুর্গা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখ শুকিয়ে গেছে বেচারার। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "হাসপাতালটা কতদূরে স্যার?"

"কাছেই। কোথায় বাড়ি আপনার?"

"মছলন্দপুরে।"

"দেরি করবেন না। সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি। হাসপাতালে চলে যান।"

"আমার কাছে টাকা নেই স্যার।"

সেটাই স্বাভাবিক। শুনে পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে শিউলালকে দিয়ে বললাম, "তুই সঙ্গে যা। এদের বাঙুর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবি।"

মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত। দেখে গা-টা গুলিয়ে উঠল। দুর্গা বলল, "তিন মাসের প্রেগন্যান্সি। বাচ্চাটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল অর্কদা।"

বললাম, "দোষ কিন্তু ছেলেটার। মেয়েটা চাইছিল না। ছেলেটাই জোর করছিল এসকালেটরে ওঠার জন্য।"

দুর্গা মুখ টিপে হেসে বলল, "টাকাটা গচ্চা গেল তো। কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলেন কে জানে?"

ঠাট্টা করে বললাম, "আজকাল ঘুম থেকে উঠেই নীল শাড়ি পরা একটা মেয়ের মুখ দেখতে পাই। গচ্চাটা বোধহয় তারই জন্য দিতে হল।"

খিল খিল করে হেসে উঠল দুর্গা, "তারপর নিজেকে সামলে বলল, "উফ্ অর্কদা, আপনি কথা বলতে পারেন বটে। কী হল, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন যে? কী দেখছেন?"

"দুটো জিনিস। আজ পর্যন্ত কোনও পুলিশকে আমি হাসতে দেখিনি। আর হাসলেও যে, কোনও পুলিশকে এত সুন্দর দেখাতে পারে, সেটাও দেখিনি।"

"সাবধান অর্কদা", হাসতে হাসতে দুর্গা বলল কথাটা, "আমার সার্জেন্ট শুনতে পেলে

pathagar.net

কিন্তু আপনাকে ধোলাই করতে পারে।"

"কেমন আছে সে?"

"পা ভেঙে পড়ে আছে। একটা লরিকে চেজ করেছিল আনোয়ার শা রোডে। বাম্পারে টাল সামলাতে পারেনি। পড়ে গিয়ে বাঁ পা জখম।"

"যাক, লরিওয়ালারা কয়েকদিন নিশ্চিন্ত থাকবে। ঘুষ নেওয়ার লোক নেই।"

চোখ পাকিয়ে দুর্গা বলল, "ভাল হবে না বলছি। সব সার্জেন্ট পয়সা নেয় না।"

শিউলাল যাওয়ার সময় বোধহয় যাদবকে খবর দিয়ে গেছিল। ও এসে মেঝে পরিষ্কার করতে লাগল। দুর্গার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সকাল থেকে ইন্দ্রদাকে দেখিনি। বোধহয় মেট্রো ভবনে গেছেন। কাল বাড়ি যাওয়ার সময় ইন্দ্রদাকে খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখেছিলাম। কেমন যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমাকে একবার বললেন, "সুজয়টাকে নিয়ে কী করা যায় বল তো? প্রায়দিন অ্যাবসেন্ট। ওপরওয়ালাদের কানে কথাটা কেউ তুলে দিলে তো আমি মুশকিলে পড়ে যাব।"

আমি বলেছিলাম, "আপনি ডেকে একবার সরাসরি কথা বলুন না।"

"তাতে কি কোনও লাভ হবে?" তুই একটা কাজ করতে পারবি অর্ক? সুজয়ের বউকে একবার দেখে আসতে পারবি? আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খারাপ বলে বোধহয় সুজয়ের ধারণা হয়েছে, মিতার চিকিৎসার জন্য আমি টাকা তুলে দিচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, কাল একবার যাব।

আজ ঠিক করেই এসেছিলাম, টুক করে লেক মার্কেটে সুজয়দার বাড়িতে একবার ঘুরে আসব। মাঝখানে এসকালেটরে দুর্ঘটনাটা দেরি করিয়ে দিল। হাতঘড়িতে দেখলাম, প্রায় একটা বাজে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসা যাবে। কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করছে সুমন্ত্র আর সীতাংশু। ওদের বললাম, "আমি একটু বাইরে বেরুচ্ছি। ইন্দ্রদা এলে বলে দিস, মিতা বউদির কাছে গেছি।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে অটো স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। গা চিটপিট করে উঠল। পাতালে আমরা অনেক ভাল থাকি। সারা বছর একই রকম আবহাওয়া। না গরম, না ঠান্ডা। প্রকৃতিকে বশ করে রেখেছে মানুষ পাতালে। মনোময়বাবুর মুখে শুনেছি, আমেরিকায় নাকি পাতালে তিনতলা রেল চলে। প্রথমে ইয়েলো লাইন, তার নীচে ব্লু, তারও নীচে গ্রিন লাইন। কীভাবে এটা সম্ভব, আমার মাথায় তা ঢোকেনি। তা হলে গ্রিন লাইন ধরে কোথাও যেতে হলে মানুষকে কত নীচে নামতে হতে পারে?

রাসবিহারী অ্যাভেনিউর ডানদিকের ফুটপাথ ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম। ইদানীং রোজ এই সময়টায় আমাকে ফোন করে ঝুলন। তাই ইন্দ্রদাদের ঘরের খুব কাছাকাছি থাকি। সাধারণ সব কথাবার্তা। কী রান্না করেছে, বুলুদি বাড়িতে আছে, না বেরিয়ে গেছে। দিবাকরদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কি না। পাড়ায় কোন বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে কে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে। আমার বেশ ভাল লাগে ওর সঙ্গে কথা বলতে।

সেদিন পূর্ণিমার রাতে ঝুলন আমাকে আশ্চর্য জগতের সন্ধান দিয়েছে। যখনই বাড়ি ফিরি না কেন, ওকে দেখলেই ইদানীং আমার শরীরের খিদেটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। বুলুদি বাড়িতে থাকলে অবশ্য ও আমার ধারেকাছে আসে না। আগে ওর মধ্যে এই সাবধানতা দেখতাম না। এখন বুলুদি হলদিয়ায় যাওয়ার কথা তুললেই ঝুলনের চোখ-মুখ ঝকমক করে ওঠে। ফোনে কায়দা করে কথাটা আমাকে জানিয়ে দেয়। রাসবিহারীর মোড়ে একটা ওষুধের দোকান

থেকে সেদিন আমি কনডোম কিনে রাখি। রাতটা আমার একতলার ঘরেই ঝুলন কাটিয়ে দেয়।

কাল রাতে বিছানায় শুয়ে স্টার মুভিজ চ্যানেলে র‍্যাম্বো থ্রি দেখছিলাম। হলদিয়া থেকে বুলুদি ফেরেনি। দিবাকরদাও বাঙ্গালোরে। ঝুলনের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। হঠাৎ সদর দরজায় তালা দিয়ে এসে ও আমার পাশে শুয়ে ফিসফিস করে বলল, "অর্কদা, কী এসব মারপিট দেখছ? কেবল চ্যানেলটা দাও। একটা ভাল জিনিস দেখতে পাবে।"

কথাটা বলেই পাশে রাখা রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে ও সুইচ টিপতে লাগল। কেব্‌ল চ্যানেলে ছবি দেখে আমি অবাক। ঝুলন সাউন্ড কমিয়ে দিয়ে বলল, "প্রতি শনিবার রাতে এইসব ফিল্ম দেখায়। আমি জানতাম না। আমাকে রেখাই বলল। ভাটপাড়ায় দেখতে পায় না বলে প্রতি শনিবার ওর বর চেতলায় চলে আসছে।"

পর্দায় যৌনমিলনের ছবি দেখতে দেখতে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। ঝুলনের বুকে হাত দিতে দিতেই ও বলেছিল, "আঃ, সবুর করো না। ফিল্মটা আগে শেষ হতে দাও।"

ফিল্মটা শেষ হওয়ার পরই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। "আজ কিন্তু আমার ফ্রি ডেট।"

থমকে গিয়ে বলেছিলাম, "তার মানে?"

ও তখন আমাকে ঋতুচক্রের নিয়মটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। তার মানে, সাবধান হওয়ার দরকার নেই। "পাঁচটা দিন আমার ফ্রি ডেট, বুঝলে? প্রত্যেক মাসে এই ক'টা দিন যদি দিদিভাই না থাকে, তা হলে কী মজা হবে বলো তো?"

"তুই এত সব কার কাছ থেকে জানলি?"

"রেখা বলেছে। ও আমাকে সব বলে, জানো। ডেটের গোলমালেই তো ও এবার বেঁধে গেল। না হলে বাচ্চা এখনই দুজন চায়নি।"

...লেক মার্কেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কাল রাতের কথা ভাবছি। মেয়েরা কত সহজে নিজেদের গোপন জীবনের কথা একে অন্যকে বলতে পারে। এই রেখা যেমন বলে ঝুলনকে। অথচ ছেলেরা? কখনওই তা আলোচনা করবে না। এই যে অমিয়, আমার সঙ্গে যার এত ভাল সম্পর্ক, জিজ্ঞেস করলে কোনওদিন আমাকে বলবে, আরতির সঙ্গে ওর যৌনজীবনের কথা? কখনওই না। আমিই ওকে জিজ্ঞেস করতে পারব না।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা হঠাৎ মাথায় ঢুকে গেল, আমার সঙ্গে সহবাসের কথা কি ঝুলন বলতে পারে রেখাকে? একজন অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে এসব কথা বলাটা কি সম্ভব?

আমাদের গোপন অভিসারের কিন্তু কোনও সাক্ষী নেই। যা কিছু ঘটছে, স্রেফ আমাদের দু'জনের মধ্যে। এবং দু'জনের সম্মতিতেই। যত দিন যাচ্ছে, ঝুলনের মধ্যে শারীরিক মিলনের আগ্রহটা আরও বেশি করে টের পাচ্ছি। একা আমাকে দায়ী করা যাবে না।

ইদানীং আমার মধ্যেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করছি। ঝুলনের প্রতি ভাল লাগাটা ক্রমেই ভালবাসায় এসে দাঁড়াচ্ছে। আর কোনও মেয়েকে দেখে এমন অনুভূতি আমার কখনও হয়নি। মাঝে কয়েকটা দিন এ নিয়ে খুব ভেবেছি। ওর উপর এই টান কি নিছকই শরীরের? পরে দেখলাম, এ ভালবাসা সহমর্মিতা থেকে আসা। হয়তো মনের প্রস্তুতি ছিল। শরীরের আকর্ষণ সেটাকে আর বাড়িয়ে দিয়েছে।

অথবা যদি উল্টোটাও হয়, তাতে ক্ষতি কী? আগে শরীর, পরে মন? মনের ভালবাসার

পরিণতি তো আমাদের বাড়িতেই দেখতে পাচ্ছি। বুলুদি আর দিবাকরদাকে। একজন এখন অন্যজনকে হিজড়ে বলছে। আমেরিকানরাই ঠিক। আগে দু'টো শরীর কাছাকাছি আসুক। একসঙ্গে বসবাস করার অভ্যাসটা হোক। তারপর মনের বন্ধনটা আপনা থেকেই আসবে। শরীর অচল হওয়ার আগে অনেক বছর কেটে যাবে। ততদিনে দু'টো মন বাঁধা পড়তে বাধ্য।

ঝুলনের কথা ভাবতে ভাবতে লেক মার্কেটের মুখে পৌঁছনোর আগেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুজয়দার সঙ্গে। আমাকে বলল "এই অর্ক, কোথায় যাচ্ছিস?"

'তোমার বাড়িতে যাচ্ছি' বললে সুজয়দা চটে যাবে। তাই বললাম, "রজনীগন্ধার কয়েকটা স্টিক কিনব ভাবছিলাম। তাই মার্কেট যাচ্ছি।"

সুজয়দা অবিশ্বাসী চোখে বলল, "রজনীগন্ধার স্টিক কিনতে তুই এতদূর এসেছিস? আশ্চর্য! ও তো রাসবিহারীর মোড়েই পাওয়া যায়।"

"লেক মার্কেটে অনেক সস্তা।"

'ধুত। তুই আমার সঙ্গে রাসবিহারীতে চল। ওখানে গণা বলে একটা ছেলে ফুল নিয়ে বসে। তোকে আমি জলের দরে কিনে দিচ্ছি।"

অগত্যা বললাম, "চলো তা হলে।"

কয়েক পা হাঁটার পর সুজয়দা বলল, "তোর ইন্দ্রদার তো বাঁশ আসছে। কিছু শুনেছিস?"

চমকে উঠে বললাম, "না তো?"

"শুয়োরের বাচ্চাটা বদলি হয়ে যাচ্ছে এম জি রোডে।"

এম জি রোড মানে, মহাত্মা গাঁধী রোড স্টেশনে। কয়েকদিন আগে চক্রবর্তীদা বলছিলেন বটে, ইন্দ্রদা বদলি হতে পারেন। তখন অত গুরুত্ব দিইনি। এখন দেখছি, কথাটা তা হলে ঠিক। বললাম, "ইন্দ্রদার উপর তোমার এত রাগ কেন সুজয়দা?"

"কারণ আছে। আরও বড় একটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে তোর ইন্দ্রদা। কথাটা পরে মিলিয়ে নিস, ঠিক বললাম কি না।"

"তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় সুজয়দা?"

"টাকার সন্ধানে। শালা, মাথার চুল বিকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে তোর বউদির জন্য। এমন রোগ বাঁধিয়েছে..."

"কেমন আছে এখন বউদি?"

"একই রকম। কেমো চলছে। ডাক্তার তো বলছে, যে কোনও দিন মারা যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি ডিটোরিয়েট করে গেল।"

শুনেই বুকটা ধক করে উঠল। কী সহজে সুজয়দা বলল কথাটা! চুপ করে রইলাম। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অটো স্ট্যান্ডের কাছে আসতেই সুজয়দা বলল, "রজনীগন্ধার স্টিক তুই কিনবি না? ওই যে গণার দোকান। চল, তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

বললাম, "না থাক। এখন দরকার নেই। ফেরার সময় কিনব।"

মন ভার করে নীচে নেমে এলাম। প্রচণ্ড জল চেষ্টা পেয়েছে। পেপসি কাউন্টারে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার। ঘামে জামাটা চপচপ্ করছে। পেপসি কাউন্টারের ও পাশে দু'টো পাখা লাগানো আছে। পুলিশের লোকজনদের জন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘাম শুকোতে শুকোতে পায়েলকে বললাম, "এই, আমাকে একটা পেপসি এনে দেবে?"

একটা পেপার কাপে পেপসি ঢেলে কাছে এসে পায়েল বলল, "এই গরম থেকে এসেই

ঠান্ডা খাবেন অর্কদা? একটু জিরিয়ে নিন?"

'এবার বাড়ি কাটব।"

"একটু আগে আপনাকে সেই মেয়েটা খুঁজতে এসেছিল অর্কদা। যার ব্যাগ সেদিন হারিয়ে গেছিল।"

"কোনদিকে গেল?"

"প্ল্যাটফর্মে।"

"আমাকে খুঁজছিল, কী করে বুঝলে?

"ইন্দ্রদার সঙ্গে যে কথা বলল।"

"ইন্দ্রদাকে তুমি দেখেছ?"

'হ্যাঁ। উনি বললেন, আপনি একটু বাইরে গেছেন।"

পেপসির কাপটা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি ইন্দ্রদার ঘরে ঢুকলাম। মিতা বউদির সঙ্গে দেখা হয়নি, কথাটা কী করে বলব তা ভেবেই পেলাম না। টেবিলে টাকার বান্ডিল। সকালের শিফটে তিনটে কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির টাকা। হিসাবটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে সুমন্ত্র আর সীতাংশুরা। টাকার বান্ডিল আপাতত ইন্দ্রদা তুলে রাখবেন ঘরের এক কোণে সিন্দুকে। তারপর হিসাবটা জানিয়ে দেবেন মেট্রো ভবনের কন্ট্রোল রুমে।

মুখ তুলে আমাকে দেখেই ইন্দ্রদা বললেন, "অর্ক, তুই নাকি আজকাল আর ক্যান্টিনে খাচ্ছিস না?"

"না ইন্দ্রদা। বাড়িতে গিয়েই খাচ্ছি।"

"ভাল করছিস। আমিও ভাবছি কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নেব। যাদবের রান্না আর খাওয়া যাচ্ছে না।"

কথা বলতে বলতেই টাকার বান্ডিলগুলো ইন্দ্রদা সিন্দুকে তুলে রাখছেন। আড়চোখে দেখলাম, সিন্দুকের ভেতর আরও অনেক বান্ডিল জমে আছে। তার মানে, ব্যাঙ্কের লোক টাকা নিতে বেশ কয়েকদিন আসেনি। পাঁচ-ছয় লাখ টাকা হয়তো এমন অযত্নেই পড়ে আছে। সিন্দুক বন্ধ করে চাবিটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ইন্দ্রদা বললেন, "হ্যাঁ রে, সুজয়ের বউকে কেমন দেখে এলি?

"যা শুনলাম, ভাল না।"

শুনে ইন্দ্রদার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, "এই অবস্থায় একবার মুম্বই নিয়ে গেলে ভাল হত রে।"

আমার তলপেট ভার হয়ে আছে। অনেকক্ষণ বাথরুমে যাওয়া হয়নি। ইন্দ্রদা আর কিছু জিজ্ঞেস করছেন না দেখে উঠে দাঁড়ালাম। দরজার ডানদিকে ছোট প্যাসেজ ঘুরেই বাথরুম। প্যাসেজে পুরনো কিছু ভাঙা চেয়ার, টেবিলের পায়া, স্টিলের র‍্যাক ডাঁই করা। কম্পিউটার বসানোর সময় এগুলো বাতিল করা হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর এভাবেই পড়ে আছে। মাকড়সা আর আরশোলার ডিপো এই জায়গাটা। ইন্দ্রদা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে, জায়গাটা পরিষ্কার করার। পারছে না।

পেচ্ছাপ করে চোখ-মুখে জল দিচ্ছি। হঠাৎ শুনি, দেওয়ালের ও পাশে কাকে যেন ধমকাচ্ছেন ইন্দ্রদা, "বেরিয়ে যান আপনারা। না জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকেছেন। কে আপনারা?"

"তোর বাপ রে শুয়োরের বাচ্চা।"

উত্তরটা শুনে ভাল লাগল না। পাতাল রেলের কোনও প্যাসেঞ্জার তো এমন অভদ্র ভাষায় কথা বলবেন না। কান পেতে রইলাম, ইন্দ্রদা কী বলেন, তা শোনার জন্য।

"এই গাণ্ডু, সিন্দুকের চাবিটা দিবি, না বুকটা ঝাঁঝরা করে দেব। তাড়াতাড়ি দে, আমাদের হাতে সময় নেই।"

দেওয়ালের ও পাশে কী ঘটছে, এবার একটু আন্দাজ পেলাম। ডাকাতি। পাতাল রেলের ইতিহাসে যা হয়নি। ইন্দ্রদার ঘরে আর কেউ নেই। ডাকাতরা আগে ভাগে খবর নিয়েই এসেছে। এখন ডিউটি বদলের সময়। প্যাসেঞ্জার কম। পুলিশের কেউ সম্ভবত নেই। কপাল ভাল থাকলে ওরা পাঁচ-ছয় লাখ টাকা নিয়ে চম্পট দিতে পারে।

দেওয়ালের ওপর দিকটা গ্রিল দেওয়া। ও পাশটা দেখা যায়। ভাঙা টেবিলের উপর উঠে উঁকি দিলাম। দেখি, ইন্দ্রদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঠিক মুখোমুখি একটা ছেলে পিস্তল উঁচিয়ে আছে। নাকের কাছে রুমাল বাঁধা। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা। সেই ছেলেটাই তড়পাচ্ছে। বাঁ দিকে কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে আরেকটা ছেলে। ড্রয়ার খুলে চাবিটা সে বের করে ফেলেছে। পাজামা পরা ছেলেটা মেঝে থেকে একটা কিট ব্যাগ তুলে ছুড়ে দিল। নিজে সরে গেল দরজার দিকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেটা চাপা স্বরে বলল, "শালা চেঁচালেই গুলি করে দেব।"

পরিস্থিতি দেখেই বুঝলাম, ইন্দ্রদার কিছু করার নেই। এস এস-দের ঘরে কোনও অ্যালার্ম বেল নেই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের ঘরে আজকাল যেমন থাকে। অত টাকা স্টেশনের সিন্দুকে পড়ে থাকে, অথচ তার নিরাপত্তার কথা কেউ কোনওদিন ভাবেননি। ইন্দ্রদাকে মেরে অজ্ঞান করে, দরজা খুলে স্বচ্ছন্দে ছেলেগুলো হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারে। অন্য কেউ ঘরে না ঢুকলে, বুঝতেই পারবে না ভেতরে ডাকাতি হয়ে গেছে।

মাথাটা আর ঠিক রাখতে পারলাম না। ইন্দ্রদাকে বাঁচানো দরকার। টেবিলের একটা পায়া তুলে নিয়ে তিন লাফে প্যাসেজটা পেরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার ঠিক ও পাশেই পিস্তল হাতে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। আঘাতটা ওকে আগে করা দরকার। শরীরের সব শক্তি কাঁধে জড়ো করে দরজায় আচমকা ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকে এলাম।

ধাক্কায় ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে টেবিলের ওপর। পিস্তলটা আর ওর হাতে নেই। টেবিলটা গিয়ে আলমারির উপর কাত হয়ে পড়ায় বিরাট শব্দে অন্য ছেলেটা চমকে এদিকে তাকাল। আলমারির ওপর একটা টিনের সুটকেশ রাখা ছিল। সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়া ছেলেটার মাথায় পড়তেই 'আহ' বলে সে চিৎকার করে উঠল।

বেহালায় একটা সময় প্রচুর ঝাড়পিট করেছি। আমি জানি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সময় দিতে নেই। সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা পাইপগান তোলার আগেই আমি টেবিলের পায়া ছুড়ে মারলাম। ব্যালান্স হারিয়ে ছেলেটা ছিটকে পড়ল কম্পিউটারের উপর। ঠকাস করে আরেকটা শব্দ হল। পাইপগানের গুলির শব্দ। চিৎকার করে বললাম, "ইন্দ্রদা, ওকে ধরুন। আমি অন্যটাকে দেখছি।"

ঘুরে তাকিয়েই দেখি, মেঝে থেকে অন্য ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। বিদ্যুৎ গতিতে ডান কনুইটা চালিয়ে দিলাম। 'ওয়াক' শব্দ করে ছেলেটা বসে পড়ল। হুটোপাটির শব্দে দরজার সামনে কেউ বোধহয় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে তাকানোর সময় পেলাম না। কী যেন এসে বিঁধে গেল আমার ডান হাতে। চোখ মুখে অন্ধকার নেমে এল। পড়ে যাওয়ার আগে শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম, ঘর থেকে কে যেন দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ রে ভাই, তোকে নাকি রেল মিনিস্টার একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। কাল রাতে ঝুলন আমাকে বলছিল।"

সকালে ঘরে ঢুকেই বুলুদি প্রশ্নটা করল। রাতে বোধহয় ঘুমোতে পারেনি। চোখের চামড়া সামান্য কুঁচকে গেছে। বুলুদির চেহারায় বেশ বয়েসের ছাপ। মেকাপ করে থাকে বলে অন্য সময় বোঝা যায় না। সকালে চোখ মুখে জল দিয়ে নেমে এসেছে। আসল চেহারাটা এখন ধরা পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সাত সকালে বুলুদি আমার ঘরে হাজির হল কেন, সেটাই আমার মাথায় ঢুকল না। নিশ্চয়ই কিছু বলতে চায়। তাই ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, পাঠিয়েছে।"

"সত্যি বাবা, এ ক'দিন আমার এমন হুজ্জোত গেল। হাসপাতালে তোকে দেখতে যাওয়ার সময়ই পেলাম না। সুখি বলছিল, এসব ডাকাতরা খুব ভিন্ডিকটিভ হয়। তুই একটু কিন্তু সাবধানে থাকিস। দেশে তো ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই। ঝাল মেটানোর জন্য কখন চড়াও হবে, টেরও পাবি না।"

বুলুদির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলাম। এই সব কথা যদি আজ থেকে পনেরো বছর আগে আমায় বলত, তা হলে আমি মেট্রো রেলের সাধারণ এক কর্মী হয়ে জীবনটা শুরু করতাম না। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই বুলুদি আমাকে ব্যবহার করেছে। অন্যকে মারধরে উৎসাহ দিয়েছে। এই যে আজ রেল মিনিস্টারের শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে জানতে এসেছে, তাও নিজের কোনও দরকারে। গত তিন দিনে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। মনে মনে বললাম, বুলুদি, আমার চোখ যে খুলে গেছে, বোধহয় তুমি জানো না।

দুম করে বলে বসলাম, "মেট্রোর কনট্রাক্টটা কি সুখিজি পেয়ে গেছে? তুমি কিছু জানো দিদিভাই?"

"সেই কথাটাই তো তোকে বলার জন্য এলাম। ওর কোটেশানটা অ্যাপ্রুভড হয়েছে। দিন পনেরোর মধ্যেই ও কাজটা শুরু করবে।"

"কাজটা কত টাকার?"

"তিন কোটির মতো হবে। মেট্রোর চারটে স্টেশন রিনোভেশনের কাজটা ও পেল। এদিকে কালীঘাট আর যতীন দাস পার্ক। ওদিকে সেন্ট্রাল আর চাঁদনী চক। তা, শুভঙ্কর দত্তকে বেশ ভাল রকমই দিতে হল। কী আর করা যাবে, বল। জগৎটাই এখন গিভ অ্যান্ড টেকের।"

বুলুদির চোখ-মুখ দেখে আমার মনে হল, মিথ্যে কথা বলছে। শুভঙ্কর দত্ত ঘুষ নেওয়ার লোক নন। আমার বাজিয়ে দেখা হয়ে গেছে। মিথ্যে কথাটা অবশ্য সুখিজিও বলতে পারে বুলুদিকে। ঠিকাদারদের বিশ্বাস করা উচিত না। যে করে, সে ঠকে। আর মাসখানেকের মধ্যেই এ বাড়িটা আমি ছাড়ছি। বুলুদিকে খাতির করার কোনও দরকার নেই।

"তোর হাতের অবস্থা এখন কেমন রে?" প্রশ্নটা করে বুলুদি উঠে দাঁড়াল।

"ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।"

"ক'দিন লাগবে পুরো শুকোতে?"

"দিন সাতেক।"

উত্তরটা শুনে বুলুদি যেন একটু হতাশ হল। তার পর কী চিন্তা করে বলল, "তা হলে তো

ঝুলনকে নিতে পারব না। ও আমার সঙ্গে বাংলাদেশে গেলে এখানে তোকে দেখবে কে? আমি অবশ্য চাইছিলাম না। সুখি জোর করছে। বলছে, আমরা তো নানা কাজে ব্যস্ত থাকব। নাচের মেয়েগুলোকে সামলাবে কে, ঝুলন না গেলে?"

বললাম, "ওকে তুমি নিয়ে যেতে পারো দিদিভাই। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"মুশকিল হচ্ছে, ও যে নিজেও যেতে চাইছে না। বলছে, অর্কদাকে তা হলে কে দেখবে? বললাম, অর্কর সঙ্গে তোর এত পিরিত হল কবে থেকে। আগে তো দু'চোখে দেখতে পারতিস না।"

"কবে রওনা দেবে তোমরা?"

"আগামী রোববার। আর দিন চারেক আছে। আমার হাতে একদম সময় নেই। কাল আর পরশু এই দু'দিন ফাইনাল রিহার্সাল দেব। নতুন স্কুলে ঝুলনও আমার সঙ্গে থাকবে। তোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য করে যাবে। তেমন হলে দুপুরে একবার এ বাড়িতে ওকে পাঠিয়ে দেব।"

"তার দরকার হবে না। পুলিশ এখন এখানে থাকতে বলেছে। না হলে দেশে কয়েক দিন ঘুরে আসতাম। অনেক দিন যাইনি।"

চৌকাঠে পা দিয়ে ফেলেছিল বুলুদি। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িতে পুলিশ এসেছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। কাল বিকেলে এসেছিল। তখন তুমি ছিলে না।"

শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল বুলুদির। বিরক্ত গলায় বলল, "তোর অফিসের ঝামেলা বাড়িতে আনছিস কেন ভাই? নার্সিং হোমে তো তোর সঙ্গে পুলিশ দু'দুবার কথা বলে গেল। ফের বাড়িতে এল কেন?"

"ডাকাতদের আইডেন্টিফাই করতে হবে দিদিভাই। কবে যেতে পারব, সেই কথাটা জানার জন্যই ওরা এসেছিল।"

"পুলিশ ছুলে আঠারো ঘা। না, না, এ বাড়িতে আর যাতে না আসে, সেটা দেখিস। আমি বারণ করে দিলাম। ঝুলনকেও বলে যাচ্ছি।"

কথাগুলো শুনে আমার ভাল লাগল না। বুলুদি চলে যাওয়ার পর গুম হয়ে বসে রইলাম। আমার ডান হাতে ব্যান্ডেজ। কাল বিকেলে জোর করেই শেয়ালদার বি আর সিং হাসপাতাল থেকে চলে এসেছি। ডাক্তার ছাড়তে চাইছিলেন না। তবুও আমি থাকতে চাইনি। আমাদের মতো রেলকর্মীদের জন্য ওই হাসপাতালটা খুবই ভাল। তা সত্ত্বেও, কেন জানি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

কালীঘাট স্টেশনে ডাকাতির খবর নাকি পরদিন কলকাতার সব খবরের কাগজে বড় বড় করে বেরিয়েছিল। হেড লাইন হয়েছিল। 'মেট্রো কর্মীর দুঃসাহসিকতায় ডাকাত ধৃত।' 'ডাকাতি রুখতে গিয়ে মেট্রোকর্মী গুলিবিদ্ধ।' সব কাগজই আমাকে হিরো বানিয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালেই হাজির হয়েছিল খাসখবরের সাংবাদিক। ঢাউস একটা ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে। সেই সময় আমাদের জি এম আমাকে দেখতে হাসপাতালে গেছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলার পর খাসখবরের সাংবাদিককে জি এম নাকি বলেছেন, "অর্ক রায়চৌধুরী উইল বি রিওয়ার্ডেড ফর দিস।"

পুরো ঘটনাটা মনে করলে আমি এখনও অবাক হয়ে যাই। সেদিন আমাকে বোধহয় ভূতে ভর করেছিল। বাথরুম থেকে ডাকাত দলের মাত্র দু'জনকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

pathagar.net

তৃতীয়জন পাহারা দিচ্ছিল ম্যাগনেটিক গেটের কাছে। হুটোপাটির শব্দে সে দৌড়ে এসে পিছন থেকে আমাকে গুলি করে। গুলিটা আরেকটু হলে আমার ফুসফুস ভেদ করে চলে যেত। ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই ছেলেটি পালাতে গিয়ে পরে ধরা পড়েছিল। যাত্রীদের কাছে তিনজনই সেদিন এমন পিটুনি খায়, দু'জনকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। পুলিশ পরে জানতে পারে, তিন ডাকাত বেলঘরিয়া অঞ্চলের। এদের বিরুদ্ধে আরও পাঁচ-ছ'টা কেস আছে।

হাসপাতালে ওই তিনদিন অনবরত লোক যাতায়াত করেছে। জীবনের এই সব মুহূর্তেই বোঝা যায়, কে আপন, কে পর। টিভি-তে আমার কথা জেনে পরদিন সকালে প্রথমেই দৌড়ে গিয়েছিল অমিয় আর আরতি। ওরা থাকতে থাকতেই হাজির হল শুভঙ্কর দত্ত, শুক্লাকে নিয়ে। আমাকে উঠে বসতে দেখে আরতি জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কেন জীবনটাকে নিয়ে বারবার খেলা করেন অর্কদা?" সেই সময় চোখে পড়েছিল, শুক্লা মাথা নিচু করে রেখেছে। আরতির ওই প্রশ্নটার কোনও উত্তর দিইনি। ও সাদামাটা মেয়ে। জানে না, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সহজাত একটা প্রবৃত্তি থাকে। সেটাই তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। নিবারণদার মধ্যেও পরার্থে হিত করার একটা প্রবৃত্তি ছিল। না হলে ওই ভদ্রমহিলাকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। আমিও আসলে সেদিন ইন্দ্রদাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। ডাকাতিটা হলে ইন্দ্রদার চাকরি জীবনে একটা বড় দাগ লেগে যেত।

আমি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরদিন, ভোরের ট্রেনেই ভৈরব কাকাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিলেন আমার বাবা। রাতের ট্রেনে আবার ফিরে যান। অমিয় আর আরতিকে বলে গেছেন, আমার জন্য মেয়ে-টেয়ে দেখতে। আষাঢ় মাসের মধ্যেই আমার বিয়েটা সেরে ফেলতে চান। বাবা ইচ্ছে করলে বুলুদির বাড়িতে দু'একটা দিন থেকে যেতে পারতেন। কিন্তু চেতলার বাড়িতে যানইনি। বাবা চাইছেন না, আমি আর ও বাড়িতে থাকি। এবার স্পষ্ট করে সে কথা বলেও গেলেন। সেই সময় হাসপাতালের কেবিনে বসেছিল ঝুলনও। ওর চোখটা ছলছল করে উঠেছিল।

হাসপাতালে এত লোক দেখতে গেল, অথচ বুলুদি সময়ই পায়নি একবার যাওয়ার। সত্যি বলতে কী, প্রথম দু'টো দিন দুঃখ হয়েছিল। পরে রাগ। ঝুলনের মুখে রোজই শুনতাম, বুলুদি বাড়িতে আছে। বাংলাদেশ যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। বুলুদি যে এত স্বার্থপর হতে পারে, ভাবতেও পারিনি। না, এ বাড়িতে থাকার আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর আজ যা ব্যবহার করে গেল, তাতে রাগটা ক্রমে ঘেন্নায় পরিণত হচ্ছে। ছিঃ, এই মহিলাটির জন্য কেন একটা সময় আমি এত বদনাম কুড়িয়েছি?

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঠিক করে নিলাম, একবার মনোময়বাবুর বাড়িতে যাব। যে করেই হোক, মাসিমাকে রাজি করাতেই হবে। তার আগে ঝুলনের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নেওয়া দরকার। আমি বাড়ি ছেড়ে গেলে, ও কী করবে সেটা ওর মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই। ঝুলনকে ছেড়ে থাকা, আমার পক্ষে সম্ভব না। ঘর যদি বাঁধতেই হয়, ওকে নিয়ে বাঁধব। তেমন হলে, ওকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে যাব। ভৈরব কাকাকে দিয়ে বিয়ের কথাটা তুলব বাবার কানে। মনে হয় না, বাবা আপত্তি করবেন।

আজ সকাল থেকেই পাত্তা নেই ঝুলনের। বুলুদি বাড়িতে থাকলে চট করে ও এখন

আমার ঘরে ঢোকে না। আমার থেকে সাংসারিক বুদ্ধিটা ওর অনেক বেশি। বাবা যেদিন হাসপাতালে এলেন, সেদিন দেখলাম আমার দিকে ওর কোনও নজরই নেই। সারাটা দিন বাবা আর ভৈরবকাকাকে নিয়েই ও পড়ে রইল। রেখার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে কাইজার স্ট্রিটের রেল কোয়ার্টারে। বাবাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো, খাওয়ানো, এমনকী দিবানিদ্রার ব্যবস্থা পর্যন্ত ও করেছিল। বিকেলে আমাকে দেখতে এসে বাবা এক ফাঁকে বলেওছিল, "দিবাকরের এই বোনটা যে এত কাজের, আগে তো কখনও লক্ষ করিনি রে অর্ক।" কথাটা শুনে আমার সেদিন খুব ভাল লেগেছিল।

সদর দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ। বোধহয় বুলুদির গাড়ি এসে গেল। এখন বেরিয়ে গেলে, ফিরবে অনেক রাত্তিরে। সারাটা দিন ঝুলনকে আজ কাছে পাওয়া যাবে। মাঝে পাঁচটা দিন ওকে আদর করা হয়নি। কাল রাতে ও যখন খাবার দিতে এল, তখন আমার ঘরে ষষ্ঠীপদবাবু বসে। দোকান বন্ধ করে উনি আমার খবর নিতে এসেছেন। ভাবলাম, পরে এঁটো বাসন নিতে ঝুলন ফের আসবে। কিন্তু আসেনি। সকালবেলায় গঙ্গার মা এসে বাসন তুলে নিয়ে গেল। ঘর ঝাঁট দিয়ে, জল দিয়ে মুছে অনেকক্ষণ আগে গঙ্গার মা চলে গেছে। এখন পর্যন্ত ঝুলন এই ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়নি।

"অর্ক, কেমন আছিস রে?"

ইন্দ্রদাকে দেখে আমি উঠে বসলাম। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। এই পোশাকে কখনও দেখিনি। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রদা লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, "এই পোশাকে খুব-একটা খারাপ লাগছে না, কী বল।"

ঠাট্টা করে বললাম, "একদম রাজেশ খান্নার মতো লাগছে।"

হা হা করে হেসে উঠলেন ইন্দ্রদা। তার পর বললেন, "মন্দ বলিসনি। বাঃ, এই তো দেখে মনে হচ্ছে, তুই সুস্থ হয়ে উঠছিস। শুনলাম, তুই বাড়ি ফিরে এসেছিস। তাই দেখতে এলাম।"

একগাদা ফল নিয়ে এসেছেন ইন্দ্রদা। টেবিলের উপর রাখলেন। সোফায় বসে বললেন, "কাল রাতে পুলিশ এসেছিল আমার বাড়িতে। একটু বোকার মতো একটা কথা বলে ফেলেছি। সে প্রসঙ্গে তোকেও জিজ্ঞেস করতে পারে পুলিশ। ঠিক ঠিক জবাব দিস।"

বললাম, "কী কথা ইন্দ্রদা?"

"আরে, আমি কথায় কথায় বলে ফেলেছি, ডাকাতরা ঠিক টাইমেই এসেছিল। ওরা বোধহয় জানত, ডিউটি বদলের সময় কাউন্টার থেকে টাকা আমার ঘরে আনা হয়। ব্যস, এই পয়েন্টে পুলিশ ধরল আমাকে। বলুন, আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কি না? সন্দেহ করতে হলে তো, আমাদের মধ্যে এক সুজয়কেই করতে হয়। কেননা ওর এখন টাকার দরকার। কিন্তু একজন কলিগের নামে এই কথাটা কী করে বলি বল তো?"

বললাম, "আপনি ঠিক বলছেন ইন্দ্রদা। সেদিন ঘটনাটা ঘটার আগে সুজয়দা ডিউটি না থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত এসেছিল। তারপর কোথায় গেল, দেখতে পেলাম না।"

"সুজয় যদি এ কাজ লোক লাগিয়ে করে থাকে, তা হলে ধরা একদিন পড়বেই। পুলিশ ঠিক বের করে ফেলবে আসল কালপ্রিটকে।"

"পুরো ব্যাপারটা এখন ভাবলে দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে।"

pathagar.net

"দুঃস্বপ্ন বলছিস কেন? পাতাল রেলে আমাদের কী সিকিউরিটি আছে, তুই বল। ডাকাতিটা তো আমি বলব সামান্য ব্যাপার। একদিন দেখবি, বিরাট ব্লাস্ট হয়ে যাবে। একটা করে মেটাল ডিটেকটর বসিয়েছে। কিন্তু কেউ যদি আর্মস নিয়ে ঢোকে, তাকে তল্লাশি করার মতো কেউ নেই। কারগিলের যুদ্ধ চলে গেল। ব্যস, মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে এখন কারও মাথা ব্যথা নেই।"

"চা খাবেন ইন্দ্রদা?"

"না রে, সময় নেই।" হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে ইন্দ্রদা বললেন, "হ্যাঁ, যে কারণে তোর কাছে এলাম, দ্যাখ সেটাই ভুলে মেরে দিয়েছি। রেল মিনিস্ট্রি থেকে তোর একটা ছবি আর বায়োডাটা চেয়ে পাঠিয়েছে। কাল মেট্রো ভবন থেকে ফোন এসেছিল। দু'একদিনের মধ্যে আমাকে পাঠাতে হবে। পাশপোর্ট সাইজের কোনও ছবি কি তোর তোলা আছে? তা হলে এখুনি আমাকে দিয়ে দে। বাকিটা আমি নিজে লিখে পাঠিয়ে দেব।"

"ছবিটা কেন চাইছে ইন্দ্রদা?"

"রেলমন্ত্রী তোকে পুরস্কার দেবেন। দিল্লিতে রেলভবনে ফাংশান করে। এ বছর থেকে চালু হল এই পুরস্কারটা। প্রতি রেল থেকে একজন করে পাবে। তুই শিগগির চিঠি পেয়ে যাবি।"

খবরটা শুনে আমার এত আনন্দ হল, বিছানা থেকে নেমে আমি ইন্দ্রদাকে প্রণাম করে ফেললাম। ড্রয়ারে আমার তিনটে ছবি আছে। তার একটা বের করে ইন্দ্রদাকে দিয়ে বললাম, "সীতাংশুরা এ খবরটা জানে?"

"না। এখনও বলিনি। সরকারিভাবে রেল মিনিস্ট্রি থেকে যতক্ষণ না নামগুলো জানাবে, ততক্ষণ কাউকে বলা উচিত না। চলি রে।"

pathagar.net

ইন্দ্রদার সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হাঁটা চলায় আমার কোনও অসুবিধে নেই। তবুও ডাক্তার বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছেন। কাল থেকে শুয়ে আছি। কতক্ষণ ভাল লাগে? ইন্দ্রদাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় উপর থেকে নেমে এসে ঝুলন বলল, "এ কী, তুমি বাইরে বেরিয়েছ? তুমি কি আমার কোনও কথা শুনবে না?"

দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, "তোর কোন কথাটা শুনিনি বল।"

"এই যে উঠে এসেছ। আমি তোমার জন্য চিন্তায় মরে যাচ্ছি, তোমার তো কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। দাঁড়াও, এবার যেই আসুক, দরজা আমি খুলবই না।"

"কে এসেছিল জানিস? আমাদের বস, ইন্দ্রদা।"

"যে-ই আসুক, লোকটার চাউনি কিন্তু ভাল না। যাও, চুপ করে শুয়ে থাকবে। আমি এখুনি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।"

"হ্যাঁরে, বুলুদি নেই?"

"না। বাংলাদেশ হাই কমিশনে গেছে। ভিসা নিয়ে কথা বলতে।"

আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। সদর দরজায় ছিটকিনি লাগাতে যাব, এমন সময় দেখি বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামছে দিবাকরদা। চুল উস্কো-খুস্কো। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। দরজা খুলে নেমেই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিবাকরদা বলল, "আপনি একটু দাঁড়ান। আমি এখুনি ফিরে আসছি।"

দরজার মুখে আমাকে দেখতে পেয়েই দিবাকরদা বলল, "অর্ক, তুই আছিস কেমন?

তোর খবরটা ওইদিন শুনেছিলাম। কিন্তু আসতে ইচ্ছে হয়নি।"

"বাঙ্গালোর থেকে কবে ফিরলে দিবাকরদা?"

"আমি তো বাঙ্গালোর যাইনি। এতদিন দীপুর বাড়িতে ছিলাম। তুই একবার ওপরে আয় তো। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝুলন। আমাকে ইশারা করল উপরে যেতে। দিবাকরদার পিছু পিছু আমি দোতলায় উঠে এলাম। এত গম্ভীর, লোকটাকে কখনও দেখিনি। শোয়ার ঘরে ঢুকে দিবাকরদা বলল, "কাল রাতে সুখবিন্দর এখানে ছিল, না রে?"

বললাম, "জানি না।"

একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দিবাকরদা বলল, "এখন আর লুকোচুরির কিছু নেই রে অর্ক। সারা পাড়া জেনে গেছে, আমার বউ আসলে একটা বেশ্যা।"

মেঝেতে বুলুদির ব্রা আর সায়া পড়েছিল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাড়াহুড়োর মাথায় হয়তো ওয়ারড্রোবে ঢুকিয়ে রাখতে ভুলে গেছে। সেদিকে চোখ পড়তেই দিবাকরদা লাথি মারল। সায়াটা ডিভানের কোণে গিয়ে পড়ল। ব্রা ড্রেসিং টেবলে। কেমন যেন ক্রুদ্ধ গলায় দিবাকরদা বলল, "আমারই দোষ, বুঝলি। দোষটা আমার। এত ভালবেসেছিলাম, তোর বুলুদির কোনও ইচ্ছেতেই আমি কোনও দিন বাধা দিইনি। না, আর না। এবার এমন একটা শিক্ষা ওকে দেব, সারা জীবন ধরে জ্বলবে।"

কথা বলতে বলতেই ড্রেসিং টেবলের পাল্লা টেনে দিবাকরদা একটা হুইস্কির বোতল বের করল। তার পর ছিপি খুলে গলায় হুইস্কি ঢেলে চোখ বন্ধ করে পাখার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দিবাকরদার এই রূপ আগে কখনও দেখিনি। খ্যাপা মোষের মতো লাগছে। কী একটা বলবে বলে আমাকে ডেকে নিয়ে এল, অথচ কোনও উচ্চবাচ্যই করছে না। ওর রাগ দেখে অবশ্য আমার ভাল লাগছে। এই ক্রোধটার সামনে পড়লে বুলুদি আজ জ্বলে পুড়ে যেত। হঠাৎ চোখ খুলে দিবাকরদা বলল, "অর্ক, তোকে একটা কথা বলার ছিল। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

ঘরে বোমা পড়লেও আমি এত অবাক হতাম না। বলে ফেললাম, "কোথায় যাচ্ছ?"

"সেটা জানার দরকার নেই। ভাল একটা চাকরি পেয়ে গেছি। তোর বুলুদি জানে না। আর কাউকে কিছু বলিনি। এখানে থাকলে যে কোনওদিন আমি মার্ডার হয়ে যাব রে।"

"মার্ডার হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ, দীপু... দীপঙ্কর তোকে কিছু বলেনি? এত অবাক হচ্ছিস কেন? এ জগতে সবই সম্ভব রে অর্ক।"

বাড়ি দখল নিয়ে একটা কথা সেদিন অবশ্য আমাকে বলেছিলেন দীপঙ্করদা। তখন আমি পাত্তা দিইনি। দিবাকরদাও তা হলে একই ভয় পাচ্ছে? বললাম, "কবে যাচ্ছ তুমি?"

"আজ বিকেলের ট্রেনেই। কিছু কাগজপত্তর নেওয়ার ছিল, তাই এসেছি। একটু আগে ফোন করেছিলাম ঝুলনকে। ও বলল, বুলু নেই। ভাবলাম, এই সুযোগে দরকারি জিনিসগুলো সব নিয়ে যাই। তোদের দু'জনের সঙ্গে জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না ভাই।"

বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বললাম, "কাজটা কী ঠিক হচ্ছে দিবাকরদা? আর একবার অন্তত ভেবে দেখো।"

"ভাবাভাবির আর কিছু নেই।" গলায় হুইস্কি ঢেলে দিবাকরদা বলল, "অনেকদিন ধরে

ভেবেছি। তোর বুলুদির খিদে মেটাতে গিয়ে আমি শেষ হয়ে গেছি। বাজারে ঘাড়ে তিন লাখ টাকা দেনা। এই বাড়িটা পুরোপুরি লিখে দিলাম দীপুকে। টাকাটা ও আমায় দিয়ে দিয়েছে। ধার-দেনা সব শোধ। এবার আমার কোনও দায় নেই। আর কয়েকদিনের মধ্যেই দীপু এ বাড়ির দখল নিতে আসবে। লাথি মেরে তোর বুলুদিকে তাড়াবে।"

"আর ঝুলন? ওর কী হবে দিবাকরদা?"

"জানি না রে। দীপঙ্কর ওকে রাখবে না। কোনও দিন তোর বুলুদির পক্ষ নিয়ে দীপুকে বোধহয় কিছু বলে-টলে ছিল। সেই রাগে। ও তখন দিদিভাই বলতে এমন অজ্ঞান, আমার কাছেই আসত না। অমন ফুলের মতো মেয়েটার সর্বনাশ করে দিল বুলু। কলেজে উঠল, আর পড়ালই না। কী, না বাড়ির কাজ করুক। পড়িয়ে আর লাভ নেই। নিজে একটা প্রসটিটিউট। দেখবি, ঝুলনটাকেও কোনও দিন লাইনে নামিয়ে দেবে।"

ফের গলায় হুইস্কি ঢালল দিবাকরদা। এ বাড়িতে যে এমন একটা দিন আসবে, তা জানতাম। এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবতেও পারিনি। বললাম, "তুমি কি জানো, প্রতাপাদিত্য রোডে দিদিভাই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে?"

"জানি। সব খবরই আমি রাখি। কিন্তু ওখানে ও থাকতে পারবে না। আশপাশের লোকজন ইতিমধ্যেই আপত্তি তুলেছে। ওদের কাছেও উড়ো খবর গেছে। কাল-পরশুর মধ্যেই বুলু টের পেয়ে যাবে।"

হুইস্কির খালি বোতলটা ডিভানে ছুড়ে ফেলল দিবাকরদা। তারপর আলমারির ড্রয়ার খুলে জামা-কাপড় বের করতে লাগল। নীচ থেকে হর্ন দিচ্ছে ট্যাক্সি ড্রাইভার। সেই শব্দ শুনে, ব্যস্ত হয়ে ডিভানের তলা থেকে একটা সুটকেস বের করে এনে দিবাকরদা জামা-কাপড় গোছাতে লাগল। লোকটাকে আটকানো যাবে না। তবুও শেষ চেষ্টা করার জন্য বললাম, "এটা কিন্তু ঠিক করছ না। বুলুদিকে না জানিয়ে চলে যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না।"

"কেন জানাতে যাব, বল তুই?" দিবাকরদা রাগী চোখে বলল, "স্বামীর মর্যাদা কি ও আমাকে দিয়েছে? এমন কোনও স্ত্রীর কথা কি কখনও তুই শুনেছিস, যে বিবাহবার্ষিকীর দিন ভোর পাঁচটায় স্বামীর বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে হোটেলে পরপুরুষের বিছানায় শুয়ে পড়তে পারে? তোর বুলুদি পারে। জানিস, বিয়ের পর আমি উড়ো চিঠি পেতাম। বেহালায় ও কার কার সঙ্গে শুয়েছে, তার বিবরণ থাকত সেই চিঠিতে। পড়েই সে সব ছিঁড়ে ফেলতাম। পরে দেখলাম, সব সত্যি। আমাকে হিজড়ে বানিয়ে রেখেছিল। নিজের উপর বিশ্বাসটাই আমার চলে গেছিল। সুযোগ পেয়েছি। নিজের রাস্তা খুঁজে নিচ্ছি।"

দিবাকরদা যা বলছে, সব সত্যি। আমার থেকে তা আর কে বেশি জানে? তবুও বললাম, "বুলুদি যদি জিজ্ঞেস করে, কী বলব?"

"তুই কিচ্ছু জানিস না। পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না অর্ক, বুঝলি। এই সুখবিন্দরই ওকে এক দিন এমন বিপদে ফেলবে, তখন কেঁদে কূল পাবে না। ওই লোকটাকে তো আমিই এ বাড়িতে এনেছি। জানি, কী ডেঞ্জারাস টাইপের। যে দিন বুলুর প্রয়োজন ফুরোবে, লাথি মেরে ওকে ফেলে দিয়ে সুখি আরেক বুলুকে নিয়ে আসবে। দেখে নিস। পালিয়ে যা, এ বাড়ি ছেড়ে যত শিগগির সম্ভব, চলে যা।"

সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল দিবাকরদা। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ঝুলন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমাদের সব কথা নিশ্চয়ই ওর কানে গেছে। নীচে নামার সময় ওর

কাছে একবার থমকে দাঁড়াল দিবাকরদা। তারপর বাঁকে এক ধাপ নেমে বলল, "সাবধানে থাকিস বোন। সুখবিন্দর লোকটা ভাল না।"

ঝুলন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ দাদাভাই?"

"জানি না।"

মাথা নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল দিবাকরদা। সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করে নিলাম। হাতে আর এক সেকেন্ডও সময় নেই। কথাটা এখনই বলে নেওয়া দরকার। দৌড়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে নেমে আমি পিছু ডাকলাম, "দিবাকরদা, শোনো। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে!"

সদর দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল দিবাকরদা। ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কী বলার আছে, তাড়াতাড়ি বল।"

বাঁ হাতটা দিয়ে, ঝুলনের ডান হাত ধরে, ওকে সঙ্গে নিয়েই আমি উঠোনে নেমে এলাম। তারপর দিবাকরদার চোখে চোখ রেখে বললাম, "ঝুলনকে আমি বিয়ে করতে চাই। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করে যাও।"

১৫

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন মনোময়বাবুর স্ত্রী। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "অর্ক, তুমি? এসো, ভেতরে এসো।"

"মনোময়বাবু নেই?"

"না। কসবার দিকে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন।"

"আপনি কি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মাসিমা? তা হলে থাক। আমি না হয় সন্ধের দিকে একবার আসব।"

"তা হয় নাকি বাবা। এসো, এসো। ইস, খুব ঘেমে গেছ। ভরদুপুরে কেউ দোরগোড়া থেকে ফিরে যায়?"

এমন আন্তরিকভাবে মাসিমা কথাগুলো বললেন, আমি আর না করতে পারলাম না। ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। এর আগে দু'তিনবার মনোময়বাবুর বাড়িতে এসেছি। প্রথম পরিচয়ের দিন, অসুস্থ মাসিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। ফুল স্পিডে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে মাসিমা বললেন, "আগে চুপটি করে বোসো কিছুক্ষণ। তারপর কথা বলা যাবে।"

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন মাসিমা। ঘর ভাড়া নেওয়ার কথা আজ বলতে এসেছি। মাসিমাই এখন আমার ভরসা। উনি যদি না বলে দেন, তা হলে আমি গেছি। গুলি লাগার সাতদিন পর এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ঝুলন একা আসতে দিতে চাইছিল না। ওর ধারণা, ডাকাত দলের অন্যরা এখন দেখতে পেলেই আমার উপর বদলা নেবে। ওকে অনেক আদর-টাদর করে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছি। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। না গেলে ঝুলন আর আমার মুখদর্শন করবে না।

ভেতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন মাসিমা। ফের কাজের লোক রেখেছেন নাকি? হতে পারে। ড্রয়িংরুমের চার পাশে আমি চোখ বোলাতে লাগলাম। খুব সুন্দর সাজানো। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত টানা সোফা। দেখেই

pathagar.net

মনে হল, ড্রয়িং রুমে আগে মাঝে মাঝেই পার্টি হত। দেওয়ালে বড় একটা ছবি ঝুলছে। মাসিমা আর মনোময়বাবু সুন্দর একটা বাড়ির লনে দাঁড়িয়ে আছেন। উল্টোদিকের দেওয়াল জুড়ে কাচের শোকেস। বিদেশি স্মারকে ভর্তি।

পর্দা সরিয়ে ফের ড্রয়িংরুমে এলেন মাসিমা। সোফায় বসে বললেন, "তোমার মেসোমশাই কোথাও এক দণ্ড বসে থাকতে পারেন না। এই দেখো না, চণ্ডীতলায় একটা স্কুল করার কথা ভাবছে। আজ ক'দিন ধরেই সে ব্যাপারে খুব ব্যস্ত।"

বললাম, "হ্যাঁ, সেদিন স্কুলটার কথা আমাকে বলছিলেন।" কথাটা বলতে বলতেই দেখলাম, পর্দা সরিয়ে ঢুকছে জুঁই। হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটে গ্লাসে সরবত। মুখ ছিটকে বেরিয়ে গেল, "আরে, আপনি?"

জুঁই হেসে বলল, "গলাটা শুনেই চেনা চেনা লাগছিল। কাকিমণির মুখে আপনার নামটা শুনে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। বাব্বাঃ, এ'কদিন আপনার খোঁজে রোজ একবার করে স্টেশনে গেছি। কেমন আছেন, তা জানতে। আপনার অফিসের ছেলেগুলো কী বলুন তো? কেউ বাড়ির ঠিকানাটা দিল না। পেলে নিজে গিয়ে দেখে আসতাম।"

মাসিমা অবাক হয়ে বললেন, "জুঁই, তুই অর্ককে চিনলি কী করে?"

মুখ টিপে হেসে জুঁই বলল, "সে অনেক ঘটনা কাকিমণি। অত জানতে চেও না। তোমাদের সঙ্গে কী করে চেনা হল, আগে বলো তো?"

মাসিমা বললেন, "আরে, একদিন তোর সোনা মাসির বাড়ি থেকে ফেরার সময় কালীঘাট স্টেশনে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অর্ক এসে পাশে না দাঁড়ালে..."

জুঁই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কত লোকের মুশকিল আসান বলুন তো।"

আমি হেসে বললাম, "থাক ও সব কথা। আপনি আমাকে খুঁজছিলেন কেন, বলুন।"

সরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে জুঁই বলল, "পরে বলছি। সরবতটা খেয়ে আগে বলুন তো, কিসের তৈরি? কাকিমণির কাছে আজই শিখলাম। কেমন হল, কে জানে?"

সরবতে চুমুক দিয়েই বুঝলাম, তরমুজের। কথাটা বলতেই খিলখিল করে হেসে উঠল জুঁই। তারপর নিজেকে সামলে বলল, "সবাই এই ভুলটা করে। আসলে এটা কাঁচা আমের সরবত। কাকামণি যখন আলজিরিয়ায় ছিল, তখন ওখানকার লোকেদের কাছ থেকে কাকিমণি শিখে রেখেছে।"

বললাম, "খেতে কিন্তু দারুণ লাগছে মাসিমা।"

হাসতে হাসতে মাসিমা বললেন, "একজন আবার কী বলেছিল জানো? লিচুর সরবত। বোকা, তখন সেপ্টেম্বর মাসে লিচু কোথায়?"

জুঁই বলল, "জানেন অর্কদা, কাকিমণি এমন একধরনের সরবত করতে পারে, খেলেই আপনার ঘুম পেয়ে যাবে। আমি বলি কী, তোমার বাড়িতে সন্দেহজনক কেউ যদি আসে, আগে তাকে এই সরবতটা করে খাইয়ে দিও।"

হঠাৎ মাসিমা বললেন, "অর্ক, বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা কি মেসোমশাইকে সেদিন তুমি বলেছিলে? কে নেবে?"

সরাসরি বলে দেওয়াই ভাল। সেজন্য বললাম, "আমি।"

মাসিমা বললেন, "তুমি? এখন যেখানে থাকো, সেখানে তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে বাবা?"

"বাড়িটা অন্য একজন কিনে নিচ্ছেন। তিনি চান না, আমরা কেউ থাকি। তা ছাড়া বাবা

খুব চাপ দিচ্ছেন বিয়ের জন্য। এখনই একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। যত শিগগির সম্ভব।"

মাসিমা কয়েক সেকেন্ড কী ভেবে বললেন, "তোমাকে ভাড়া দিতে তো আমার আপত্তি নেই বাবা। তিনতলায় দু'টো ঘর পড়ে আছে। ওখানে তুমি থাকতে পারো। কিন্তু গরমের দিনে তোমার খুব অসুবিধে হবে।"

বললাম, "এসব অসুবিধের কথা ভাবলে আমার চলবে না মাসিমা।"

"একটা কথা। আমার শরীরের অবস্থা তো তুমি জানো। রাত-বিরেতে কখনও যদি তোমাকে ডাকি, তুমি বিরক্ত হবে না তো বাবা?"

"কী বলছেন আপনি? আমাকে দেখে কি আপনার সে রকম ছেলে মনে হয়?"

প্রসঙ্গ পাল্টে মাসিমা বললেন, "ঘর দুটো কি তুমি এখন দেখে নেবে? তা হলে জুঁই তোমাকে দেখিয়ে আনবে।"

"হ্যাঁ, দেখে নিতে পারি।"

জুঁই উঠে দাঁড়াতে, আমিও ওর পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। তিন তলায় পৌঁছতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "বাহ।" সিঁড়ির দু'পাশে দু'টো বড় ঘর। সামনে বেশ বড় একটা ছাদ। টবে প্রচুর বাহারি গাছ। ডান পাশে একটা দোলনা ঝোলানো আছে। কার্নিশের কাছে দাঁড়াতেই দেখলাম, দূরে দেশপ্রিয় পার্ক দেখা যাচ্ছে। সেখানে সবুজের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

জুঁই বাচ্চা মেয়ের মতো দোলনায় চেপে বসেছে। আমাকে বলল, "আপনি ঘুরে ঘুরে সব দেখে নিন। আমি একটু দোলনা চেপে নিই। অনেকদিন ছাদে আসা হয়নি।"

অপছন্দের কিছু হয়নি। আমি এখন চেতলার ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। ভাল করে দেখে বললাম, "একটাই সমস্যা। রান্না করার জায়গা নেই।"

"আছে। ডান দিকের ঘরটার ভেতরে একটা বাথরুম আর ছোট্ট কিচেন আছে। ছোটবেলায় এই ছাদের ঘরেই থাকত টুবলুদা। কাকামণি ওর জন্য সব আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।"

"টুবলুদা কে জুঁই?"

"কাকামণির একমাত্র ছেলে। বোস্টনে থাকে।"

ছেলেটার কথা মনোময়বাবুর মুখে শুনেছি। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, "আমার দেখা হয়ে গেছে। চলো, নীচে চলো।"

জুঁই আবদার করার ভঙ্গিতে বলল, "দাঁড়ান না বাবা। আপনার মধ্যে অনেক গুণ আছে, কিন্তু রোমান্টিসিজমের খুব অভাব।"

"ছোটবেলাটা যার কষ্টে কেটেছে, রোমান্টিক হওয়া তাকে মানায় না।"

"ভুল বললেন কিন্তু অর্কদা। আপনার সম্পর্কে আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়েছি। আপনার সম্পর্কে একটা ধারণাও আমার হয়েছে। আপনার মধ্যে যা সম্ভাবনা ছিল, তার ওয়ান টেন্থও আপনি ফুলফিল করতে পারলেন না।"

অবাক হয়ে বললাম, "তুমি কার কাছে আমার কথা শুনেছ?"

"দীপ্তিময়। আপনার সঙ্গে সেন্ট টমাসে পড়ত। ও আপনার খবর রাখে। চণ্ডীতলায় কাকামণি যে স্কুলটা করছে, তার পুরো প্ল্যানটা ও করে দিচ্ছে।"

কে দীপ্তিময়, আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। আমার স্মৃতিশক্তি সাধারণত আমার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কিন্তু এই ছেলেটাকে তো ঠিক মনে করতে পারছি না। অমিয়র সঙ্গে দেখা হলে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। জুঁইকে বললাম, "দীপ্তিময় কী বলেছে আমার সম্পর্কে?"

"বলব কেন? নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, খারাপ কিছু বলেনি। বরং আমার শ্রদ্ধাই বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা তো একটা সময় আপনার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। আপনি উৎসাহ দেখালেন না। বেচারা জার্মানিতে চলে যাচ্ছে, কী একটা স্কলারশিপ নিয়ে।"

প্রিয়াঙ্কার কথা শোনার কোনও আগ্রহ আমার নেই। বললাম, "জুঁই, চলো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

দোলনায় দোল খাওয়া বন্ধ করে জুঁই বলল, "আরেকবার বলুন।"

"নীচে চলো। আমার বাড়ি ফিরতে হবে।"

"ব্যস, আর কিন্তু আপনি-আজ্ঞে করবেন না।"

"বেশ। তাই হবে।"

নীচে নামতে নামতে জুঁই বলল, "ঘর তো ঠিক করলেন। ঘরনীর কী হবে?"

"সেটাও মনে হচ্ছে, জুটে যাবে।"

"আচ্ছা, ঘরনীসহ যদি কোনও ঘর মেলে, আপনি কি তাতে রাজি?"

"পৃথিবীতে ঘরজামাইয়ের কনসেপ্ট এখনও আছে নাকি?"

"আছে। প্রিয়াঙ্কা। একমাত্র মেয়ে। বাবার সব কিছু ও পাবে।"

হেসে বললাম, "তোমার বন্ধুপ্রীতির তুলনা নেই জুঁই। এ রকম একটা বন্ধু যদি পেতাম, তা হলে আমি মাথায় করে রাখতাম।"

'আমি কিন্তু বন্ধু হতে রাজি।"

কথাটার কোনও উত্তর দিলাম না। ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকতেই মাসিমা বললেন, "ফ্ল্যাট পছন্দ হল অর্ক?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, "আজ আর বসব না মাসিমা। চলি। রবিবার ফের আসব। টাকা পয়সার কথা তখন হবে।"

বলেই আমি বেরিয়ে এলাম। লেক গার্ডেন্সে একবার যাওয়া দরকার। ডাক্তার প্রধানের কাছে। কাল রাতে ডান হাতটা টনটন করছিল। কথাটা ডাক্তারবাবুকে বলা উচিত। একটা ট্যাক্সি নিয়ে লেক গার্ডেন্সে এসে দেখি, চেম্বার বন্ধ। ডাক্তার প্রধান বাড়িতে গেছেন। অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। তাই হাঁটতে হাঁটতে লর্ডস বেকারির মুখে এলাম। এক ঘণ্টা সময় নিয়ে এসেছি। এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঝুলন নিশ্চয়ই এতক্ষণে উপর-নীচ শুরু করেছে। আস্ত পাগল। আমাদের মতো লোককে এত ভালবাসলে চলে? একেক সময় ওর মুখ এমন ভার হয়ে যায়, তখন ওকে সামলাতে গিয়ে আমি মুশকিলে পড়ি।

ট্যাক্সির জন্য লর্ডস বেকারির মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। দুপুরের এই সময়টায় ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ট্যাক্সি আনোয়ার শাহ রোডের দিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরছে। ভেতরে এক ভদ্রমহিলা বসে। মুখটা চেনা মনে হল। মিতা বউদি না? ভাল করে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ সুজয়দার স্ত্রী। ট্যাক্সিটা একটুখানি এগিয়েই একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে, ভর দুপুরে মিতা বউদি এখানে? রাস্তা পেরনোর ফাঁকে দেখলাম, মিতা বউদি ভাড়া দিতে চাইছে। ড্রাইভার নিচ্ছে না। হাতজোড় করে কী যেন বলছে। আমি ট্যাক্সির কাছে পৌঁছনোর আগেই বউদি বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

pathagar.net

ইন্দ্রদা একবার দেখে আসতে বলেছিল। সেদিন যেতে পারিনি। আজ সুযোগটা নষ্ট করা উচিত নয় ভেবে কলিং বেল টিপলাম। দরজা খুলে আমাকে দেখে চমকে উঠে মিতা বউদি বলল, "অর্ক, তুমি?"

বললাম, "এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ট্যাক্সি থেকে তোমাকে নামতে দেখলাম। কেমন আছ এখন?"

"ভাল না। হাসপাতালে গেছিলাম। কেমো করতে। এই ফিরছি।"

"সুজয়দা সঙ্গে যায়নি?"

"না। তোমার সুজয়দা আজকাল আমার খোঁজ খবরও রাখে না।"

"সে কী! তোমার ট্রিটমেন্ট?"

"আমার বোন যতটা পারছে, করছে। এটা আমার বাপের বাড়ি। এসো, ভেতরে এসো।"

ঘরের ভেতরে ঢুকেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। মিতা বউদি সোফায় বসে পড়েছে। চোখ বুজে মাথা হেলান দিয়ে রয়েছে। চোখ মুখ ফ্যাকাশে। সিঁথির কাছটায় চুল উঠে গেছে। এত সুন্দর দেখতে ছিল মিতা বউদি। পিকনিকের সময় যখন সেজেগুজে যেত, তখন আমরা মুখ ফেরাতে পারতাম না। এমন চমৎকার বাঁধন ছিল শরীরের। এখন কেমন যেন শীর্ণ হয়ে গেছে। মিতা বউদির এই অবস্থা দেখে রাগই হতে লাগল সুজয়দার উপর। আমাদের কাছ থেকে এত টাকা নিয়ে গেল, অথচ বউদির ট্রিটমেন্ট করছে না? কী করছে তা হলে ওই টাকা নিয়ে। ইন্দ্রদার কাছে গিয়ে আজই সব কথা বলতে হবে। সুজয়দাকে আর একটা পয়সাও আমরা কেউ দেব না।

হঠাৎ চোখ খুলতেই মিতা বউদিকে জিজ্ঞেস করলাম, "সুজয়দা, তোমার সঙ্গে এ রকম করছে কেন বউদি?"

"জানি না। বিয়ের পর থেকেই ও আমার বাপের বাড়ির লোকদের পছন্দ করত না।" শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বউদি ফের বলল, "তখন থেকেই ওর সন্দেহবাতিক। রোজ জেদাজেদি। একটা সময় আমিও বেঁকে বসলাম। ও যেটা পছন্দ করত না, ইচ্ছে করে সেটা করতাম। যাক সে সব কথা। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব। ও অন্তত সুখে থাক।"

"দিদি কখন এলি?" বলতে বলতে এক ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, "আপনি?"

দেখেই বুঝলাম, মিতা বউদির বোন। দিদির গলা শুনে বেরিয়ে এসেছেন। হাত জোড় করে বললাম, "নমস্কার। আমি অর্ক। সুজয়দার কলিগ।"

"ও।" পরিচয়টা জেনেই যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন ভদ্রমহিলা। আমাকে উপেক্ষা করে মিতা বউদিকে বললেন, "চল, বিশ্রাম নিবি। একা একা পি জি হসপিটাল থেকে...এলি কিসে দিদি?"

"ট্যাক্সিতে।"

মিতা বউদিকে ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। স্পষ্ট মনে হল, আমার সঙ্গে কথা বলতে দিতে চান না। কয়েক মিনিট বসে থেকে, চলে আসব কি না ভাবছি, এমন সময় ঘরে ঢুকে ভদ্রমহিলা রুক্ষস্বরে বললেন, "আপনাকে কি সুজয়দা পাঠিয়েছে? প্লিজ, তা হলে আপনি চলে যান। ওকে বলে দেবেন, দিদিকে যেন আর বিরক্ত না করে। মাস খানেক আগে, মদ খেয়ে এসে এ পাড়ায় একদিন ছোটলোকমি করে গেছে। এবার এলে, পাড়ার

pathagar.net

ছেলেরা বলেছে, প্রচণ্ড পেটাবে।"

বললাম, "আপনি ভুল করছেন। সুজয়দা আমাকে পাঠায়নি। মিতা বউদির ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা চাঁদা তুলেছি। সেই কারণেই ইন্দ্রদা আমাকে পাঠিয়েছেন।"

ইন্দ্রদার নামটা শুনে মনে হল, ভদ্রমহিলা যেন একটু নরম হলেন। তারপর বললেন, "কী করে বিশ্বাস করব, বলুন। দিদিকে যে আমরা নিয়ে এসেছি, তা সুজয়দার পছন্দ হয়নি। প্রথম দিকে ফোনে গালাগাল করত। তারপরে এসে ওই মাতলামি করে গেল। যে লোকটা একজন ক্যান্সার পেশেন্টের গায়ে হাত তুলতে পারে, তার ভরসায় দিদিকে ফেলে রেখে আসা যায়? এমন পাষণ্ড পৃথিবীতে আছে; বলুন?"

"এখানে না এলে তো আমি কিছুই জানতে পারতাম না?"

"আমার হাজবেন্ড পুলিশে যেতে বলেছিল। কিন্তু আপনাদের ইন্দ্রবাবুই ওকে মানা করলেন। বিশ্বাস করুন, সুজয়দার ওপর আমাদের এত রাগ, যেখানেই দেখা হোক, এ বার জুতো খুলে মারব। দিদির জীবনটাকে নষ্ট করে দিল। দিদি কী ছিল, আর কী হয়ে গেছে। তাকালেই কান্না পেয়ে যায়।"

বলতে বলতেই ভদ্রমহিলা কান্না সামলালেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "চলি। আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম। সুজয়দা যেন জানতে না পারে, আমি এসেছিলাম।"

চোখ মুছে ভদ্রমহিলা বললেন, "সরি। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। কিছু মনে করবেন না। দিদির অবস্থা তো দেখলেন। গিয়ে ইন্দ্রবাবুকে সব বলবেন।"

পা চালিয়ে লর্ডস বেকারির মোড়ে এলাম। আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেছে। মিতা বউদির সঙ্গে দেখা না হলে অনেক আগেই বাড়ি পৌঁছে যেতাম। রোদের তেজ যেন আরও বেড়ে গেছে। মোড়ে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে উঠে পড়লাম। মনোময়বাবুর বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মনটা হালকা হয়ে গেছিল। মিতা বউদিকে দেখার পর কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

"দাদা, একটা কথা বলব?" ট্যাক্সি চালাতে চালাতে হঠাৎ ড্রাইভার আমাকে বলল।

"বলুন।"

"এই একটু আগে আমি ক্যান্সার পেশেন্ট যে ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দিয়ে এলাম, যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন...তিনি কে হন আপনার?"

ও, মিতা বউদি তা হলে এই ট্যাক্সিতেই ফিরেছে। ড্রাইভারকে আগে লক্ষ করিনি। বললাম, "আমার কেউ হন না। উনি আমার এক অফিস কলিগের স্ত্রী।"

"আপনার কলিগ মানুষ, না জানোয়ার?"

চমকে উঠে বললাম, "কেন বলুন তো?"

"আরে মশাই, পি জি-র পাশ দিয়ে আমি ধর্মতলার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, হাসপাতালের বাইরে ফুটপাতে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। হাত তুলে ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ থামছেই না। দূর থেকে দেখেই মনে হল, উনি অসুস্থ। গাড়ি থামালাম। উনি বললেন, আমি ক্যান্সার পেশেন্ট। লেক গার্ডেন্সে যাব। একটু পৌঁছে দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলাম। সেই সময় ভদ্রমহিলার মুখটা যদি দেখতেন...। সারা রাস্তায় উনি যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। একজন ক্যান্সার পেশেন্টকে কেউ এভাবে একা ছেড়ে দেয়? আপনি বলুন?"

"তাই আপনি ভাড়া নিলেন না?"

"কী করে নিই বলুন? আমরা তো মানুষ। ট্যাক্সিটা আমার। বাড়িতে পাঁচ টাকা কম নিয়ে গেলেও কেউ বলার নেই। না হয় জীবনে একটা ভাল কাজই করে গেলাম। জানেন, স্ট্যান্ডে চুপচাপ বসে ছিলাম। চারজন প্যাসেঞ্জারকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বসে বসে ভাবছিলাম, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বই যদি না থাকে, তা হলে আর রইলটা কী?"

এই কথাটাই বোঝাবে কে সুজয়দাকে? চুপ করে রইলাম।

বাড়িতে পৌঁছলাম সওয়া তিনটে নাগাদ। দরজা খুলে আমাকে দেখেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ঝুলন। ছয় মাস আগে হলে বুঝতাম না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে যেতাম। ইদানীং ঝুলনকে দেখে নারী চরিত্রের খুঁটিনাটি শিখছি। আমার দেরি দেখে উদ্বেগ থেকে রাগ, আমাকে দেখার পর রাগ থেকে অভিমান, শেষপর্যন্ত কান্না হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

চিলেকোঠায় উঠে দেখি, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ঝুলন ফুলে ফুলে কাঁদছে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকলাম, "ঝুলন, অ্যাই ঝুলন?"

এক ঝটকায় ও আমার হাতটা সরিয়ে দিল। বিছানার একপাশে বসে ফের নরম গলায় বললাম, "শোন, ভাল একটা খবর আছে। শুনবি না।"

ফোঁপাতে ফোঁপাতেই ও বলল, "তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। তুমি জানো, এতক্ষণ আমার কী অবস্থায় কেটেছে?"

জোর করে ওর মুখটা আমার দিকে ফেরালাম। চোখের জলে গাল দুটো ভেসে যাচ্ছে। জল মুছে দিয়ে আমি বললাম, "আমাদের জন্য একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে এলাম। দেরিটা সেই কারণেই হল রে।"

আমার চোখে চোখ রেখে ও বলল, "একটা ফোন করতেও তো পারতে। তা হলে আমি চিন্তা করতাম না। বেলা আড়াইটা থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, তোমার কোনও বিপদ হয়েছে। তোমার কিছু হলে, আমার কী হবে অর্কদা? তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, এটা বোঝো না?"

ওর মুখটা দু'হাতে ধরে ঠোঁটে একটা চুমু দিলাম। তারপর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, "দিবাকরদা সেদিন আমাদের কী বলে গেল, তোর মনে নেই? সারা জীবন তোরা দু'জন পরস্পরকে ভালবাসবি। কখনও রাগ-অভিমান করবি না। বলেছিল কি না বল?"

"বলেছিল।"

"তা হলে? এই ক'দিনের মধ্যেই তা ভুলে গেলি?"

"কী করব, আমার যে কান্না পেয়ে গেল। ঠিক আছে, আর কাঁদব না। এ বার তুমি ফ্ল্যাটের কথা বলো।"

"উঁহুঁ, যতক্ষণ না তুই আমাকে আদর করবি, বলব না।"

ঝুলন এ বার উঠে বসল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে, চুলে পাক দিয়ে একটা খোপা করে নিয়ে বলল, "এ দিকে এসো।"

উত্তপ্ত ঠোঁটটা ও আমার ঠোঁটে ছোঁয়াতেই আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাঁ হাতে ওকে বুকের ওপর টেনে আমি এলোপাতাড়ি চুমু খেতে শুরু করলাম। চিবুক, গলা বেয়ে আমার মুখটা নেমে এল ওর বুকের খাঁজে। ঠিক তখনই নিজেকে ছাড়িয়ে ও বলল, "বাব্বা। তোমার একটুও তর সয় না, তাই না। দিনের বেলাতেই শুরু করে দিয়েছ। কাল

থেকে দশদিন যে থাকব না, তখন কী করবে?"

"তোর বাংলাদেশ যাওয়াটা আটকানো যায় না?"

"কী করে আটকাব? ভিসা পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই দশটা দিন বসে আঙুল চুষো তা হলে। দিদিভাইয়ের সামনে কেন সেদিন বললে, আমার কোনও অসুবিধে হবে না, ঝুলনকে তুমি নিয়ে যাও।"

"তুই না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগবে রে।"

আমার বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে ও বলল, "আমারও। জানো, আমার না খুব ভয় ভয় করছে। বাংলাদেশে গিয়ে যদি আমি হারিয়ে যাই, তা হলে?"

"দূর বোকা। কলকাতা আর ঢাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।"

"অর্কদা, আমাদের ফ্ল্যাটটা কেমন দেখে এলে গো? একতলায়, না ছাদে? ঘরে চাঁদের আলো আসবে? হাওয়া-বাতাস থাকবে?"

"আর কী কী হলে ভাল হয় রে?"

"ছাদে দাঁড়ালে অনেকটা দূর অবধি দেখা যাবে। দরজা বন্ধ করে দিলে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। একটা ছোট্ট কিচেন থাকবে। তোমাকে রোজ নতুন নতুন রান্না করে খাওয়াব। ঘরে খুব বেশি আসবাবপত্র থাকবে না। ধ্যাত, আর কিছু আমার মনে আসছে না।"

"তুই যা যা চাইছিস, আমাদের ফ্ল্যাটটায় সব কিছু আছে রে। রবিবার তুই থাকলে দেখাতে নিয়ে যেতাম। আমি ফের যাচ্ছি পাকা কথা বলতে। যাক গে, শোনা তো হল, এ বার তা হলে আদর করতে দে।"

আমার বুক থেকে মুখটা তুলেই, ঝুলন ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে ও তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফেরাতেই, দেখে চমকে উঠলাম। রেখা দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। চোখাচোখি হতে বলল, "আপনার শেষ ডায়লগটা আমি শুনে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত অর্কদা, তা হলে বাঁধা পড়ে গেলেন।"

pathagar.net

১৬

"অর্কদা, কনগ্রাচুলেশন্স।"

কাউন্টারে বসে হিসেব করছি। তাকিয়ে দেখি হোটেল দিনরাতের সেই ছেলেটা। সায়ন্তন। বলল, "আজ সকালে খবরটা কাগজে দেখলাম। খুব ভাল লাগল।"

রেল মন্ত্রকের পুরস্কার পাওয়ার খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে। সকাল থেকে অনেকেই আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। একটু লজ্জাও লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি আছ কেমন?"

"ভাল। অর্কদা, আপনি তো আর আমাদের হোটেলে এলেন না? আপনার জন্য অনেক খবর আছে।"

"এখন বলবে?"

হাতঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সায়ন্তন বলল, "এখন বলার সময় নেই। দু'টোর মধ্যে আমাকে হোটেলে পৌঁছতে হবে। এক কাজ করুন না। আমি রাত ন'টা পর্যন্ত

ডিউটিতে আছি। যে কোনও একটা সময় চলে আসুন। সুখবিন্দর সিংহের অনেক কিছু জানতে পারবেন।"

বললাম, "ঠিক আছে। আমি তিনটের সময় যাচ্ছি।"

"আসবেন কিন্তু। আপনার জন্য অনেক খবর নিয়ে রেখেছি।" বলেই সায়ন্তন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আজ সকালে নাচের ট্রুপ নিয়ে বাংলাদেশে গেছে বুলুদিরা। ঝুলনকেও নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোনও তাগিদ আমার নেই। সত্যি বলতে কী, ঝুলন যখন নাচের মেয়েদের সঙ্গে লাক্সারি বাসে গিয়ে বসল, তখন আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল। মনে হচ্ছিল, আমার সব থেকে প্রিয়জনকে বুলুদি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঝুলনের চোখে তখন রোদ চশমা। ফলে বুঝতে পারছিলাম না, ও আমার দিকে তাকিয়েছিল কি না। কিন্তু ওর মুখ দেখে আমিও বুঝতে পারছিলাম, ছাড়া পেলে ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওদের বাসটা দুর্গাপুর ব্রিজের নীচ থেকে হওনা হওয়ার কয়েক মিনিট আগে বুলুদি আমাকে বলল, "ভাই একটা কথা তোকে বলতে একদম ভুলে গেছি। নাচের ক্লাসে দেখবি ছোট্ট একটা প্যাকেট আছে। সেটা আজ বিকেলেই পার্ক সার্কাসে একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসবি। এই নে, এই কাগজটায় সব কিছু লেখা আছে।" বলেই বুলুদি আমাকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়েছিল।

অফিসে আসার জন্য তখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। চিরকুটটা পকেটেই পড়ে আছে। সায়ন্তনের কাছে গেলে পার্ক সার্কাসে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। তা হোক, আমার জন্য তো আজ বাড়িতে কেউ বসে থাকবে না। রাত বারোটায় বাড়িতে ফিরলেই বা ক্ষতিটা কী?

মন দিয়ে টিকিট বিক্রির হিসেবটা তৈরি করে, চিত্তদাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে কাউন্টার থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। আজ সকালের শিফটে দায়িত্বে আছেন চক্রবর্তীদা। টাকার বান্ডিল সিন্দুকে তুলে রেখে উনি বললেন, "অর্ক, আজ একটা সার্কুলার এসেছে রে। আর দু' তিনদিনের মধ্যেই আমাদের স্টেশনে রিনোভেশনের কাজ শুরু হবে।"

চেয়ারে বসে বললাম, "নতুন কিছু হবে?"

"মনে হয় না। নতুন বলতে, প্ল্যাটফর্মে কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা হচ্ছে। বাকি যা ছিল, সেগুলোই একটু ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হবে। দেওয়ালের পাথরগুলোতে পানের পিকের এত দাগ, এত ময়লা—এখন বিচ্ছিরি লাগে। সিলিংগুলো ওরা রঙ করে দেবে। আর পটুয়াদের যে ছবিগুলো আছে, সেগুলো পরিষ্কার করে ফের লাগাবে। আলোগুলোও বদলে দেবে। সব ক'টা স্টেশনে একসঙ্গে কাজ শুরু হচ্ছে। খরচ কত হচ্ছে জানিস? তিরিশ কোটি টাকা।

"এ সব কাজ কন্ট্রাক্টররা কখন করবে চক্রবর্তীদা?"

"ঠিক এই কথাটা নিয়েই একটু আগে কথা বলছিলাম রবীন্দ্র সরোবরের মিত্তিরের সঙ্গে। দুপুরে ওর আপত্তি নেই। আমি বললাম, তোমার স্টেশনে সারাদিনে দশটার বেশি প্যাসেঞ্জার নেই। তোমার ওখানে দুপুরে কাজ হলে তাই কোনও অসুবিধে নেই। আমার স্টেশন দিয়ে দিনে এক লাখ লোক যাতায়াত করে। আমার পক্ষে সম্ভব না।"

"তা হলে কী করবেন?"

"এই কথাটাই লিখে আমি মেট্রো ভবনে পাঠাচ্ছি। আরে ভাই, কন্ট্রাক্টরের লোকজন

যন্তর টন্তর এনে পাথর ঘষতে শুরু করলে যা ধুলো উড়বে, এখানে হাঁটা-চলা যাবে না। আমার বাড়িতে সামান্য জায়গায় মোজাইক লাগিয়েছি। ঘষাঘষির সময় ধুলো আর কাদায় আমার প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। এখানে পাথর ঘষার কাজ শুরু হলে, দেখবি কী অবস্থা হবে। আমি তো মেট্রো ভবনে জানিয়ে দিচ্ছি, যা করার, রাতে করুন। প্যাসেঞ্জারদের যাতে অসুবিধে না হয়।"

"কতদিন লাগবে কিছু বলেছে?"

"মাস খানেক তো লাগবেই। কন্ট্রাক্টররা যা কামানোর কামিয়ে নেবে। মেট্রো রেলের পয়সার তো মা-বাপ নেই। সবাই লুটে পুটে খাচ্ছে। শুধু আমরাই আঙুল চুষে বাড়ি যাচ্ছি। এই যে তুই সেদিন, লাইফ রিক্স করে ডাকাতদের আটকালি, মেট্রো রেলের দশ লাখ টাকা বাঁচিয়ে দিলি, তোর কী লাভ হল বল তো? দ-শ লা-খ টা-কা কম হল? ওই টাকাটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে যদি রোজ একশো টাকা করে তুই খরচা করতি, তা হলে শেষ হতে কত বছর লেগে যেত বল তো?"

"কত আর হবে? পাঁচ-সাত বছর।"

"দূর বোকা। সাতাশ-আটাশ বছরের মতো। প্রায় তোর রিটায়ার করার সময় এসে যেত।"

"তাই নাকি?"

"হিসেব করে দেখিস। তা, তুই এখন বাড়ি যাবি না? বসে আছিস কেন? পালা। আমিও উঠব রে। আজ আবার তোর বউদিকে নিয়ে একটা জায়গায় যেতে হবে। আমার জন্য বসে থাকবে।"

চক্রবর্তীদার সঙ্গেই উঠে পড়লাম। প্রায় আড়াইটা বাজে। সায়ন্তনের কাছে একবার যেতে হবে। ম্যাগনেটিক গেট পেরিয়ে নন পেইড এরিয়াতে ঢোকা মাত্রই ভুত দেখার মতো চমকে উঠলাম। এ কী, ঝুলন এখানে? সকালে বুলুদিদের সঙ্গে বাংলাদেশ গেল। ও ফিরে এল কোত্থেকে? হাতে সুটকেস। পঞ্চাশ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঝুলন হাঁফাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে, পাতালে নেমে ঠিক বুঝতে পারছে না, কোথায় আমার খোঁজ করবে। ওকে দেখে এত আনন্দ হল, মনে হল দৌড়ে গিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিই। সত্যি, অবাক কাণ্ড! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "এই ঝুলন, তুই এখানে? ফিরে এলি যে?"

আমাকে দেখে মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঝুলনের। বলল, "বাড়ি চলো। তারপর সব বলছি।"

"ইস, একদম ঘেমে গেছিস। আয়, আগে খানিকক্ষণ পাখার কাছে দাঁড়া।"

"আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না?"

"আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না।" বলে ওকে নিয়ে পেপসি কাউন্টারের পাশে এনে দাঁড় করালাম।

হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ঝুলন বলল, "গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটা পেপসি পাওয়া যাবে? সকাল থেকে কিচ্ছু পেটে পড়েনি।"

কথাটা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল পায়েল। আমি কিছু বলার আগেই দুটো পেপার কাপে ও পেপসি এনে দিল। দাঁড়ানো পাখার হাওয়ায় আঁচল উড়ছে। শরীরের সব খাঁজগুলো বোঝা যাচ্ছে। ওর বুকের দিকে চোখ যেতেই হঠাৎ আমার শিরায় শিরায় দাপাদাপি শুরু

হয়ে গেল। আগামী সাত-আটটা দিন বাড়িতে আর কেউ থাকবে না। ঝুলন একা আমার। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় ও কিছু আন্দাজ করেছে। চোখের ইশারায় ও আমাকে শাসন করল। পায়েল আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা লক্ষ করেই, নিজেকে সামলে বললাম, "হ্যাঁ রে, বুলুদিরা গেছে?"

"হ্যাঁ। বাসটা বনগাঁ বর্ডারে ওদের নামিয়ে দিয়ে, আমাকে নিয়ে চলে এল।"

"তুই যেতে পারলি না কেন?"

"পাশপোর্ট মিসিং। নাচের নতুন স্কুলে ফেলে রেখে গেছে, নাকি বাংলাদেশ হাইকমিশনে পড়ে আছে, কেউ মনে করতে পারল না। বুলুদি সোমনাথ চট্টরাজ লোকটাকে খুব গালাগাল করল। দোষটা নাকি ওঁরই।"

"ভালই হয়েছে, কী বল?"

"ভাল হওয়াচ্ছি।" ফিসফিস করে ঝুলন বলল, "আজ থেকে সব বন্ধ। তুমি একতলায়। আমি চিলেকোঠায়। ব্যস, শুধু খাওয়ার সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

"রেখা তোকে শিখিয়ে দিয়েছে এ সব তাই না? নিশ্চয়ই বলেছে, এখনই সব দিয়ে দিচ্ছিস মুখপুড়ি, ভুল করছিস। পরে আর তোর ওপর টান থাকবে না। রেখাকে দয়া করে তুই যেন খবর দিস না, ফিরে এসেছিস। কয়েকটা দিন অন্তত আমি তোকে একলা পাব।"

আমার রাগ দেখে ঝুলন খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, "সত্যি অর্কদা, রেখা কিন্তু আমাকে এ সব কথা বলেছে।"

"ও আর কিছু বলেছে?"

"তোমাকে বলব কেন? তুমি আমাকে সব কথা বলো? এই যে কাল রাতে জুঁই বলে একটা মেয়ে তোমাকে ফোন করেছিল, তার কথা তুমি আমায় কোনওদিন বলেছ?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "জুঁই ফোন করেছিল? সকালে তো আমাকে কিছু বলিসনি?"

"সুযোগ পেলাম কখন? কে গো মেয়েটা?"

"মনোময়বাবুর ভাইঝি। ওদের বাড়িতেই ফ্ল্যাট দেখে এসেছি। ইস, নিশ্চয়ই কোনও দরকারে ফোনটা করেছিল।"

"এখন তো তুমি বাড়িতে যাবে। একবার না হয় ফোন করে নিও।"

সায়ন্তনের কাছে যেতে হবে। হাতঘড়িতে দেখলাম, পৌনে তিনটে। ঝুলনকে বললাম, "এখন আমি বাড়ি যাব না। তুই চলে যা। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।"

এক চুমুকে পেপসি শেষ করে কাপটা ড্রামে ছুড়ে ফেললাম। তারপর পকেট থেকে চাবির রিংটা বের করে বললাম, "এই নে। সন্ধেবেলায় তুই রেডি হয়ে থাকিস। একবার পার্ক সার্কাসে যেতে হবে। ফেরার পথে দু'জনে রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেব।"

সিঁড়ির দিকে হাঁটার সময় ঝুলন বলল, "একটা কথা তোমাকে বলতে পারিনি। কাল সন্ধেবেলায় নাচের স্কুলে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে।"

"কী রে।"

"তুমি ফিরে এসো। তারপর শুনো।"

ওর মুখ দেখেই বুঝলাম, গুরুতর কিছু ঘটেছে। দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, "না, এখনই বল।"

"অর্কদা, দাদাভাই একটা অন্যায় করে গেছে। সুরমাদিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

"কে সুরমাদি?"

"নাচের স্কুলে একটা মেয়ে আছে, পিঙ্কি। তার মা।"

"তুই ঠিক জানিস?"

"হ্যাঁ। পিঙ্কির মামা কাল নাচের স্কুলে এসেছিল। বুলুদিকে যা তা বলে গেল। পিঙ্কিকে মামার বাড়িতে রেখে গেছে। দাদাভাই এটা কী করল, তুমি বলো।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "দিবাকরদা ঠিক করেনি। তোর মনে আছে, একদিন পিঙ্কিকে আমি ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছিলাম? সে দিন কিন্তু দিবাকরদাকে ওদের বাড়ি দেখেছিলাম। একটা কথা বল তো, ভদ্রমহিলা কি ডিভোর্সি?"

"না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা নেই। ভদ্রলোক আসানসোলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ান। আগে যাতায়াত করতেন। এখন কোয়ার্টারে থাকেন।"

"তার মানে, এই যে দিবাকরদা দু' তিনদিন অন্তর বাড়ি আসতেন না, তখন ওই পিঙ্কিদের বাড়িতে থাকতেন।"

"হতে পারে। সুরমাদিরই বা কী আক্কেল বলো তো? মেয়েটাকে ফেলে চলে গেল। কোনও মা এমন করতে পারে?"

"জগতে সব কিছুই সম্ভব রে।"

"সব শুনে দিদিভাই একদম ফিউজ হয়ে গেছে। জানো, পিঙ্কির মামা যখন কথা শোনাচ্ছিল, তখন দিদিভাইকে দেখে মনে হচ্ছিল, মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে।"

"কী বললেন ভদ্রলোক?"

"বললেন, আপনার ক্যারেক্টর যে খারাপ, জানতাম। কিন্তু আপনার হাজবেন্ডকে দেখে তো ভদ্রলোক বলে মনে হত। পুলিশকে সব জানিয়েছি। ওরা খুঁজে বের করবেই।"

"পাড়ায় জানাজানি হলে, কী কেলেঙ্কারি হবে বল তো?"

"মুখ দেখানো যাবে না। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, চেতলা থেকে আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো। ও বাড়িতে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না।"

বললাম, "তুই যা। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।"

অটো স্ট্যান্ডে এসে ঝুলনকে চেতলামুখী অটোতে তুলে দিয়ে আমি উল্টোদিকের বাসে চাপলাম। দিবাকরদা যে কোনও মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন, ভাবতেই পারছি না। ঝুলনকে জিজ্ঞাসা করা হল না, পিঙ্কির মামা জানলেন কী করে ভদ্রমহিলা দিবাকরদার সঙ্গেই গেছেন? উনি কি কোনও চিঠি লিখে গেছেন? নাকি একটা মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে; দিবাকরদার বিরুদ্ধে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে এই সেদিনও কথা বললাম, হোটেল দিনরাতের পার্টিতে। দেখে তো মনে হয়নি উনি এ কাজ করতে পারেন।

দিবাকরদার সঙ্গে ভদ্রমহিলার এত ঘনিষ্ঠতা হল কী করে, ভাবতে লাগলাম। পিঙ্কিকে রোজ নাচের স্কুলে পৌঁছে দিতে আসতেন। আলাপটা বাড়িতে হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সকালের শিফটে অফিস করলে আগে দিবাকরদা সন্ধের দিকে বাড়িতে থাকতেন। হতে পারে, তখন থেকেই ঘনিষ্ঠতা। বুলুদির চোখ এড়িয়ে মেলামেশা। বুলুদি তো মানুষ বলে মনে করত না দিবাকরদাকে। সেই বিতৃষ্ণা থেকে হয়তো দিবাকরদা অন্য একজন মনের মানুষ খুঁজে নিয়েছেন। হঠাৎই মনে হল, দিবাকরদা এই কেলেঙ্কারিটা করে, একটা শিক্ষা দিয়ে গেলেন বুলুদিকে। হিজড়ে বলার বদলা নিলেন। কথাটা মনে হতেই নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যাওয়ার আগে ওঁরা ইচ্ছে করেই এমন একটা কিছু করেছেন, যাতে কথাটা বুলুদির কানে পৌঁছয়।

মনে হল, দিবাকরদা জিতে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভার কাটতে শুরু করল। একটা লোক অন্তত বুলুদিকে শিক্ষা দিয়েছে। ঠিক করেছে। স্বামী অন্য এক বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এটা শুনলে আর পাঁচজন মহিলা লজ্জায় হয়তো ঘর থেকেই বেরত না। আর বুলুদি? নাভির নীচে শাড়ি পরে আজ সকালে হাসিমুখে বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতে গেল! বুলুদির কোনও কিছুতেই আর এখন অবাক হই না। কুকীর্তি দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। জানলার বাইরে তাকালাম। দেখি, গড়িয়াহাটের মোড় এসে গেছে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়লাম।

হোটেল দিনরাতে পৌঁছতেই সায়ন্তন বলল, "এত দেরি হল অর্কদা? আমি তো ভাবলাম, আপনি আসবেনই না। চলুন। অনেক কথা আছে। আমার ঘরে গিয়ে বসি।"

ওর পিছনে পিছনে পি বি এক্স রুমে এসে বসলাম। প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে। কাছাকাছি কোনও লোকজন নেই। এই হোটেলে একবারই মাত্র আগে এসেছি। বুলুদির জন্মদিনের পার্টিতে। সেদিন সায়ন্তন বলেছিল, সুখবিন্দর সম্পর্কে অনেক খবর দেবে। পরদিন আমার অফিসে গিয়ে যে খবরগুলো দিয়েছিল মোটামুটি সবই আমার জানা। বেশির ভাগ বুলুদিকে নিয়ে। সব শেষে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার এত আগ্রহের কারণটা কী? সত্যি কথাটাই বলেছিলাম। ভদ্রমহিলা আমার দিদি। আমরা একই ছাদের তলায় থাকি। শুনে ও লজ্জায় পড়ে গেছিল।

আজ শুরুতেই বলল, "অর্কদা, আপনার দিদিকে কোনওভাবে সাবধান করে দিন। না হলে উনি কিন্তু ফেঁসে যাবেন।"

শুনে বুকটা ধক করে উঠল। বললাম, "কীভাবে?"

"এই সুখবিন্দর লোকটা বেআইনি কিছু ব্যবসা করে। সেটা কী, আমি বলতে পারব না। ও যে সব ফোন করে, অথবা হোটেলে যে সব ফোন ওর কাছে আসে, তাতে কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনার দিদিও ক্রমে জড়িয়ে যাচ্ছেন। কথা হয় সাঙ্কেতিক ভাষায়। আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব না।"

"যেমন। একটা উদাহরণ দাও তো।"

"যেমন ধরুন, ষোলোটা পাখি পৌঁছে গেছে। চেতলায় দিয়ে এসো। কোনও দিন হয়তো বলল, মিক্সচারটা সুমিতার বাড়িতে আছে।"

"এই সব ফোন কোত্থেকে আসে সায়ন্তন?"

"ঠিক নেই। কখনও হলদিয়া, কখনও কাঠমাণ্ডু, কখনও মালদা। এই ফোনগুলো আসে সব রাতের দিকে। এক-দেড় মিনিট কথা বলে ছেড়ে দেয়। আজই যেমন সুখবিন্দরের কাছে একটা অদ্ভুত ফোন এসেছিল পার্ক সার্কাস থেকে। কারও বোধহয় কিছু পৌঁছে দেওয়ার কথা আছে পার্ক সার্কাসে ওই লোকটার বাড়িতে। সুখবিন্দর ফোনে নির্দেশ দিল, আগে থেকে পুলিশকে খবর দিয়ে রাখতে। লোকটা গেলেই যাতে পুলিশ তাকে ধরে ফেলতে পারে। এই ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারলাম না। মাল নিয়ে লোকটা যখন যাবে, সুখবিন্দররা তাকে তখন ধরিয়ে দেবে কেন?"

কথাগুলো শুনে আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। পার্ক সার্কাসে আমারও আজ একটা প্যাকেট পৌঁছে দেওয়ার কথা আছে। সুখিজি যে লোকটাকে ধরিয়ে দিতে বলেছে, সেই লোকটা কি তা হলে আমি? কিন্তু তাতে ওঁর লাভ? আমাকে মালটা পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করে গেছে বুলুদি। আমাকে বিপদে ফেলতে চাইবে কেন? আমি তো এই

দু'জনের কোনও ক্ষতি করিনি। ফট করে মাথায় এল, প্যাকেটটায় কী আছে, বাড়ি ফিরে আগে তা দেখতে হবে। না দেখে কিছুতেই ওই মাল আমি নিয়ে বেরব না।

নিজেকে সামলে আমি বললাম, "সুখিজির মোবাইল ফোন নেই?"

"আছে। বাইরে থেকে কেউ ফোন করলে, কথা বলতে বলতে অনেক সময় উনি বলেন, আমাকে মোবাইলে ধরো। এখন বলার দরকার নেই। তখনই বুঝি, এমন কিছু কথা আছে, যার কোনও প্রমাণ রাখতে চান না।"

"সুখিজি কি আছেন এখন হোটেলে?"

"আছেন। ৬০৯ নম্বর রুমে। আজ সকালেই ওঁর বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল। কেন যাননি জানি না। সকালে যার ডিউটি ছিল, সে আমাকে বলল, টালিগঞ্জ থেকে এক ভদ্রমহিলা ওঁকে ফোন করেছিলেন। সেই ফোনটা পাওয়ার পরই উনি হোটেলে থেকে যাওয়ার কথা রিসেপশনে জানিয়ে দেন।"

"হোটেলে ওর সঙ্গে কারা দেখা করতে আসেন, বলতে পারো?"

"যাঁরা ফোন করে আসেন, তাদের কয়েকজনের নাম বলতে পারি। হলদিয়া থেকে নীলমণি রাউথ। আসানসোল থেকে গঙ্গাপ্রসাদ সিং। মালদা থেকে কে এক বাবলু। এই রকম কয়েকজন। আপনার দিদি সবাইকে চেনেন। এমনও অনেক সময় হয়, সুখবিন্দর হয়তো হোটেলে নেই। ফোন এলে সেই সময় আপনার দিদিই ওদের সঙ্গে কথা বলেন। এদের মধ্যে রাউথ ওদের কামরায় কোনও কোনও রাতে থেকেও যান। এই ভদ্রলোক মনে হয়, হলদিয়ার কোনও একটা বড় কোম্পানির অফিসার।"

কথা বলার মাঝেই পি বি এক্স রুমে একটা ফোন বেজে উঠল। হেড ফোন লাগিয়ে সায়ন্তন কাকে যেন বলল, "নাম্বারটা দিন স্যার। আমি ফোন লাগিয়ে দিচ্ছি।" কথাটা বলে একটা নাম্বার ডায়াল করে একটা জায়গায় প্লাগ গুঁজে দিয়ে সায়ন্তন ফিসফিস করে বলল, "সুখিজির ফোন। আপনাদের বাড়িতেই করতে বললেন। চান তো, শুনতে পারেন।"

হেড ফোনটা লাগানোর পরই শুনতে পেলাম, ঝুলন বলছে, "না, অর্কদা এখনও ফেরেনি। কিছু বলতে হবে?"

সুখিজি বললেন, "তুমি কি জানো, ও পার্ক সার্কাসে গিয়েছে কি না?"

"না যায়নি। ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

"তুমি ওর সঙ্গে যাবে কেন ঝুলন?"

"অর্কদা, আজ আমাকে রেস্টুরেন্টে খাওয়াবে বলেছে।"

"না, তুমি যাবে না। তুমি বরং হোটেল দিনরাতে চলে এসো। আমি তোমায় খাওয়াব। কী খাবে বলো, চাইনিজ?"

"না সুখিজি। অর্কদা তা হলে রাগ করবে।"

"তুমি না এলে যে আমি রাগ করব? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো চলে এসো।"

"প্লিজ, এই অনুরোধটা করবেন না।"

"ঠিক আছে। তোমার দিদিভাই ফিরলে কিন্তু বলব, তুমি আমাকে ইনসাল্ট করেছ। রাখছি।" বলেই সুখিজি ফোনটা রেখে দিলেন।

দু'জনের কথা শুনেই আমি বুঝে গেলাম, লোকটা তা হলে আমি। যাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইছেন সুখিজি। এই কারণেই উনি চান না, ঝুলন আমার সঙ্গে পার্ক সার্কাসে যাক।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। এখুনি বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। ঝুলনকে পরোক্ষে ভয়ই দেখালেন সুখিজি। বুলুদির ভয়। উনি জানেন, বুলুদি ছাড়া ঝুলনের আর কোনও গতি নেই। উনি জানেন না, ঝুলনের আরও একজন আছে। ঝুলনের জন্য সে দরকার হলে ভয়ঙ্করও হয়ে উঠতে পারে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। হাতে একদম সময় নেই। ঝুলন যদি এর মধ্যে মত বদল করে ফেলে, নিজেই ফোন করে হোটেল দিনরাতে আসতে রাজি হয়ে যায়, তা হলে একটা মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়বে। দীপঙ্করদা আমাকে ঠিক কথাই বলেছিল, সুখবিন্দর লোকটা মাফিয়া টাইপের। ও আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে না পারলে, লোক লাগিয়ে খুনও করে ফেলতে পারে। ইচ্ছে করলে, তারপর ঝুলনকে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর...না, আমি আর ভাবতে পারছি না।

ট্যাক্সিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, সুখিজি আমার উপর চটলেন কেন? সে রকম কারণ তো ঘটেনি। পাতাল রেলের কাজটা উনি পেয়ে গেছেন। না পেলে তবুও একটা কথা ছিল। তা হলে কি উনি টের পেয়ে গেছেন, সায়ন্তনকে দিয়ে ওঁর খোঁজখবর আমি নিচ্ছি? এখুনি উঠে আসার আগে সায়ন্তন আমাকে বলল, "অর্কদা, একটা ক্যাসেট আপনাকে দিচ্ছি। প্লিজ, এটা যেন কারও হাতে না পড়ে। গত এক সপ্তাহে সুখবিন্দর ফোনে যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের সব কথা এই ক্যাসেটে আছে। বাড়িতে গিয়ে এই ক্যাসেটটা শুনে আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন।" ক্যাসেটটা পকেটে রেখে দিয়েছি। আজ হোটেলে না গেলে যে কী হত, তা ভেবে শিউরে উঠলাম। ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ি ফিরতেই ঝুলন দরজা খুলে দিল। নিজের ঘরে না ঢুকে আমি নাচের ক্লাসে গিয়ে প্যাকেটটা খুঁজে বের করলাম। পিচবোর্ডের প্যাকেট। ওপরে লেখা 'গ্লাস মেটেরিয়ালস, হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার।' প্যাকেটের কভারটা ছিঁড়ে ফেলতেই ঝুলন বলল, "এ কী করছ তুমি? অন্যের জিনিসে হাত দিচ্ছ?"

গম্ভীর হয়ে বললাম, "শিগগির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

গলা শুনেই ঝুলন বুঝতে পারল, কিছু একটা হয়েছে। কোনও প্রশ্ন না করে ও দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। প্যাকেটের ভেতর তুলোর মাঝে হাত দিতেই শক্ত কী একটা জিনিসের স্পর্শ পেলাম। তুলো বের করে ওই জিনিসটা তুলে আনতেই দেখি, পিস্তল! একটা নয়, তিনটে। চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঝুলন। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

১৭

সকালের ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার জন্য অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি সুজয়দা। আমাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ডাকাতির সেই ঘটনার পর, সুজয়দার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাই এগিয়ে গিয়ে বললাম, "কী ব্যাপার সুজয়দা, আমাকে চিনতে পারছ না মনে হচ্ছে?"

সুজয়দা বোধহয় এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "তোর মতো হারামি ছেলেকে না চেনাই উচিত।"

পাঁচ বছর এক সঙ্গে চাকরি করছি। সুজয়দা কখনও আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি। হঠাৎ কী এমন হল, গালাগাল দিতে শুরু করল? বললাম, "কেন? কী করেছি আমি?"

"আমার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছিস। আমি নাকি তোর বউদিকে মারধর করি। ট্রিটমেন্টের খরচ দিই না। কার কাছ থেকে এ সব ফালতু কথা শুনেছিস, গাণ্ডু কোথাকার?"

"কথাগুলো সত্যি, না মিথ্যে সুজয়দা?"

মুখ খিঁচিয়ে সুজয়দা বলল, "তোকে বলতে যাব কেন রে উল্লুক। ইন্দ্রর চামচেগিরি করছিস, তাই না? আমি খারাপ, আর ও সাধু? শালা, একটা বিধবা মাগীকে নিয়ে রোজ বাড়িতে কম্ম করছে। ভাবছে, কেউ জানে না? দ্যাখ অর্ক, আমাকে ঘাটাস না। আমি মুখ খুললে, তোরা কেউ বাঁচবি না।"

সুজয়দা আমাকেও হুমকি দিচ্ছে দেখে হঠাৎই মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, "তোমার সম্পর্কে যাতা কথা তো তোমার বউই বলেছে। তুমি এত পাষণ্ড যে, তোমার অত্যাচারে বউদি বাড়িতেও টিকতে পারল না।"

"কে বলল, ও বাড়িতে নেই?" বলেই সুজয়দা আমার হাতটা ধরল, "চল, এখুনি চল. দেখে আসবি আমার বউ আমার বাড়িতে আছে কি না?"

এত জোরের সঙ্গে সুজয়দা কথাটা বলল, আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। লেক গার্ডেন্স থেকে মিতা বউদি কি তা হলে লেক মার্কেটে সুজয়দার বাড়িতে চলে এসেছে? নিশ্চয়ই এসেছে। না হলে সুজয়দা এতটা জোর পাবে কোথা থেকে? মেয়েদের মন তো, হঠাৎ বোধহয় বদলে গেছে। সে দিন মিতা বউদি আমাকে যা বলেছিল, অফিসের অনেকের কাছে আমি তা বলে দিয়েছি। কথাগুলো সবাই বিশ্বাস করেছিল। এখন যদি সুজয়দা অফিসের সবাইকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বউদিকে দেখায়, ওদের মধ্যে সম্পর্কটা খারাপ হয়নি তা হলে আমিই মিথ্যেবাদী হয়ে যাব।

আমাকে দমে যেতে দেখে সুজয়দা বলল, "আমার সম্পর্কে কেন ফালতু কথা রটালি অর্ক? আমি তো তোর কোনও ক্ষতি করিনি। তোর বউদির ট্রিটমেন্টের জন্য এ দিক ওদিক থেকে যাও কিছু টাকা জোগাড় করছিলাম, সেটাও তোর জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তোর বউদির যদি কিছু হয়, তা হলে তার জন্য তুইই দায়ী হয়ে থাকবি।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। তাই বললাম, "ফালতু কথাগুলো যদি তোমার শালী নিজের মুখে বলে, তা হলে আমাকে দায়ী করছ কেন? মাল খেয়ে গিয়ে লেক গার্ডেন্সে একদিন তুমি বাওয়াল করোনি?" কথাটা বলে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ছয়-সাত বছর পর বাওয়াল শব্দটা আমার মুখ থেকে বেরল।

সুজয়দা বলল, "ও বলল, আর তুই বিশ্বাস করে ফেললি? আমার কাছে ভেরিফাই করার দরকার মনে করলি না? ভেতরের কথা সব তুই জানিস? লেক গার্ডেন্সের ওই বাড়িটা তোর বউদির বাবার। দুই বোন ছাড়া দাবিদার কেউ নেই। বোন বাড়িটা দখল করে আছে, ওর গাধাটে মার্কা হাজবেন্ডকে নিয়ে। আমার সম্পর্কে যা তা বুঝিয়ে বোন, তোর বউদিকে নিয়ে গেছিল বাড়িটা পুরোপুরি নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার জন্য। এ সব ঘটনা তুই কি জানিস?"

সুজয়দা কথা শুনে এ বার আমি সত্যিই অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। তা হলে সে দিন যা শুনেছি বা দেখেছি, তা সব ভুল? ভদ্রমহিলা আমার কাছে তা হলে অভিনয় করে গেলেন?

তবুও শেষ চেষ্টা করার জন্য বললাম, "তোমার কথা সত্যি হলে, বউদি কেন একা একা কেমোথেরাপি করাতে যায়? তুমি নাকি কোনওদিন সঙ্গে যাওনি?"

"কেন যাব, বল? আমি বললাম, হাসপাতালে কেমো করানোর থেকে ঢাকুরিয়ায় একটা নতুন ক্লিনিক হয়েছে, ওখানে কেমো করালে কম যন্ত্রণার হবে। আমাকে কেউ পাত্তাই দিল না। আমারও রাগ হয়ে গেল। বললাম, তোমাদের যা ইচ্ছে করো। আমি তো ভাল ট্রিটমেন্টই করাতে চেয়েছিলাম। আমার কথা শুনবে না কেন? শালা, আজ যে তুই এ সব প্রশ্ন করছিস, আগে করতে পারলি না?"

অসহায়ের মতো বললাম, "কী করে জানব, তোমার রিলেটিভরা এত ফালতু? বউদির চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা তোলা হচ্ছিল। ইন্দ্রদা বলল, যা একবার মিতার খোঁজ নিয়ে আয়....।"

কথাটা শেষ করতে দিল না সুজয়দা। ইন্দ্রদার নাম শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, "আর তুই ওই নোংরা লোকটার কাছে গিয়ে সব ঢেলে দিলি। এই যে চেতলায় তোদের পাড়ার লোকেরা তোর দিদিকে খানকি বলে, কই আমি তো কখনও অফিসের কাউকে কোনওদিন বলতে যাইনি। এই যে, তোর জামাইবাবু একজনের বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, অফিসের কেউ জানে? কাচের ঘরে বসে অন্যকে ঢিল মারতে যাস না অর্ক। বুঝলি?"

সুজয়দার মুখে বুলুদি আর দিবাকরদার কথা শুনতে শুনতে আমার শরীর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। সুজয়দা সব জেনে গেছে? তা হলে পাড়ার অনেক লোকও জানে? সুজয়দার কানে যাওয়া অসম্ভব কিছু না। ষষ্ঠীপদবাবুর দোকানের পিছনে সুজয়দার এক বন্ধু থাকে। হয়তো তার মুখ থেকেই কিছু শুনে থাকবে। এ সব খবর বাতাসের আগে ছোটে। আজ থেকে দশ বছর আগে হলে সুজয়দার মুখ এতক্ষণে আমি ফাটিয়ে দিতাম। বুলুদির জন্য নিয়ে, বেহালায় দুলাল বলে একটা ছেলে, খারাপ একটা কথা বলেছিল বলে একবার ওকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম। অথচ আজ খানকি কথাটা শুনেও আমার হাত উঠল না। কেন না আমি নিজেও জানি, এর থেকে সত্যি আর কিছু নেই।

সুজয়দা আরও কী বলে বসবে, এই ভয়ে কোনও উত্তর না দিয়ে আমি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সারা শরীর জ্বলছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। সুজয়দার উপর হচ্ছে না রাগটা। কার ওপর হচ্ছে তাও বুঝতে পারলাম না। ঘটনা যা ঘটছে, চেতলায় আর থাকা যাবে না। সুজয়দার মুখে এ সব শোনার পর, এখন মনে হচ্ছে অফিসেও কাজ করা সম্ভব না। সীতাংশুদের কানে এ সব কথা একদিন না একদিন যাবেই।

ওরাও আড়ালে আমার সম্পর্কে টিপ্পনী কাটবে। ছিঃ।

হঠাৎই কেমন যেন জটিল হয়ে গেল জীবনটা। দিবাকরদার চলে যাওয়া, বুলুদির মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, কাল রাতে প্যাকেটের ভেতর পিস্তল পাওয়া, আজ সকালে সুজয়দার খিস্তি। সব মিলিয়ে হঠাৎ নিজেকে দিশেহারা লাগছে। একটা জিনিস এখনও মাথায় ঢুকছে না, আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে বুলুদিও আছে কি না? এমনও হতে পারে, বুলুদি জানতই না, প্যাকেটে পিস্তল আছে। না জেনেই আমাকে মালটা পার্ক সার্কাসে পৌঁছে দিতে বলেছিল। আমাকে অপদস্থ করার ইচ্ছেটা পুরোপুরি সুখির। হতে পারে, নাও হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না কাল রাত থেকে।

প্যাকেটটা যে কাল রাতে পার্ক সার্কাসে পৌঁছয়নি, এ খবর নিশ্চয়ই সুখির কাছে পৌঁছে গেছে। এর পর উনি কী করেন, মনের মধ্যে সেটাও ঘুরছে। আজ অফিস থেকে বার পাঁচেক ঝুলনকে আমি ফোন করেছি। না, কেউ প্যাকেটটা চাইতে আসেনি। সুখিজিও সকাল থেকে ফোন করেননি। ঝুলন একটা কথা বলল, যার মানেটা বুঝিনি। "লোকনাথবাবার মন্দিরে টিকটিকিটা বসে আছে।" আমাদের বাড়ি থেকে লোকনাথবাবার মন্দির প্রায় বিশ গজ। অত দূর থেকে ঝুলন টিকটিকি দেখতে পেল কীভাবে?

হাঁটতে হাঁটতে চেতলা ব্রিজে উঠে এলাম। কাল রাতের কথা ভাবছি। পিস্তলগুলো দেখার পর ঝুলন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিল। প্রথম কথাটাই বলেছিল, "বাড়িতে এ সব কী হচ্ছে বলো তো, অর্কদা?"

"আমাকে হাতকড়ি পরানোর ব্যবস্থা।"

"কী হবে এখন?"

"আগে এগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখুনি বাড়ির বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে।"

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"তা হলে মরব।"

ঝুলন আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "দাও, আমাকে প্যাকেটটা দাও। আমি গিয়ে রেল লাইনের কোথাও রেখে আসছি। মেয়েদের কেউ সন্দেহ করবে না।"

"পাগলামি ছাড় তো। এই সময়ে রেললাইনের ওই দিকটা সেফ না। আমাকে চিন্তা করতে দে। প্যাকেটটা কে দিয়ে গেছে, জানিস?"

"লোকটাকে চিনি না। কাল বিকেলে সুখিজির নাম করে দিয়ে গেছে। এর আগেও একদিন একটা লোক একটা অ্যাটাচি কেস দিতে এসেছিল। তোমাকে ফোন করলাম। মনে নেই?"

"সুখিজিই তা হলে বেআইনি কাজে বুলুদিকে জড়াচ্ছে।"

"আমার খুব ভয় করছে অর্কদা।"

"ভয় যতটা সুখিজিকে নিয়ে, তার থেকেও বেশি পুলিশকে। ভাবতে পারিস, এখন যদি পুলিশ আসে, কী হবে?"

কথাটা শুনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিল ঝুলন। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। দাও, জিনিসগুলো দাও। আমি বিদেয় করে আসি।"

ঠিক ওই মুহূর্তেই ওপরে ফোনটা বেজে উঠেছিল। ঝুলন আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "যদি সুখিজির ফোন হয় তা হলে কী বলব অর্কদা?"

"বলবি, অর্কদা এখনও বাড়িতে ফেরেনি।"

"ঠিক আছে।"

বলেই ঝুলন উপরে উঠে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম প্যাকেটটা নিয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকে সত্তর-আশি গজ দূরেই রেল লাইন। পূর্ব দিকে নিউ আলিপুর স্টেশন। পশ্চিম দিকে মাঝেরহাট। সন্ধের দিকে ঝুপড়িগুলোর বাসিন্দারা নিজের কাজে ব্যস্ত। আর ঘণ্টা দু'য়েক পরে এ দিকটায় আসা যাবে না। অসামাজিক লোকজনে ভর্তি হয়ে যাবে। ওয়াগন ভাঙা থেকে শুরু করে ছিনতাই, সবই হয় এই অঞ্চলে। রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকলাম। ঝুপড়িগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে

এসে একটা ঝোপের মধ্যে প্যাকেটটা ছুড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। না, কারও চোখে পড়েনি। এ বার কেউ যদি প্যাকেট চাইতে আসে, তাকে বলে দেওয়া যাবে, বুলুদি কোথায় রেখে গেছে, আমরা জানি না।

কাল রাতটা আমাদের দু'জনেরই উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের মনে হয়েছিল, এই বোধহয় পুলিশ এসে কড়া নাড়বে। সুখিজি অবশ্য এই চালটা চালেননি। ওঁর মাথায় কী ঘুরছে, আন্দাজ করা শক্ত। সন্ধেবেলায় প্যাকেটটা যখন আমি ফেলতে গেছিলাম, তখন সায়ন্তনের ফোন এসেছিল। ঝুলনকে ও বলেছিল, পরে আবার করবে। কিন্তু করেনি। হয়তো জানানোর মতো কিছু ঘটেনি। ঘটলে ফোন করত। অথবা আজ হোটেলে যাওয়ার পথে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেত।

চেতলা বয়েজ স্কুলের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখো হাঁটছি। এমন সময় পুলিশের একটা জিপ পাশে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠে দেখি, দুর্গা ব্যানার্জি। "অর্কদা, আপনি এদিকে?" বলতে বলতে দুর্গা জিপ থেকে নেমে এল।

"আমি তো এদিকেই থাকি। তুমি এখানে?"

জিপের ড্রাইভারকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে দুর্গা বলল, "আর বলবেন না। দুর্গাপুর ব্রিজের কাছেই রেললাইনের ধারে আমার আপন মাসির বাড়ি। ঘণ্টা দু'য়েক আগে ফোন, চলে আয়। জরুরি দরকার আছে। গিয়ে দেখি, অদ্ভুত ব্যাপার। মাসির বাড়ির কাজের মেয়েটা লাইনের ধারে ময়লা ফেলতে গিয়েছিল। একটা প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়েছে। তাতে তিনটে পিস্তল রয়েছে।"

দুর্গার কথা শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বললাম, "তারপর?"

"মাসির বাড়িটা আমাদের থানার জুরিসডিকশনে পড়ে না। ওটা আবার নিউ আলিপুর থানার আন্ডারে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে ও সি-কে ফোন করলাম। ওরা এসে পিস্তলগুলো নিয়ে গেল। একেবারে রাশিয়ান মেক। এখানে এল কী করে, সেটাই আশ্চর্যের।"

দুর্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে হল, এই মেয়েটা আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই বলে বসলাম, "ওই পিস্তলগুলো কী করে ওখানে গেল, আমি জানি।"

"তার মানে?"

"ওগুলো আমিই ওখানে ফেলে এসেছি।"

"ঠাট্টা করছেন অর্কদা?"

বললাম, "মোটেই আমি ঠাট্টা করছি না দুর্গা। আমি একশো পার্সেন্ট সিরিয়াস। তোমার একটু সময় হবে? চলো, কাছেই চেতলা পার্ক। ওখানে গিয়ে বসেই না হয় সব কথা শুনবে।"

দু'জনে চেতলা পার্কে এসে বসলাম। বুলুদি, ঝুলন, সুখবিন্দর, দিবাকরদা সম্পর্কে সব কথা গুছিয়ে বলে জিজ্ঞেস করলাম, "এর পর আমার কী করা উচিত, তুমি বলো তো দুর্গা?"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন, পুলিশকে আপনার সব জানানো উচিত।"

"তুমি কি লোকাল থানার কথা বলছ?"

"না। এটা আরও অনেক বড় ব্যাপার। কোনও একটা চেন থেকে আর্মস আসছে। নিশ্চয়ই

বিদেশি কোনও এজেন্ট কাজ করছে। আই এস আই হওয়াই সম্ভব। আপনি লালবাজারে ডি ডি সেকশনে যোগাযোগ করুন।"

"ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে না তো?"

"হতে পারে। আমাদের মধ্যেও তো অনেক বাজে লোক আছে। দাঁড়ান, আমি একজন অফিসারের নাম বলে দিচ্ছি। বিনায়ক মল্লিক। ফোনে একবার কথা বলে, স্যারের সঙ্গে দেখা করে সব বলুন। স্যার খুব সৎ প্রকৃতির। উনি আপনাকে হেল্প করবেন।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে দুর্গা?"

"আপনি যদি বলেন, যাব। কাল বেলা তিনটের পর হতে পারে। আমি তখন ফাঁকা থাকব। অর্কদা, এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। বাঁচতে যদি চান, তা হলে কাল কিন্তু অন্য কোনও কাজ রাখবেন না। আমাকে বলে ভাল করেছেন।"

"কাল কোথায় দেখা হবে তোমার সঙ্গে?"

"আমার ডিউটি আছে ময়দান স্টেশনে। আমি কালীঘাটে চলে আসব। এর মধ্যে গড়িয়াহাট থানায় আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরাও হোটেলের ওপর নজর রাখুক। এই সুখবিন্দর সিং লোকটাকে একবার দেখতে পেলে ভাল হত। ওর কোনও ছবি আছে আপনাদের বাড়িতে?"

"দেখতে হবে। দিদিভাইয়ের জন্মদিনে এক ফটোগ্রাফার কিছু ছবি তুলেছিল। তার কাছে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"পেলে কাল নিয়ে আসবেন। আমার বাড়ির ফোন নম্বরটা লিখে নিন। আর আপনারটাও দিন। তেমন হলে ফোনে ফোনে কথা বলে নেওয়া যাবে।"

আমার ফোন নম্বর নিয়ে দুর্গা উঠে পড়ল। তারপর বলল, "ভয় পাবেন না অর্কদা। আর্মস ডিলাররা আপনার উপর নজর রাখবেই। তাই নর্মাল থাকুন। এমন ভাব দেখান, যেন পিস্তলগুলো সম্পর্কে কিছুই জানেন না।"

দুর্গার কথায় মনে একটু ভরসা পেলাম। বললাম, "অন্য কিছুতে ভয় পাচ্ছি না দুর্গা। আমার ভয় শুধু ঝুলনটাকে নিয়ে। আমার যদি কিছু হয়, ওর জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে।"

"হয়তো সেটাই উদ্দেশ্য সুখবিন্দরদের। গোটা ব্যাপারটা ভাবুন অর্কদা। বুঝতে পারবেন। যেমন ঝুলনের পাশপোর্ট না পাওয়াটা। একটা ছক। আপনার বুলুদির অ্যাবসেন্সে ওকে কলকাতায় রেখে দেওয়া। নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলবে। এ বার আপনি থাকলে সেটা সম্ভব না। তাই আপনাকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দিলে সুখবিন্দররা নিষ্কন্টক হয়ে যাবে।"

দুর্গার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হ্যাঁ, একটা কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি। বললাম, "তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ।"

পার্ক থেকে বেরনোর সময় দুর্গা বলল, "একটা কাজ করতে পারেন অর্কদা। আপনি যখন অফিসে থাকবেন, ঝুলনকে তখন অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করুন। যখন ফিরবেন, তখন ওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকবেন। এই প্রিকশানটা কি নিতে পারবেন?"

"হ্যাঁ।" মনে মনে ভাবলাম, ঝুলনকে রোজ রেখার বাড়িতে রেখে অফিসে যাব। একটা অটো ধরে দুর্গা রাসবিহারীর দিকে চলে যাওয়ার পর আমি হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরে এলাম। মনটা বেশ হালকা লাগছে। দুর্গার সঙ্গে কথা বলে আমার উপকারই হল। এখন

আমার ভয় পেলে চলবে না। আমি ভয় পেলে ঝুলন আরও ভয় পাবে। ওর সঙ্গে এমন হাবভাব করা উচিত, যাতে আমার কিছুই হয়নি।

দরজা খুলেই ঝুলন বলল, "এত দেরি হল যে অর্কদা। তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। বলল, ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে এসেছ?"

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ভীষণ খিদে পেয়েছে রে।"

আমার কাছে এসেই ঝুলন নাক সিঁটকাল। তারপর সরে গিয়ে বলল, "ইস, তোমার গা দিয়ে ঘেমো গন্ধ বেরোচ্ছে। এখখুনি তুমি কলঘরে গিয়ে চান করে আসবে। আর আমার সামনেই আসবে না।"

ওকে রাগানোর জন্যই কাছে গিয়ে পাঁজকোলা করে তুলে নিলাম। ছটফট করতে করতে ঝুলন বলল, "ছাড়ো, ছাড়ো। ঘামের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। বমি উঠে আসছে।"

ঘরে এনে ওকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তারপর বললাম, "চুপ করে শুয়ে থাক। আমি দশ মিনিটের মধ্যে স্নানটা করে আসছি।"

বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। সেদিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঝুলন বলল, "লোভী কোথাকার। একটু সুযোগ পেলেই হল, তাই না?" বলেই তাড়াতাড়ি ও আঁচল দিয়ে বুক ঢাকল।

আমি হাসতে হাসতে কলঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কাল সারা রাত ঝুলন আমার ঘরে শুয়েছিল। মনটা দু'জনেরই তখন এত বিক্ষিপ্ত, কোনও ইচ্ছেই আমাদের জাগেনি। দু'জনে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কালই টের পেলাম, মন ভাল না থাকলে শরীরের সুখ নেওয়ার ইচ্ছেটা জাগে না। দুর্গার সঙ্গে কথা বলে মনটা আজ অনেক হালকা। তাই বাড়িতে ঢুকে ঝুলনকে দেখামাত্র, ইচ্ছেটা তীব্র হতে শুরু করেছে।

দুপুরে সুজয়দা আমাকে যা তা বলে গেল। একটা শিক্ষা কিন্তু আমাকে দিয়ে গেছে। মুদ্রার উল্টো পিঠটাও সময় সময় দেখার। মিতা বউদি আর তাঁর বোনের কথা বিশ্বাস করে আমি এক তরফা একটা ধারণা করে রেখেছিলাম। সুজয়দা সত্যি বলুক অথবা মিথ্যে, আমাকে আবার উল্টো ধারণা দিল। বুলুদি আর দিবাকরদার সম্পর্কটা নিয়ে কখনও দু'দিক থেকে ভাবিনি। বুলুদিরও নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য আছে। বুলুদির তরফ থেকে ভাবলে, হয়তো দিবাকরদা যোগ্য স্বামী নয়। হিজড়ে কথাটার মানে ভাবলে সেই সিদ্ধান্তটাই নিতে হয়। আবার দিবাকরদা যদি হিজড়েই হন, তা হলে পিঙ্কির মা ওঁর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন কেন? নিশ্চয়ই দিবাকরদা ওঁর চাহিদা মেটাতে পেরেছেন।

মাথায় জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎই কথাটা মনে হল। সব মেয়ে সব পুরুষকে তা হলে সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। যেমন জুঁই। ওর শরীর সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহই কোনও দিন জাগেনি। সেদিন ছাদ থেকে যখন ও নেমে আসছিল, তখন বাঁকের মুখে ঘুরে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎই ওর বুকে আমার কাঁধ স্পর্শ করেছিল। আমার তখন কিছুই মনে হয়নি। অথচ এখন যা অবস্থা, ঝুলনকে ওই পরিস্থিতিতে পেলে আমি ছেড়ে দিতাম না। ওর ঠোঁটটা চুষে খেয়ে ফেলতাম। ঝুলনও নিজেকে সামলাতে পারত বলে মনে হয় না। কেন শরীরে শরীরে এমন পার্থক্য হয়, রহস্য।

স্নান সেরে এসে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিলাম। বাইরে উঠোনে আজ ফের চাঁদের আলো এসে পড়েছে।। উঠোনে চাঁপা গাছটা থেকে চমৎকার একটা গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরের রকের আলোটা ঝুলন বোধহয় ইচ্ছে করেই জ্বালায়নি। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আমার

জন্য ও জলখাবার তৈরি করছে। একদম ইচ্ছে নেই কিছু মুখে দেওয়ার। তাই ডাকলাম, "ঝুলন, এই ঝুলন একবার এ ঘরে আয়। গ্যাসটা বন্ধ করে আসিস। জরুরি দরকার।"

মুহূর্তেই দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল ও। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে গো অর্কদা?"

"আমার একদম আছে আয়।"

ঝুলন এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করলাম। প্রথম ঝাপটা সামলে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ঝুলন বলল, "তুমি কী গো। এই বদমাইশি করার জন্য আমাকে ডাকলে? এ সব করার এটা সময় হল? উফ্ তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বলো তো?"

"যখন চাইব, তখন সাড়া দিবি।"

"দেওয়াচ্ছি। এখন ছাড়ো তো। তোমার খিদে পেয়েছে।"

"না ছাড়ব না। আগে শরীরের খিদেটা তো মেটাই। তারপর টোস্ট-ওমলেট।" কথাটা বলতে বলতেই আমি ওর বুকের খাঁজে মুখটা ডুবিয়ে দিলাম। এক হাতে ওর সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরেছি। ওর বুকে আমার হাতটা খেলা করতে লাগল। হাতটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল বটে ঝুলন, কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে গেল সেই চেষ্টা। তারপর ফিসফিস করে বলল, "বিছানায় চলো।"

আমি এখন কিছুটা অভিজ্ঞ হয়েছি। এই সময়টায় ওর নড়াচড়ায় বুঝতে পারি, কী চাইছে। শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করলে ও শীৎকার করে ওঠে। আঙুলের স্পর্শে ঝুলন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। চোখ বুজে সুখ নিচ্ছে ঝুলন। ঠোঁট দু'টো ওর ফাঁক হয়ে আছে। দু'হাত দিয়ে আমাকে বুকের উপর টেনে এনে, ঝুলন বলল, "অর্কদা সারাজীবন এমন করে আমাকে ভালবাসবে তো?"

ওর ঠোঁট দু'টোয় চুমু খাওয়ার ফাঁকে বললাম, "হ্যাঁ, বাসব।"

আমার পিঠটা ও দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে। হঠাৎ চোখ মেলে আমাকে বলল, "আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো অর্কদা? তোমাকে তো সবই আমি দিয়ে দিলাম।"

দু'হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে বললাম, "তোর কোনও সন্দেহ আছে?"

"না। তা নেই। কিন্তু মাঝে মধ্যে খুব ভয় হয়।"

ওর কপালে একটা চুমু দিয়ে বললাম, "কাল সকালেই বাবাকে চিঠি লিখ্‌ব। আপনার ছেলে একজনকে পছন্দ করে ফেলেছে। যত শিগগির সম্ভব, বিয়ের ব্যবস্থা করুন। ব্যস, হল তো। এ বার তুই একটু আমাকে আদর কর।"

সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটা মন্থন করতে লাগলাম। চোখ বুজে, মুখে তৃপ্তির শব্দ করতে করতে ও তা উপভোগ করতে লাগল। নিষ্পেষিত হতে হতে ওর ঠোঁটটা ফুলে গেছে। তা দেখে আমার শরীরের সব রক্ত প্রবাহ যেন একটা বিন্দুর দিকে ছুটে গেল। তীব্র সুখানুভূতিতে আমি দু'তিনবার কেঁপে উঠলাম।

বিস্ফারিত চোখে ঝুলন আমার দিকে তাকাল। তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আজ তুমি এ কী করলে অর্কদা? নিজেকে সামলাতে পারলে না? কী হবে, যদি কিছু হয়ে যায়?"

বিছানায় ও উঠে বসেছে। ওকে অসাধারণ লাগছে। বললাম, "আজ বীজ পুঁতে দিলাম। যাতে আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যেতে না পারিস।"

"জানি না, যাও। পরে বুঝবে।" বলেই ঝুলন বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। শাড়িটা কাঁধে ফেলে হেঁটে গেল কলঘরের দিকে।

১৮

অফিসে ঢুকতেই চক্রবর্তীদা বললেন, "অর্ক, তোর সঙ্গে যে মিষ্টি মেয়েটাকে দেখলাম, কে রে?"

ঝুলন আজ আমার সঙ্গে এসেছে। বললাম, "দিদির ননদ।"

"তা, ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন? ভেতরে নিয়ে এসে বসা না। কোথাও যাচ্ছিস নাকি?"

"হ্যাঁ। দক্ষিণেশ্বরে।"

ঝুলনকে পেপসি কাউন্টারের সামনে দাঁড় করিয়ে আমি একবার এস এসদের ঘরে ঢুকেছিলাম, চক্রবর্তীদার কাছে দু'দিন ছুটি চাইব বলে। ঝুলন এত সুন্দর সেজে বেরিয়েছে যে, চক্রবর্তীদার নজরে পড়ে গেছে। পেপসি কাউন্টার থেকে ওকে ডেকে নিয়ে এলাম।

চক্রবর্তীদা ওকে বললেন, "বাঃ তোর নাম কী রে মা?"

ঝুলন বলল, "অর্পিতা বসু।"

ওর ভাল নাম যে অর্পিতা, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম, "আমরা ডাকি ঝুলন বলে।"

"কদ্দূর পড়াশুনো করেছ?"

"হায়ার সেকেন্ডারি পাশ।"

ঝুলনের দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তীদা বললেন, "আমার ছেলেটাকে বিয়ে করবি মা? ছেলেটা খারাপ না। ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে পি ডবলিউ ডি-তে।"

কথাটা শুনে ঝুলন লজ্জায় পড়ে গেছে। ওকে উদ্ধার করার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ঝুলনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"

"ক্যানসেল করে দে। ছেলের জন্য দশ-বারোটা মেয়ে দেখলাম, একটাও পছন্দ হল না। আমার ছেলেটাও এমন গাধা, ভাল একটা মেয়ে দেখে প্রেম-ট্রেমও করতে পারল না।"

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য আমি বললাম, "চক্রবর্তীদা, ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে গেলাম। আপনি কিন্তু মনে করে পাঠিয়ে দেবেন।"

"তুই তো ছুটি নিস না অর্ক। দেশের বাড়িতে যাচ্ছিস?"

"না। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। শিফটিংয়ের ঝামেলা আছে। অফিস করে ও সব করা যাবে না।"

"আজ তো এখানে ঝামেলা আছে। শুনেছিস কিছু?"

"না। কী ঝামেলা?"

"সেই সাফাই স্টাফ নিয়ে ঝামেলাটা। আমাদের কর্তারা পঞ্চাশ জন সাফাই স্টাফকে নেবে বলেছে। নতুন অ্যাপ্লিকেশন এসেছে প্রায় তিন হাজার। তার মধ্যে বি এ পাশও আছে। বোঝ অবস্থা, বি এ পাশ ছেলেও আজকাল ঝাড়ুদারের চাকরি করতে চাইছে।"

"তাতে ঝামেলার কী হল চক্রবর্তীদা?"

"আরে, এতদিন যে লোকগুলো সাফাইয়ের কাজ করছিল, ঝামেলাটা তারাই পাকাচ্ছে। প্রত্যেক দিন একেকটা স্টেশনে জড়ো হয়ে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আজ জড়ো হয়েছে আমাদের স্টেশনে।"

"কিন্তু ওরা তো আমাদের ক্যাজুয়াল স্টাফও না। ঠিকাদারদের স্টাফ। ওদের পাকা চাকরিতে নিতে হবে কেন?"

"সেটা কে বোঝাবে, বল। ওদের বক্তব্য, আমরা যারা এতদিন ধরে কাজ করছি, কেন আমাদের মধ্যে থেকেই চাকরিতে নেওয়া হবে না? শুনলাম, আজ ট্রেন-ফ্রেন বন্ধ করে দিতে পারে। তুই দশটা চোদ্দোর ট্রেনটাতে বেরিয়ে যা। পরে মুশকিলে পড়ে যাবি।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। চক্রবর্তীদা ঝুলনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করলেন, "তোর কপাল খারাপ রে মা। আমার মতো ভাল একটা শ্বশুর পেলি না।"

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আজ কবিগুরুর জন্মদিন। সরকারি ছুটি। তাই প্ল্যাটফর্মে খুব বেশি লোক নেই। অন্য দিন এই সময়টায় গিজগিজে ভিড় থাকে। ঝুলন আগে কখনও পাতাল রেলে চড়েনি। অবাক হয়ে ও সব দেখছে। কাল রাতে দ্বিতীয়বার সঙ্গমের পর ও আমাকে দিয়ে দু'টো শপথ করিয়ে নিয়েছে। এক, আর তুই-তোকারি করা চলবে না। দুই, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে নিয়ে যেতে হবে। দু'জনে এক সঙ্গে গিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে আসব। সকালে দু'একবার মুখ ফসকে তুই-তোকারি করে ঝুলনের বকুনি শুনেছি। ওই ভুলটা আর আমি করছি না। পাতাল রেল নিয়ে ও যে সব প্রশ্ন করছে হুঁ হাঁ করে দায় সারছি।

"আচ্ছা ভাই, এই ছবিগুলো কোথায় গেল, বলতে পারেন?"

তাকিয়ে দেখি, মাঝবয়েসী এক ভদ্রমহিলা। মুখ চেনা। প্রায়ই যাতায়াত করেন এই স্টেশন দিয়ে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি। ভদ্রমহিলা প্রশ্নটা করায় দেখলাম, সত্যিই তো দেওয়ালে পটুয়াদের আঁকা সেই ছবিগুলো নেই! নিশ্চয়ই পরিষ্কার করার জন্য ঠিকাদারদের লোকজন খুলে নিয়ে গেছে। বললাম, "ছবিগুলোয় ধুলো পড়েছিল। সেজন্য খোলা হয়েছে। ধুয়ে মুছে ফের লাগিয়ে দেওয়া হবে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "দেখবেন, যেন লাগানো হয়। এই ছবিগুলো আমাদের কালীঘাট স্টেশনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের গর্ব করার জিনিস। এর বদলে অন্য ছবি লাগালে কিন্তু আমাদের ভাল লাগবে না।"

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ছবি বদলানো হবে না।"

'থ্যাঙ্ক ইউ।" বলে ভদ্রমহিলা সামনের দিকে হেঁটে গেলেন।

টালিগঞ্জমুখী একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। ঝুলন সে দিকে তাকিয়ে লোকজন দেখছে। আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি করেছে। ওর মুখশ্রীটাই যেন কেমন বদলে গেছে। আগে কোনওদিন ওকে নাকছাবি পরতে দেখিনি। সেদিকে তাকাতেই শরীরটা শিরশির করে উঠল। নিজেকে সুন্দর করে রাখার বিদ্যেটা ঝুলন নিশ্চয়ই বুলুদির কাছে শিখেছে। ঘিয়ে রঙের একটা শাড়ি পরে এসেছে। তাতে ওর রূপটা আরও খুলে গেছে। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ করলাম, অনেকেই ওর দিকে তাকাচ্ছে। গত দু'তিন মাসে ঝুলন আরও সুন্দরী হয়ে গেল, নাকি আমারই দৃষ্টিটা বদলেছে— ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঝুলন মুখ টিপে হেসে বলল, "হাঁ করে কী দেখছ?"

"তোমাকে। আজ বাড়ি ফেরার পর যেন আমাকে আটকিও না।"

"ছি ছি। মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছ। এখনও মন থেকে এ সব মুছে ফেলতে পারছ না। তুমি কী গো অর্কদা?"

"আমি কী, বিকেলে তা বোঝাব।"

"বিকেলে তোমার বিনায়কবাবুর কাছে যাওয়ার কথা আছে না?"

"তার আগেই একবার যা করার করে যাব।"

"এসো, করাচ্ছি। অসভ্য কোথাকার।"

কথা বলার ফাঁকেই ট্রেন এসে গেল। লোকজন বিশেষ নেই। কামরায় ঢুকে দু'জনেই বসার সিট পেয়ে গেলাম। গাড়ি ছাড়ার পর ঝুলন আমার এক হাত জড়িয়ে ধরল। অবাক হয়ে ও কামরার ভেতরটা দেখছে। ওপরে পরপর স্টেশনের নামগুলো লেখা আছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ঝুলন বলল,

"আমরা কোথায় নামব গো অর্কদা?"

"শ্যামবাজার। ওখান থেকে বাসে করে দক্ষিণেশ্বরে যাব।"

"তার মানে বারোটা স্টেশন। কতক্ষণ লাগবে?"

"মিনিট পঁচিশ। আগে আরও কম সময় লাগত। এখন স্পিড অনেক কমিয়ে দিয়েছে।"

"কেন গো?"

"পনেরো বছর হয়ে গেছে তো। অনেক জায়গায় লাইন আগের মতো নেই। এখন সেজন্য আস্তে চালানো হয়।"

কামরার ভেতরে সিটের পিছনে শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলো ঝুলন মনোযোগ দিয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে টাঙানো বিজ্ঞাপনগুলোও। সব কিছুতেই ওর কৌতূহল। এতদিন বাড়ির বাইরে যখন বেরত, তখন সঙ্গে থাকত বুলুদি। গাড়ি করে যেত। ফিরত গাড়িতে। যেত হয় বুলুদির নাচের কোনও প্রোগ্রামে, না হয় কিছু কেনাকাটার জন্য দোকানে অথবা বিউটি পার্লারে। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সুযোগই ও পায়নি। ঝুলন ভিক্টোরিয়ায় কোনও দিন যায়নি। নিক্কো পার্ক দেখেনি। বিড়লা প্লানেটোরিয়ামে ঢোকেনি। আমি ঠিক করেছি, বিয়ের পর ওকে নিয়ে টোটো করে ঘুরব। সারা কলকাতা চিনিয়ে দেব। ওর সব শখ আহ্লাদ আমি পূরণ করব।

ট্রেন এসে থামল যতীন দাস পার্কে। দরজা খুলে যেতেই তিনজন হিজড়ে উঠে এল আমাদের কামরাতে। উল্টো দিকে লেডিস সিটটা ফাঁকা দেখে একটা অল্পবয়সী ছেলে তাতে বসে ছিল। জায়গা না পেয়ে হিজড়েদের একজন রূঢ়ভাবে বলে উঠল, "এই ঢ্যামনা, দেখছিস না আমি দাঁড়িয়ে আছি। সিট ছেড়ে ওঠ।"

ওভাবে কথা বলতে দেখে ঝুলন হেসে ফেলল। সেটা চোখে পড়ে যাওয়ায় লেডিস সিট থেকে অন্য একজন হিজড়ে রাগত স্বরে বলল, "দ্যাখ লো, মাগীটা আমাদের দেখে হাসছে।"

ঝুলনের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কামরায় অনেকেই বিরক্ত মুখে এ দিকে তাকিয়ে। পাতাল রেলের কামরায় এ ধরনের অসভ্যতা কেউ পছন্দ করেন না। কিন্তু হিজড়েদের মধ্যে কোনও ভাবান্তর নেই। ছেলেটা সিট ছেড়ে ওঠেনি। সে কড়া গলায় বলল, "উঠব কেন, তোমরা কি লেডিজ?"

"আ হা হা হা, কী বলে।" সুর করে হিজড়েদের একজন বলে উঠল, "দেখবি নাকি মিনসে? আমরা কী? অ্যাই ঢোলটা ধরত।" বলেই কাঁধ থেকে ঢোল নামিয়ে অন্য একজনের হাতে দিয়ে, সেই হিজড়েটা দু'হাতে শাড়ি ধরে অনেকটা উপরে টেনে তুলল।

ডানদিকে সিটে বসেছিলেন লম্বা চওড়া মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। উঠে এসে তিনি কড়া ধমক দিলেন, "অ্যাই হচ্ছেটা কী? অসভ্যতামি করলে এক ধাক্কায় পরের স্টেশনে নামিয়ে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'তিনজন যাত্রী উঠে এলেন। ভয় পেয়ে তিন হিজড়ে চুপ করে গেল।

ঝুলন আমার কাছে সরে এসে বলল, "এরা কী নোংরা টাইপের, তাই না?"

ফিসফিস করে বললাম, "সবাই না। চেতলায় হিজড়ের বস্তিতে থাকে, কয়েক জনকে আমি চিনি, খুব ভাল। আসলে কী জানো, অনেকেই তো ওদের দেখে হাসাহাসি করে, সেজন্য ওরাও আমাদের সব কিছু বাঁকা চোখে দেখে।"

ট্রেন এসে দাঁড়াল নেতাজি ভবন স্টেশনে। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল, লাল-নীল কিছু চেয়ার বসানো হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। বাহ, মনোময়বাবু তা হলে পাতাল রেলে চেয়ারের ব্যবস্থা করে ছাড়লেন। সত্যি, ভদ্রলোকের অধ্যবসায় আছে। কামরায় হুড়মুড়িয়ে একদল ছেলে-মেয়ে উঠল। স্কুলের পোশাক পরা। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বোধহয়। আজ তাই ছুটি নেই। ট্রেনটা ছাড়ার সময় নীচে ঘটাং ঘটাং শব্দ হল। মোটরে কোনও সমস্যা হলে এই রকম শব্দ হতে পারে। অনেক দিন আগে এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। মোটর বিগড়ে গিয়ে আগুন ধরে গেছিল তলায়। মনে মনে বললাম, আজ যেন সে রকম না হয়।

তাকিয়ে দেখলাম, ঝুলন খুব সমীহের চোখে দেখছে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলছে। হাসি-তামাশা করছে। ঝকঝকে চেহারার ছেলে-মেয়ে সব। এরাই বড় হলে কেউ আই এ এস হবে, কেউ পেশাদার, কেউ ব্যবসায়ী। আর আমাদের মতো সাধারণ লোকের উপর ছড়ি ঘোরাবে। চোখাচোখি হতে ঝুলন ফিসফিস করে বলল, "ওই লম্বা মতো মেয়েটাকে দ্যাখো। কী সুন্দর দেখতে, তাই না?"

বললাম, "তোমার মতো না।"

pathagar.net

হিজড়ের ধমক খেয়ে ঝুলন কেমন যেন সিঁটিয়ে গেছিল। এতক্ষণ পর হাসল। ঠিক ওই সময়টাতেই একটা পোড়া পোড়া গন্ধ এসে আমার নাকে লাগল। অনেক সময় হয় কী, চাকার ঘষটানিতে লাইন থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরয়। তার গন্ধও হতে পারে। এই ফুলকি থেকে একবার ট্রেনে আগুন লেগেছিল। তবে মারাত্মক কিছু ঘটেনি। কিন্তু আজ পোড়া গন্ধটা কামরায় ভেসে বেড়াতে দেখে আমার মনে খটকা লাগল। নীচে নিশ্চয়ই মোটরের কোনও কেবল পুড়ছে। না হলে গন্ধটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ত না।

জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রবীন্দ্র সদন স্টেশন আসছে। কামরার বেশ কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। রবীন্দ্র সদনে আজ অনুষ্ঠান আছে। হয়তো সেখানেই যাচ্ছেন। কলেজে পড়ার সময় আমি আর অমিয় একবার এই দিনে রবীন্দ্র সদন চত্বরে গেছিলাম। সেদিনই প্রথম সুচিত্রা মিত্রকে দেখি। এমন ভাল লেগেছিল ওঁর গান যে, এখনও আমি ওঁর ভক্ত।

হিজড়েগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজা খোলার ঠিক আগে হঠাৎ একজন ঘাড় ঘুরিয়ে ঝুলনকে বলল, "নাংয়ের কোলে বসে আমাদের দেখে হাসচিস। তোর সর্বনাশ হবে রে মাগী।"

অন্যজন সুর মিলিয়ে বলে উঠল, "হাঁ হাঁ, ঠিক বলেচিস।"

ঝুলনের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। হিজড়েগুলোর ইতরামি দেখে মাথায় রক্ত চড়ে

গেল। "বাস্টার্ড," বলে উঠে দাঁড়াতেই ঝুলন টেনে আমাকে বসিয়ে দিল। হিজড়েরা গালাগাল দিতে দিতে নেমে যাচ্ছে। কামরার বাকি দশ-বারোজন ওদের অভদ্রতা দেখে স্তম্ভিত। উল্টো দিক থেকে এক ভদ্রমহিলা রেগে বলে উঠলেন, "পাতাল রেলে এদের চড়তে দেওয়াই উচিত নয়। মেট্রো কালচারটা এরা নষ্ট করে দেবে।"

ট্রেন রবীন্দ্রসদন ছাড়ার কয়েক সেকেন্ড পরই পোড়া গন্ধটা এসে ফের নাকে লাগল। তারপরই সামনের কামরাগুলি থেকে গোলমালের শব্দ। আগুন। আগুন শব্দটা কানে আসা মাত্র উঠে দাঁড়ালাম। কটু গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। জানলা দিয়ে এই বার ধোঁয়া ঢুকতে দেখলাম। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই মোটর থেকে বেরচ্ছে। বাঁ দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, পাশের কামরা থেকে হুড়োহুড়ি করে প্যাসেঞ্জাররা এদিকে ছুটে আসছে। সবার চোখ মুখে আতঙ্কের ছাপ।

ঝুলন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, "কী হয়েছে গো?"

"আগুন লেগেছে।"

প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। মোটরম্যান বোধহয় ব্রেক কষেছে। আমি রড ধরে ধাক্কাটা সামলে নিলাম। ঝুলন ছিটকে পড়ল সিটের উপরে। ওকে তুলতে যাওয়ার আগে অন্য একজনের ধাক্কায় আমিও দরজার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সামনের দিকের প্যাসেঞ্জাররা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। নিজেকে সামলে আমি চিৎকার করে বললাম, "আপনারা ভয় পাবেন না। দাঁড়ান।"

এক ভদ্রমহিলা ঝুলনকে তুলে সিটে বসিয়েছেন। এক পলকে দেখে বুঝলাম, ওর বাঁ কাঁধে চোট লেগেছে। কামরায় কম বেশি সবাই আহত। একজনের মাথা ফেটে গেছে। সামনের কামরা থেকে আরও লোক এ দিকে আসছেন। ধোঁয়ার কটু গন্ধে অনেকে কাশতে শুরু করেছেন।

ভিড় ঠেলে একদম পিছনে গিয়ে রিয়ার মোটরম্যানের দরজায় ধাক্কা দিলাম। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। পাতাল রেলে আগুন লাগার কথা পাঁচ-ছয়বার শুনেছি। কিন্তু নিজে কখনও এই পরিস্থিতিতে পড়িনি। মনে হচ্ছে, মাঝমাঝি কোনও কামরার নীচে মোটর থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। এখুনি প্যাসেঞ্জারদের বের করে দেওয়া দরকার। রবীন্দ্রসদন স্টেশন খুব দূরে নয়। একশো গজ হেঁটে গেলেই প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে।

দু'চারবার ধাক্কা মারতেই দরজাটা খুলে গেল। মোটরম্যানের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল চন্দন। আমাকে দেখে বলল, "অর্ক! তুই?"

"কন্ট্রোলের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"এখুনি বললাম। থার্ড লাইনের কারেন্ট অফ করে দিয়েছে।"

"তুই তোর দিকের দরজাটা খুলে দে। সামনে আজ গাড়ি চালাচ্ছে কে?"

"রমাপ্রসাদ। ওদিককার প্যাসেঞ্জারদের অসুবিধা হবে। প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে ওদের ময়দান স্টেশনে যেতে হবে।"

দরজার সামনে ভিড় জমে গেছে। যাত্রীরা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছেন। ভিড়ের মাঝখান থেকে একটা মেয়ে কান্নাভেজা গলায় বলে উঠল, "যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমার মা কোলাপ্‌স করে যাচ্ছেন।"

মোটরম্যানদের কেবিনে এমার্জেন্সি ল্যাডার থাকে। চন্দন ইস্পাতের মইটা খুলে দরজায়

লাগানোর চেষ্টা করতেই আমি মাইকটা তুলে নিয়ে বলতে লাগলাম, "আপনারা অযথা ভয় পাবেন না। আগুন লাগেনি। মোটর খারাপ হওয়ার দরুন ধোঁয়া বেরচ্ছে। আমরা এখুনি রেসকিউ অপারেশন শুরু করব। প্লিজ, হুড়োহুড়ি করবেন না।"

যাত্রীদের মধ্যে থেকে দু'তিনটে ছেলে এগিয়ে এসে দরজা দিয়ে নীচে লাইনের উপর নেমে গেল। টানেলটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন। আমি কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে বললাম, "আগে বয়স্ক মানুষদের নেমে যেতে দিন। তারপর মেয়েরা। প্লিজ, আমাদের একটু সাহায্য করুন।"

পাঁচ-ছয়জন বয়স্ক মানুষকে নীচে নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা লাইনের ওপরই শুয়ে পড়লেন। রবীন্দ্র সদন স্টেশন থেকে দশ বারোজন স্টাফ চলে এসেছে। ওরাই একেকজনকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের দিকে। মই দিয়ে নামার সময় বাচ্চা কোলে একজন মহিলা পিছলে পড়ে গেলেন লাইনের উপর। বাচ্চাটার বোধহয় চোট লেগেছে। চিৎকার করে কাঁদছে। টানেলের ভেতর সেই কান্নার আওয়াজ শুনে হঠাৎই বুকটা কেঁপে উঠল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক এক করে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছি। ভাগ্যিস ছুটির দিনে হয়েছে। অন্যদিন এ সময়ে হলে হুড়োহুড়িতে পায়ের চাপেই অর্ধেক লোক চোট পেত। উল্টো দিক দিয়ে একটা ট্রেন টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। এদিকে হাওয়াটা ঘুরে গেল। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়াও সামনের দিকে চলে যেতেই কামরাটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এক ভদ্রলোক পাঁজাকোলা করে তুলে আনছেন ঝুলনকে। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আপনার স্ত্রী সেন্সলেস হয়ে গেছেন।" এই সেই ভদ্রলোক, যিনি প্রথম উঠে এসে ধমক দিয়েছিলেন হিজড়েদের।

সিটের উপর ঝুলনকে শুইয়ে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, "কপালে সামান্য চোট লেগেছে। ভয়ের কিছু নেই। পাশের কামরায় দু'একজন যাত্রী আছেন। আমি তাঁদের দেখছি।"

ঝুলনের দিকে তাকাতেই আমার গলার কাছে একদলা বাষ্প আটকে গেল। সকালে কী সুন্দর লাগছিল। এখন ওকে চেনা যাচ্ছে না। কপালের কাছে একটা জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। মুখটা আরও কালো হয়ে রয়েছে। চোখ দু'টো বোজা। ঠোঁট সামান্য ফাঁক করা। একদম সাদা হয়ে গেছে। হাতটা একপাশে ঝুলে আছে। প্রথম .....এই প্রথম ওর জন্য মনটা কেমন যেন করে উঠল।

কেবিন থেকে চন্দনের ওয়াটার বটল নিয়ে এসে ঝুলনের মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই ও চোখ খুলে বলল, "আমাকে ধরে একটু বসিয়ে দেবে অর্কদা? কপালটা টনটন করছে।" বলেই ও ফের চোখ বুজল।

যত্ন করে তুলে ওকে বসালাম। জানলায় মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে ও আমার একটা হাত আঁকড়ে ধরল। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে এল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ও বলল, "হিজড়েগুলোর কথাই সত্যি হয়ে গেল, অর্কদা।"

মোটরম্যানদের কেবিন দিয়ে বেশ কিছু লোক উঠে আসছে। তাদের মধ্যে একটা ছেলে আমার খুব চেনা। দেবাংশু, রবীন্দ্রসদন স্টেশনের চেকিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমাকে দেখেই বলল, "অর্কদা, আপনিও এই ট্রেনে ছিলেন নাকি?"

বললাম, "হ্যাঁ। এ আমার হবু স্ত্রী। কপালে চোট পেয়েছে। তোদের কাছে পমকা কিট আছে?"

পমকা কিট হল ফার্স্ট এইডের কিট। প্রত্যেকটা স্টেশনেই থাকার কথা। দেবাংশু বলল, "আছে। একজন ডাক্তারও এসে গেছেন। আপনি একে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যান। সামনের দিকের কামরায় কি আর কোনও প্যাসেঞ্জার আছেন অর্কদা?"

"আছেন মনে হয়। আমি নিজে কিছু লোককে নামিয়ে দিয়েছি। কোন কামরার তলায় মোটরটা খারাপ হয়েছে জানিস?"

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেবাংশু বলল, "পাঁচ নম্বর কামরায়। এসব ফল্টি রেকগুলো চালানোর কোনও মানে হয় অর্কদা? চন্দনটাও গাণ্ডু। এখন বলছে, টালিগঞ্জ থেকে ছাড়ার সময়ই ও বুঝতে পেরেছিল, একটা মোটর কাজ করছে না। তা হলে ছাড়লি কেন ট্রেনটা? ও বলল, শব্দ নাকি শুনতে পায়নি। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একবার দেখুন, কী অবস্থা। একজন হার্টের পেসেন্ট এমন ভয় পেয়ে গেছেন, এখন হেঁচকি তুলছেন। ভদ্রমহিলার মেয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। স্টেশনে আলাদা একটা ঘর পর্যন্ত নেই, যেখানে ট্রিটমেন্ট করা যায়। ওপরে রাস্তায় এ রকম কোনও ঘটনা ঘটলে এতক্ষণে ভাঙচুর শুরু হয়ে যেত।"

বললাম, "ও সব কথা বলে এখন লাভ কী? যা, দ্যাখ অন্য কামরায় কেউ পড়ে আছে কি না।"

দেবাংশু সামনের দিকে চলে যাওয়ার পর ঝুলনকে কোলে তুলে নিলাম। ভাগ্য ভাল, সামনের কোনও কামরায় উঠিনি। উঠলে ময়দান স্টেশন পর্যন্ত প্রায় মাইল খানেক হাঁটতে হত। দু'পাশের দেওয়াল এত কাছে, সামনের কামরার লোকদের পিছনে আনা সম্ভব না। দমকল কর্মীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মোটরে জল দেওয়া শুরু করেছেন। বড় ধরনের আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা এখন আর নেই।

ঝুলনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মে এলাম। যাত্রীদের অনেকেই শুয়ে অথবা বসে আছেন। একদল যাত্রী ঘিরে ধরেছেন স্টেশনের এস এস কানাইদাকে। তুমুল তর্কাতর্কি চলছে ওই ভিড়ের মাঝে। একটা ছেলে চিৎকার করে কী যেন বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে গেল। রেল পুলিশের একজন, ছেলেটাকে ধাক্কা মারতে মারতে ভিড়ের বাইরে নিয়ে এলেন। সারা দিনে দশটা রেক দিয়ে পাতাল রেল চালানো হচ্ছে। দরকার চোদ্দটা। ফলে রেকগুলো যথেষ্ট বিশ্রাম পাচ্ছে না। যান্ত্রিক গোলযোগ তো হবেই। এ কথা এখন কে বোঝাবে যাত্রীদের? বোঝাতে গেলেও কেউ শুনবে? ও দিকে মন না দেওয়াই ভাল।

প্ল্যাটফর্মে উঠে সিঁড়ির উপর মিনিট পাঁচেক বসে রইল ঝুলন, তারপর বলল, "জানো অর্কদা, ধোঁয়ায় একটা সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, আমি বোধহয় আর বাঁচব না। তখন মনে মনে কালীমাকে ডাকতে শুরু করলাম। তারপর আর জানি না।"

"এখন একটু ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ। তোমার যে কিছু হয়নি, এতেই আমার শান্তি।"

"চল, তা হলে ট্যাক্সি করে দক্ষিণেশ্বরে যাই।"

"না। একবার বাধা পড়েছে। আজ আর যাব না। তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।"

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। গেট পেরিয়ে কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় দেখি কানাইদা। হন্তদন্ত হয়ে নীচের দিকে যাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "এই অর্ক, খবরটা শুনেছিস? তোদের ওখানে তো মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে রে!"

ঠিকাদারদের স্টাফরা কি তা হলে স্টেশন ভাঙচুর করল? বললাম, "কী হয়েছে কানাইদা?"

"তোদের ইন্দ্রদাকে তো আজ পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।"

কানের ভেতর যেন কেউ লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল। আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কানাইদার দিকে। বলছেন কী? ইন্দ্রদাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে! কিন্তু কেন?

কানাইদা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। নিজেই বললেন, "কেন জানিস? তোদের সেই ডাকাতিতে ইন্দ্রর নাকি যোগসাজশ ছিল।"

১৯

ঝুলন পুজো দিতে গেছে শেতলা মন্দিরে। সেই সুযোগে নিজের জামা-কাপড় সার্ফে ভেজাচ্ছি। এমন সময় হাজির হল অমিয় আর আরতি। আমার পরনে শুধু পাজামা। তাও ভিজে একশা। ওই অবস্থায় আমাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল আরতি। বলল, "অর্কদা, আপনাকে দেখে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে।"

ইদানীং আমাকে জামাকাপড় কাচতে দেয় না ঝুলন। বেড কভার, বালিশের ওয়াড় এমনকী টেবল ক্লথটাও ধোপা বাড়ি দিতে দেয় না। পাছে ওর কষ্ট হয়, সে জন্য ওর অনুপস্থিতিতে কাজটা সারছিলাম। ধরা পড়ে গিয়ে বললাম, "কষ্ট পাচ্ছ বোলো না। তার চেয়ে বলো, খুব মজা পাচ্ছ।"

আরতি বলল, "ঠিক বয়েসে বিয়ে না করলে ছেলেদের এই হয়। বাসন-টাসনও আপনাকে মাজতে হয় নাকি?"

"না। এখনও সেই লেভেলে নামিনি। গঙ্গার মা বলে একজন আছেন। তিনিই ওই কাজটা করে দিয়ে যান।"

"আপনার বন্ধু কী আরামে আছে বলুন তো। একদিন অন্তর জামা প্যান্ট ছেড়ে হুকুম দিচ্ছে, কেচে রেখো। বউ পোষার কত সুবিধে বলুন।"

ওদের ঘরে এনে বসালাম। অমিয় বলল, "বউ পোষার জন্য সাহস দরকার হয় বুঝলে। অর্কর সেই সাহসটাই নেই। ওর বুলুদিই ওর সর্বনাশটা করে দিয়েছে।"

কথাটা মিথ্যে বলেনি অমিয়। আমার জীবনের খুঁটিনাটি সব ও জানে। ও না থাকলে আমি একেবারে বখে যেতাম। মাঝে বেশ কিছুদিন অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ সাত সকালে বেহালা থেকে হঠাৎ কেন চেতলায় এসে হাজির হল, বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই কোনও দরকারে এসেছে। মুখ দিয়ে দুম করে বেরিয়ে গেল, "তোরা কি এদিকে কোথাও এসেছিলি?"

আরতি বলল, "জানি, ঠিক এই প্রশ্নটা আপনি করবেন। কেন, আপনার কাছে কি এমনি আসতে পারি না?"

"ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। এমনি এসেছ।"

চট করে পাজামাটা বদলে, গায়ে পাঞ্জাবিটাও চাপিয়ে নিলাম। তারপর আড্ডার মেজাজে বসে গেলাম ওদের সঙ্গে। অমিয় আর আরতি দু'জনেই আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। হঠাৎ অমিয় বলল, "অর্ক, তুই তা হলে বেশ ভাল আছিস।"

pathagar.net

সত্যি বলতে কী, প্রশ্নটায় আমি একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেলাম। অমিয়র খচরামির ধরনধারণ আমি জানি। প্রশ্নটায় একটু প্যাঁচ আছে। তবুও বললাম, "হাতে একটু ব্যথা হচ্ছিল। এখন নেই।"

অমিয় বলল, "আরতি তোকে কিছু বলার জন্য এসেছে।"

"ন্যাকামি কোরো না তো।" আরতি বলল, "তুমিই যা জিজ্ঞাসা করার, করে ফেলো না।"

"আমি হরগিজ জিজ্ঞেস করব না। তুমি করো।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা কী বল তো?"

আরতি বলল, "অর্কদা, আমার এক খুড়তুতো বোন আছে। আপনি আমাদের বিয়ের সময় দেখেছেন। মল্লিকা। আপনার পিছনে খুব লেগেছিল যে মেয়েটা। মনে পড়ছে?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমি একবার কাউকে দেখলে, ভুলি না। আগে বাড়ো।"

"ওর বাবা, মানে আমার কাকার খুব পছন্দ আপনাকে। অমিয়কে খুব করে ধরেছে। মল্লিকার সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে চান।"

এই ধরনের অনুরোধ আমি পাত্তাই দিই না। কিন্তু আরতিকে সরাসরি কিছু বলা যাবে না। তাই বললাম, "এখন আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না।"

অমিয় বলল, "কেন?"

"পরের বাড়িতে থাকি। এখানে অনেক ঝামেলা।"

আরতি বলল, "সে কথাটা আমরা কিন্তু আগেই ভেবেছি। মলি-র বিয়েতে কাকা তেমন হলে একটা ফ্ল্যাটও দিয়ে দেবেন। ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।"

মেয়েটা আপনার পছন্দ কি না, বলুন। অবশ্য মলিকে অপছন্দ করার কোনও কারণ নেই। অমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে চট করে পাবেন না। আমারও খুব ইচ্ছে, আপনি আমার বোনটাকে বিয়ে করুন। তা হলে আপনার সঙ্গে অমিয়র সম্পর্কটা সারা জীবন থাকবে।"

আরতির কথার জালে আমি খেই হারিয়ে ফেললাম। স্বামী-স্ত্রী বেশ যুক্তি করেই এসেছে। মলিকে পছন্দ নয় বললে ওরা অসন্তুষ্ট হবে। আবার পছন্দ বললে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করবে, তখন আমার ভাল লাগবে না। তাই বললাম, "আরতি কিছু মনে করো না। বিয়ের ব্যাপারে আমি ঠিক মনের দিক থেকে এখন তৈরি নই।"

সোফায় বসে ছিল অমিয়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "শালা, টেনে এক লাথি মারব তোর পাছায়। মিথ্যুক কোথাকার।"

অমিয়কে খেপে উঠতে দেখে অবাক হয়ে বললাম, "তোর আবার কী হল হঠাৎ?"

"মিথ্যে কথা বলতে তোর লজ্জা করল না? আমাকে লুকিয়ে বিয়ে করছিস। অলরেডি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ফেলেছিস। তোর বিয়ের কথা আমাকে শুনতে হল দেবাংশুর মুখে? ছিঃ অর্ক। তোর কাছে এটা অন্তত আমি আশা করিনি।"

আমি চূড়ান্ত অপদস্থ হয়ে বললাম, "সরি অমিয়, তোকে আমি সব কথা বলতাম। সব শুনলে তুই হয়তো আর রাগ করতে পারবি না। প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করে দে।"

আরতি বলল, "কাল রাতে অমিয় যখন বাড়ি ফিরল, তখন দেখি ওর মুখটা থমথম করছে। কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাচ্ছি না। মা আর বাবা দিদির বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বাড়িতে এখন আমরা দু'জন। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ও বলল, জানো আরতি,

অর্কটা বিয়ে করছে। আমাকে জানাল পর্যন্ত না? এই আমাদের বন্ধুত্ব? তখন আমি বললাম, চলো, কাল সকালেই গিয়ে ধরব। অমিয় তো আসতে চাইছিল না। আমি জোর করে ধরে আনলাম।"

অমিয়র রাগ কমেনি। বলল, "আমি তো ঠিক করে ফেলেছিলাম, তুই বিয়ের কার্ড দিতে গেলে মুখের উপর ছিঁড়ে ফেলব।"

বললাম, "সরি অমিয়, সব থেকে আগে তোকেই আমার জানানো উচিত ছিল। আমি একটা জ্যামের মধ্যে আটকে গেছি। তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ নেওয়া দরকার।"

আরতি বলল, "থাক অর্কদা। এতবার আপনাকে সরি বলতে হবে না। এবার আসল খবরটা দিন। মেয়েটা কে? আমাদের সঙ্গে বনবে?"

বললাম, "একটু অপেক্ষা করো। এখুনি আসবে।"

"কতদিনের আলাপ অর্কদা?"

"পাঁচ ছ'বছর তো হবেই। পরিচয় হয়েছে, আমি বেহালা থেকে আসার পরেই। তবে প্রেমটা মাস চারেক ধরে।"

"মাই গড। এতদিন ধরে মেয়েটাকে চেনেন, অথচ আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি? নাম কী?"

"ভাল নাম অর্পিতা।"

"কোথায় থাকে?"

"কাছেই। খুব কাছে।"

"দেখতে কী রকম অর্কদা?"

pathagar.net

সদর দরজায় কলিংবেলটা বেজে উঠল। দু'বার। তার মানে ঝুলন এসে গেছে। আমি সোফা ছেড়ে উঠে বললাম, "এখনই নিজের চোখে দেখতে পাবে। ও এসে গেছে।"

দরজা খুলে দিতেই দেখি, ঝুলন। পরনে গরদের শাড়ি। সকালে স্নান সেরে পুজো দিতে গেছে। ওকে সদ্য ফোঁটা একটা ফুল বলে মনে হচ্ছে। উঠোনে পা দিয়েই হাতের প্রসাদী থালা থেকে ফুল তুলে নিয়ে বলল, "দাঁড়াও, ফুলটা আগে মাথায় ছুঁইয়ে দিই। অফিসে যাওয়ার সময় পুরুতমশাইকে দশটা টাকা প্রণামী দিয়ে যেও। পুজো দেওয়ার পর দেখি, আমার কাছে একটা পয়সা নেই।"

আমার মাথায় ফুল ছুঁইয়ে রকে উঠতেই ঝুলন দেখতে পেল আরতিকে। থালাটা টুলের উপর রেখে দ্রুত পায়ে ঘরের কাছে গিয়ে ও বলল, "আরতিদি তুমি। কখন এলে?"

"অনেকক্ষণ। সব শুনেছি। শেষপর্যন্ত তুই?"

ঝুলন চমকে উঠে আমার দিকে একবার তাকাল। চোখের ইশারায় বললাম, হ্যাঁ। অমিয়কে দেখে লজ্জায় ওর মুখটা ক্ষণিকের জন্য লাল হয়ে উঠেও ফের স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিজেকে সামলে ও বলল, "তোমরা বোসো। আমি চট করে চা নিয়ে আসি।"

অমিয়র রাগ বোধহয় ঝুলনকে দেখে কমেছে। বলল, "এত বড় একটা খবর শোনার পর শুধু চা?"

"কী খাবেন বলুন, করে দিচ্ছি।"

"লুচি-তরকারি ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।"

আরতি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, "থামো তো। তোমার শুধু খাওয়া। আয় ঝুলন। আমার কাছে বোস। কী করে সব হল, বল তো আমাকে। আমরা সবাই বন্ধু। তোর লজ্জা করার দরকার নেই।"

মুখ নিচু করে ঝুলন বলল, "আমি কিছু জানি না।"

অমিয় বলল, "জানো না মানে? অর্কর সঙ্গে আমাদের চুক্তিই আছে। প্রেমে পড়লে সব কথা বলবে। আগে তোমার মুখ থেকে সব শুনি। তারপর ওকে ধরব।"

"না। ওকে আগে ধরুন। তারপর আমি বলব।"

আরতি বলল, "কী রকম চালাক মেয়ে দেখেছ? আমিই বোকা। তখন অর্কদা আমার পেট থেকে কথা বের করে নিত। বাসে কথা বলতে বলতে একেকদিন বেহালা চৌরাস্তা পর্যন্ত চলে যেত। আমি ভাবতাম, বাব্বা, অমিয়র সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব যে ওর জন্য ছেলেটা ফের চারটে স্টপেজ হেঁটে বাড়ি ফিরবে?"

গল্পের গন্ধে ঝুলন ঘুরে বসেছে। বলল, "অমিয়দা তোমাকে প্রোপোজ করেছিল, না তুমি?"

"তোর মাথা খারাপ? ও তখন এমন চিমসে মার্কা ছিল, আমি কেন, আমাদের সেন্ট টেরিজার কোনও মেয়েই ওর দিকে তাকাত না। আজকের কথা নাকি? তখন ও ক্লাস টেন, আর আমি সেভেনে পড়ি। আমাদের স্কুলের সামনে গিয়ে মাঝে মধ্যেই লাইন মারত। সঙ্গে থাকত অর্কদা।"

অমিয় বলল, "অর্ক, আরতি কিছু ভুল বললে তুই কিন্তু শুধরে দিস।"

ঝুলন উৎসাহ দেখিয়ে বলল, " তারপর কী হল?"

আরতি বলল, "আরে, একবার পুজোর সময় আমরা কয়েকজন মিলে জেমস লঙ সরণিতে সদার ঠাকুর দেখতে গেছি। সেখানে দেখি, দুই মূর্তি হাজির। তখন এই অর্কদাই যেচে এসে আলাপ করল। ব্যস, তারপর একদিন এনে দিল অমিয়র চিঠি। সে কী ইংরেজি! আমার বন্ধুরা তো হেসে অস্থির। বলল, সেন্ট টমাসের যা স্ট্যান্ডার্ড, আর কত ভাল হবে? তবুও উত্তর দিলাম আমি।"

এই সময় অমিয় বলল, "অর্ক, কারেক্ট করে দে।"

আমি হাসতে লাগলাম। দশ-বারো বছর আগেকার কথা। তবুও সব মনে আছে। কী সুন্দর ছিল ওই দিনগুলো। অমিয়টা একটু ভীতু টাইপের ছিল। আমিই ওকে সাহস জোগাতাম। ও সচ্ছল পরিবারের ছেলে। প্রেম করা ওকে মানাত। আরতি যেদিন প্রথম আমাকে রাখী পরিয়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই ওকে আমার ভাল লেগে গেছিল। ওদের বিয়ের আগে, আমাকে কম হ্যাপা পোহাতে হয়েছে? অমিয়র বাবা গোঁ ধরে ছিলেন, রাস্তা-ঘাটে চড়ানি মেয়েকে কিছুতেই বাড়িতে আনবেন না। শেষপর্যন্ত আমাকে অনেক বোঝাতে হয়েছিল। এখন উনি আরতি বলতে অজ্ঞান।

ঝুলনও খুব মজা পেয়ে গেছে। খুঁচিয়ে পুরনো দিনের কথা তুলছে। বলল, "আরতিদি, অর্কদা কারও সঙ্গে প্রেম করত না?"

"না রে। আমি চেষ্টা করেছিলাম। সেন্ট টেরিজায় পৃথা বলে একটা মেয়ে পড়ত। ওকে ভিড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অর্কদা পাত্তাই দিল না। অমিয়ও চেষ্টা করেছিল। ওদের পাড়ার শুক্লা বলে একটা মেয়ের ব্রিফ নিয়েছিল। সেই মেয়েটাকে বাঁচাতে গিয়ে অর্কদা একবার মরে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই প্রেম করল না। তুই কী করে লোকটাকে পটালি বল

তো?"

"ইস, আমার বয়ে গেছে পটাতে।"

"তা হলে কী করে সব হল। হঠাৎ কী এমন ঘটল?"

"আমার খুব অসুখ করেছিল। দিদিভাইরা কেউ বাড়িতে ছিল না। ও-ই আমাকে সারিয়ে তোলে...।"

এ পর্যন্ত শুনে অমিয় বলল, "একেবারে শরৎচন্দ্রের প্লট।"

ওকে থামিয়ে দিয়ে আরতি বলল, "আহ, তুমি থামো তো। মেয়েটা সবে বলতে শুরু করেছে, এমন সময় বাধা দিচ্ছ।"

"আর একটা কথাও তুমি ওর পেট থেকে বের করতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমার লুচি তরকারির দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাইকটা বরং এবার অর্ককে দাও।

ঝুলন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কিচেনে যাচ্ছি আরতিদি। চাও, তো আসতে পারো।"

দু'জনে রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর অমিয় আমাকে বলল, "গুড চয়েস, অর্ক। তুই ঠিক ডিসিসন নিয়েছিস। বুলুদি বা দিবাকরদা জানে?"

বললাম, "বুলুদি জানে না।"

"তোর বাবার মত আছে?"

"বাবা আপত্তি করবেন না।"

"বিয়েটা কবে করছিস?"

"জানি না।"

"কেন, আর কোনও সমস্যা আছে?"

"বিরাট একটা সমস্যা।" বলেই বুলুদির কথা বলতে শুরু করলাম। অমিয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করতে লাগল। আর্মস স্মাগলাররা যে আমাদের যে কোনওদিন বিপদে ফেলতে পারে, সেটা আন্দাজ করে অমিয় বলল, "পুলিশের কাছে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ। দুর্গা আমাকে ডি সি ডি ডি-র বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, ভদ্রলোক আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। পুলিশ অবশ্য খোঁজখবর নিচ্ছে। সুখবিন্দরের পিছনে লোক লাগিয়ে দিয়েছে। বুলুদি বাংলাদেশ থেকে ফিরলে তখন বোঝা যাবে, প্যাকেটগুলো এ বাড়িতে কারা দিয়ে যাচ্ছিল।"

"অর্ক, তোকে আগেও বলেছি, আবার বলছি, এই মহিলাটাকে তুই ছাড়। বুলুদি কলকাতায় ফেরার আগেই জিনিসপত্র নিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যা। কেন তুই ওর জন্য বিপদে পড়বি?"

"না রে; তা হয় না। একটা সময় বুলুদি আমাকে মানুষ করেছে। এতটা অকৃতজ্ঞ আমি হতে পারব না।"

"ধর, তুই অফিসে আছিস। এমন সময় বাড়িতে এসে মাফিয়ারা যদি জোর করে ঝুলনকে তুলে নিয়ে যায়, তখন কী করবি?"

"সে কথাটা আমরা আগেই ভেবেছি। আমি অফিসে যাওয়ার সময় ঝুলনকে তাই রেখার বাড়িতে রেখে যাচ্ছি। ফেরার সময় আবার নিয়ে আসছি।"

"এই রেখা মেয়েটা কে?"

"এ পাড়াতেই থাকে। ঝুলনের বন্ধু।"

"কাউকে বিশ্বাস করিস না অর্ক। চাপের মুখে মেয়েদের বন্ধুত্ব ঠুনকো হয়ে যায়। বুলুদি

কবে ফিরবে রে?”

“ঠিক জানি না।”

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল অমিয়। তারপর বলল, “সব শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, আসল কালপ্রিট কিন্তু সুখবিন্দর না। ওর পিছনে আরও কোনও বস আছে। তারাই আর্মস ট্র্যাফিকিং করে। তোর বুলুদি টাকা পয়সার লোভে তাদের খপ্পড়ে পড়ে গেছে।”

“হতে পারে।”

“টাকা পয়সার লোভটা এত খারাপ, দেখলি তো ইন্দ্রদার কী পরিণতি হল। ভাবাই যায় না, ওর মতো একটা লোক এখন পুলিশ হাজতে।”

“সত্যি আমি শকড্। এতদিন পাশাপাশি কাজ করেছি, অথচ কখনও মনে হয়নি, লোকটা এমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন। ডাকাতিটা হওয়ার সময় ইন্দ্রদা ইচ্ছে করলে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতে পারত। তখন বুঝিনি, পরে ভেবে দেখেছি, বাথরুম থেকে উঁকি মারার সময় ইন্দ্রদার চোখমুখে কিন্তু কোনও ভয়ের চিহ্ন দেখতে পাইনি। তার একটু আগে আমাকে দেখিয়ে সিন্দুকের চাবিটা হেলাফেলা করে ড্রয়ারে ফেলে রাখলেন। ডাকাতরা যখন চাবিটা চাইল, তখন উনি নিজেই ড্রয়ারটা খুলে দিলেন। আসলে উনি ভাবতেই পারেননি, আমি বাথরুমে থাকব এবং ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ব। উনি ভেবেছিলেন, আমি বোধহয় বাড়িতে চলে এসেছি।”

“মেট্রো ভবনে শুনলাম, ইন্দ্রদাকে নজরে রাখার টিপ্সটা পুলিশকে নাকি তোদের সুজয়ই দিয়েছিল। ইন্দ্রদা যে বারো লাখ টাকার একটা ফ্ল্যাট কিনছে, সেই খবরটা পুলিশকে বলেছিল সুজয়। তারপর পুলিশ খোঁজখবর করে দেখে, কথাটা সত্যি। ডাকাতির ওই দিনই প্রোমোটারকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল ইন্দ্রদার। সিন্দুকে তখন কত টাকা ছিল ইন্দ্রদা জানত। ভেবেছিল, ডাকাতির বখরাটা নিয়ে প্রোমোটারকে টাকাটা দিতে পারবে। তোর জন্য হল না।”

“যে ছেলেগুলো ডাকাতি করতে এসেছিল, তারা কারা? ইন্দ্রদার সঙ্গে ওদের যোগাযোগই বা হল কোত্থেকে?”

“পুলিশ খুঁজে বের করেছে। যে মহিলাটির জন্য ইন্দ্রদা ফ্ল্যাটটা কিনছিল, তার মেয়ের বন্ধু এই ছেলেগুলো। একটা ছেলের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। সে-ই তোকে গুলি করে পালিয়ে যায়। বাকি দু'টি ছেলে অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছিল। পুলিশের থার্ড ডিগ্রি খেয়ে সুড়সুড় করে সব বলে দিয়েছে।”

“তুই এত খবর জানলি কী করে অমিয়?”

“মেট্রো ভবনে তো এখন আমাদের ইউনিয়নে শুধু এই আলোচনাই হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর জেল হয়ে যাবে, দেখিস ইন্দ্রদার। এতদিনের চাকরি। কোনও বেনিফিট পাবে না। শুনলাম, ইন্দ্রদার ছেলেটা মুম্বই থেকে এসেছিল। সে বলেছে, কোনও দিন বাবার মুখদর্শন করবে না।”

“একটা কথা তা হলে ঠিক, পুলিশ ইচ্ছে করলে সব অপরাধীকে ধরতে পারে।”

“অফকোর্স পারে। তুই খোঁজ নিয়ে দেখিস, পুলিশ কিন্তু তোদের এই ব্যাপারটাতেও অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। দেখবি, বুলুদিও পার পাবে না। কে বলতে পারে, তোর দিবাকরদা কিছু আন্দাজ করেছিল বলেই হয়তো, আগেভাগে কেটে পড়ল। যদি তা হয়,

আমি তো বলব, ঠিক কাজই করেছে।"

"তুই তা হলে আমাকে কী করতে বলছিস?"

"কালই এ বাড়ি থেকে ঝুলনকে নিয়ে কেটে যা। ঝুলনকে যদি তুই নিয়ে যেতে না পারিস, তা হলে আমার বাড়িতে গিয়ে ও ক'দিন থাকুক।"

"পুলিশকে জিজ্ঞেস না করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?"

"তা হলে জিজ্ঞেস কর। আজই না হয় একবার ডি সি ডি ডি-র কাছে চলে যা। গিয়ে বলে আয়, মনোময়বাবুর বাড়িতে থাকবি।"

অমিয়র কথা শেষ হতে না হতেই ঝুলন খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্লেটে লুচি, তরকারি, মিষ্টি। সকালে কিছু খাওয়া হয়নি। দেখেই খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। ঝুলন গরদের শাড়িটা পাল্টে এসেছে। এখন ওর পরনে নীল রঙের তাঁতের শাড়ি। অমিয়রা না থাকলে ওকে এতক্ষণে পাঁজাকোলা করে বিছানায় তুলে আনতাম। ওর দিকে তাকালেই ইচ্ছেটা জাগছে। তাই চোখটা সরিয়ে নিলাম। আরতি অভিজ্ঞ মেয়ে। ধরে ফেলবে।

অমিয় জিজ্ঞেস করল, "এতক্ষণ তোমরা কী গল্প করছিলে আরতি?"

"অর্কদার সব কীর্তিকলাপ শুনলাম।" মুখ টিপে হেসে কথাটা বলল আরতি। তারপর অমিয়র পাশে গিয়ে বসল।

"কীর্তিকলাপ মানে?" অমিয় আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই অর্ক, বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আবার ও সব কিছু করিসনি তো?"

ঝুলন কতটা কী আরতিকে বলেছে, জানি না। তাই পাল্টা আক্রমণের সুরে বললাম, "নিজের চরকায় তেল দে। বিয়ের ছ'মাস হয়ে গেছে, এখনও কিন্তু কোনও রেজাল্ট দেখতে পেলাম না।"

আরতি বলল, "দেখব, আপনি কত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট বের করতে পারেন।"

কথাগুলো শুনে ঝুলন খুব মজা পাচ্ছে। আমাদের মধ্যে এ সম্পর্কটা আগে কখনও ও দেখেনি। বিয়ের পর অমিয় একবার আরতিকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সে বার আরতির সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেই ঝুলন উঠে গেছিল। আজ ওর চোখে আরতিরা অন্যরকম। তাই ও মানানসই হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি জানি, রান্নাঘরে কথা বলতে বলতে ওরা এখন বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। পিছনে লাগার জন্য বললাম, "ঝুলন তো বলছে, ছয় মাসের মধ্যে রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে।"

"এই, আমি আবার কবে এ সব বললাম?" ওর গলায় ছদ্ম রাগ, "বানিয়ে বানিয়ে বললে আমি কিন্তু উঠে যাব।"

অমিয় বলল, "যদি বলেই থাকো, তা হলে অন্যায়টা কী করেছ?"

"তার মানে? আপনি ধরে নিয়েছেন আমি বলেছি।"

"তা হলে ঠিক কী বলেছ, একবার আমায় বলো তো?"

"আমি কিচ্ছু বলিনি।"

"তা কখনও হয়? এই তো অর্ক আমাকে এখুনি একটা কথা বলল। তুমি নাকি কবে বলেছ, আমি তোমাকে কোনওদিন কোনও কষ্ট দেব না, অর্কদা। শুধু ভালবেসে যাব। বলো, তুমি বলোনি?"

"বিয়ের আগে আরতিদি বোধহয় এই ডায়লগ দিয়েছিল আপনাকে, তাই না?"

অমিয় খানিকটা পিছু হটে বলল, "না। ঠিক এই ডায়লগটা দেয়নি। তবে বলেছিল,

তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।"

"আপনি তখন কী বলেছিলেন?"

"বলার সুযোগই পাইনি। নীচ থেকে বাবা তখনই কর্ডলেসটা তুলে সুইচ অন করেছিলেন। আর শব্দটা শুনে আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, মা এখন বাড়িতে নেই। আপনি পরে ফোন করবেন। বলেই ফোনটা রেখে দিয়েছিলাম।"

অমিয়র বলার ভঙ্গিতে আমরা তিনজন হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসি থামিয়ে আমি বললাম, "এই ঘটনার কথা তো তুই আমাকে আগে কখনও বলিসনি অমিয়?"

আরতি বলল, "ওর আরও অনেক কীর্তি আছে। শুনবি ঝুলন? হাসতে হাসতে তোর পেটে খিল ধরে যাবে।"

আড্ডার মাঝেই হাতের কাজটা আমরা সারতে লাগলাম। লুচি-তরকারি আমার প্রিয়। কিন্তু বাড়িতে খুব কম জোটে। একটা সময় অমিয় আর আমি যখন ওদের বাড়িতে পড়াশুনো করতাম, তখন মাসিমা প্রায়দিনই লুচি-তরকারি করে দিতেন। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, ঝুলন কোনওদিন আমার সামনে বসে খেতে চায় না। আজ কিন্তু দিব্যি সবার সঙ্গে বসে খাচ্ছে। পরিবেশ মানুষকে অনেকটাই পাল্টে দেয়।

খেতে খেতে অমিয় বলল, "অর্ক, পরে অনুষ্ঠান করে যখন বিয়ে করবি, করিস। আমি বলি কী, রেজেস্ট্রি বিয়েটা আগে করে ফ্যাল।"

আমি কী উত্তর দিই, তা শোনার জন্য ঝুলন মুখ নিচু করে রয়েছে। বললাম, "করে নেওয়া যায়। তোর জানাশোনা কেউ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন?"

"কেন, দিলুই তো আছে। দিলীপ সেনগুপ্ত। তোর মনে নেই, আমাদের বাড়ির পিছন দিকেই যে ছেলেটা থাকত। ল পাশ করে কয়েক বছর প্র্যাকটিস করল। এখন দেখছি, বাড়িতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে লোকের বিয়ে দিচ্ছে। ওর জন্যই বেহালার জনসংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেল।"

ঝুলন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তার মানে?"

"মানেটা বুঝলে না? যাদের বিয়ে হচ্ছে, তাদের তো পরের বছরই বাচ্চা হচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ছে কি না, বলো?"

ঝুলন খিলখিল করে হেসে উঠল। অমিয় যে আজ বেশ মেজাজে আছে, তা বোঝা যাচ্ছে। প্রসঙ্গ টেনে বলল, "তুই যদি বলিস, তা হলে যে কোনও দিন দিলুকে ধরে আনতে পারি। রেজেস্ট্রিটা করে রাখ। পারলে তোর বুলুদি ফিরে আসার আগেই। ওই মহিলাকে আমি বিশ্বাস করি না। এসে তোর সামনে এমন সমস্যা দাঁড় করাবে, তখন তোর বিয়ে করা লাটে উঠবে।"

বললাম, "এক মাসের নোটিশ দেওয়ার কী একটা নিয়ম আছে না?"

অমিয় বলল, "ধূর, ও সব অন্যদের জন্য। আজ চাইলে তুই আজই বিয়ে করতে পারিস। দিলু ম্যানেজ করে দেবে। আমি রাতের দিকে ওর সঙ্গে কথা বলে রাখব। তোদের ফোনটা কি ঠিক আছে? রাতের দিকে ফোন করে তোকে তা হলে বলে দেব।"

আরতি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, করে ফেলুন। বিয়ে যখন করবেনই ঠিক করেছেন, তখন দেরি করে লাভ কী?"

অমিয়কে বললাম, "রবিবার বিকেলের দিকেই তা হলে ব্যবস্থা কর।"

"এক্সেলেন্ট। সই সাবুদটা তা হলে আমাদের বাড়িতেই হোক। কী রে অর্ক, ফাইনাল

তো? পরে মত বদলাবি না কিন্তু।"

ঝুলন আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। আমার বুকটা টনটন করে উঠল। আমার হ্যাঁ বা না-এর ওপর ওর মনে বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস জন্মাবে। দেরি না করে বললাম, "তুই দিলুকে আসতে বলিস। আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।"

কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়াল আরতি। বলল, "তা হলে কাজটা আমাদের সামনে সেরে ফেলুন। আজ আমি ছাড়ছি না।"

"কোন কাজটা, আরতি?"

"ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? আমাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার দিন, অমিয়কে দিয়ে কী করিয়েছিলেন, আপনার মনে নেই?"

মনে আমার ঠিকই রয়েছে। অমিয়র বাবার সঙ্গে আমরা যেদিন আরতিদের বাড়িতে বিয়ের পাকা কথা বলতে যাই, সেদিন আশীর্বাদের পর দু'জনকে চিলেকোঠায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের বাধ্য করেছিলাম, আমার সামনে চুমু খেতে। আরতি বলেছিল, "ঠিক আছে আমি রাজি। তবে বিয়ে ঠিক হলে আপনাকেও কিন্তু এ কাজটা আমাদের সামনে করতে হবে।" ও ভোলেনি।

"কী হল অর্কদা, উঠুন। ভদ্রলোকেরা কিন্তু কথা রাখে। যান, ঝুলনের পাশে গিয়ে বসুন।" আরতি জোর করে আমাকে টেনে তুলল।

ঝুলন অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আগে বললে ও কিছুতেই চুমু দিতে রাজি হবে না। আর একবার ও যদি বেঁকে বসে, তা হলে আমার প্রতিশ্রুতি রাখা যাবে না। বিদ্যুৎগতিতে ওর মুখটা টেনে এনে ঠোঁটে আমার ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম। আরতি হাততালি দিয়ে বলল, "যাক, তা হলে আপনি কথাটা রাখলেন।"

ঝুলন রেগে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কলিংবেলটা বেজে উঠল।

এই সময় তো কারও আসার কথা নয়? তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। আমার নামটা জিজ্ঞেস করে, উনি একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন। ডি সি ডি ডি-র লেখা, "কাম টু মাই প্লেস অ্যাট ওয়ান্স।"

২০

সকালে অফিসে বেরনোর জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় মনোময়বাবুর ফোন। "অর্ক ভাই, আমাদের বাড়িতে একটু আসতে পারবে?"

বললাম, "খুব জরুরি?"

"হ্যাঁ। একটা কথা বলার ছিল।"

"কী ব্যাপার বলুন তো। মাসিমা ঠিক আছেন?"

"মাসিমা ভাল আছেন। দরকারটা তোমার সঙ্গে। কখন ডিউটি তোমার?"

"সাতটায়।"

"তা হলে ফোনেই বলে দিই ব্যাপারটা। একটা সুখবর আছে। আমার ছেলে আমেরিকা থেকে ফিরে আসছে।"

খবরটা শুনেই আমার বুক ধক করে উঠল। মনোময়বাবুর ছেলে ফিরে আসা মানে, তিনতলার অংশটা উনি ভাড়া দিতে পারবেন না। জুঁই প্রথম দিনই আমাকে শুনিয়ে

রেখেছিল, ছেলে কলকাতায় এলে তিনতলায় থাকে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "তা হলে তো তিনতলাটা আপনি ভাড়া দিতে পারবেন না।"

"সেই কথাটা বলার জন্যই তোমাকে আসতে বলছিলাম। কাল রাতে ছেলে ফোন করেছিল। মাকে বলেছে, মাস দু'য়েকের জন্য এখানে এসে থাকবে। ওকে তো না করা যায় না। বেশ কয়েক বছর পর ফিরছে। তা, তোমার মাসিমা তো ফোনটা পেয়েই অর্ধেক ভাল হয়ে গেছে। এসে একবার দেখে যাও, আজ সকাল থেকে কী রকম ঘরদোর সাজাচ্ছে।"

এ সব কথা শুনে আমার লাভ নেই। এত আশা করে বসেছিলাম। সব বানচাল হয়ে গেল। শুকনো গলায় বললাম, "কবে উনি আসছেন?"

"রোববার। ফ্ল্যাটটা মাস দু'য়েক পরে পেলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে?"

"হ্যাঁ। আমি এই সপ্তাহেই শিফট করতে চাইছিলাম। আমাকে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক আছে।"

"মাসিমার সঙ্গে কথা বলবে না?"

"থাক। পরে বলব।"

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিলাম। খবরটা শুনলে ঝুলন খুব দমে যাবে। এই ফ্ল্যাটটা নিয়ে ও কত আশা করে বসে আছে। মনের মতো করে সব গুছিয়ে নেবে। হঠাৎ সব ভেস্তে গেল। এখন চট করে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করা কি চাট্টিখানি কথা? অনেক চিন্তায় মাথায় জট পাকিয়ে গেল। রেজেস্ট্রিটা কি পিছিয়ে দেব?

"কে ফোন করেছিল গো? মনোময়বাবু?"

ঘরে ঢুকে ঝুলন প্রশ্নটা করল। ওর হাতে একটা প্লেট। তাতে ফ্রেঞ্চ টোস্ট। টেবলের ওপর প্লেটটা রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মনে মনে ওর তারিফ করলাম। মনোময়বাবুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন ও রান্নাঘরে। নিশ্চয়ই দু'একটা কথা শুনেছে। ঠিক ধরে ফেলেছে। বললাম, "হ্যাঁ, মনোময়বাবু। একবার ডেকে পাঠালেন। আমাকে এখুনি যেতে হবে।" একটু মিথ্যে কথা বলতে হল। ঝুলনকে সারাদিন উদ্বেগের মধ্যে রাখতে আমি চাই না। দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

"এ কী, তুমি কিছু খেয়ে যাবে না?"

"সময় হবে না গো।"

ঝুলন আমার হাত ধরে বলল, "আমি এত কষ্ট করে বানালাম। প্লিজ, একটু কামড় দিয়ে যাও। ক' মিনিট আর লাগবে, বলো?"

ওর মুখটা দেখে মায়াই লাগল। বললাম, "দাও তা হলে। এখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে যাই।"

ঝুলন হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিয়ে টোস্টের প্রথম টুকরোটা আমার মুখে তুলে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ গো, মনোময়বাবু যদি জিজ্ঞেস করেন, কবে তুমি শিফট করছ, কী বলবে তা হলে?"

"আগে দেখি, উনি কী বলেন?"

"শুক্কুরবার দিনটা ভাল। ওই দিনের কথাই বলে এসো।"

এত উদ্বেগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল। বললাম, "তুমি কী করে জানলে শুক্কুরবারটা ভাল দিন।"

"জিজ্ঞেস করে এসেছি। শেতলা মন্দিরের পুরুতমশাইকে। এ সব জিনিস দিনক্ষণ দেখেই করা ভাল, বুঝলে?"

"আর রোববারটা?"

"ওই দিন পূর্ণিমা।" বলেই মুখ নিচু করল ঝুলন। "আরতিদি বলল, ওই দিন বেহালা থেকে আমাদের আসতে দেবে না। কিন্তু এর মধ্যে যদি দিদিভাই বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসে, তা হলে কী হবে অর্কদা? দু'জনে একসঙ্গে বেরতে পারব?"

"তখন দেখা যাবে। এখন এসব নিয়ে ভেবো না তো।"

"আমার না, খুব ভয় করছে, জানো? শুধুই মনে হচ্ছে, মাঝে কোনও অঘটন ঘটে যাবে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি পাব না।"

ওর চিবুক ধরে, আদর করে বললাম, "কিচ্ছু হবে না। তুমি সদর দরজায় তালা দিয়ে রেখো। অচেনা কেউ এলে খুলো না।"

"এই শোনো, তোমার বাবাকে একবার ফোন করলে হয় না? দেশের বাড়িতে ভৈরব কাকার ঘরে তো ফোন আছে। আমরা একা একা এত বড় একটা ডিসিসন নিচ্ছি। ভাল-মন্দ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি যদি চাও, তা হলে আজই ফোন করতে পারি। এমনকী বড় কথা। তবে রাত দশটার আগে ফোন করে লাভ হবে না। আর আমাকে আটকিও না। সওয়া সাতটা বেজে গেছে। অফিসে যেতে যেতে সাড়ে সাতটা বেজে যাবে।"

"এসো তা হলে।"

তাড়াতাড়ি পা চালালাম। দুর্গাপুর ব্রিজ থেকে অটোতে রাসবিহারীর মোড় মিনিট সাতেকের বেশি লাগার কথা নয়। অটোর জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় ওষুধের দোকান থেকে ডাকলেন ষষ্ঠীপদবাবু। এই রে, কথা বলতে গেলে আবার কিছুক্ষণ সময় নষ্ট হবে। তবুও সাড়া না দেওয়াটা অভদ্রতা। রাস্তা পেরিয়ে দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। ষষ্ঠীপদবাবুর নাতনি বিপাশা বুলুদিদের সঙ্গে বাংলাদেশ গেছে। ওদের ফিরতে কেন এত দেরি হচ্ছে, আমি বলতে পারব না।

ষষ্ঠীপদবাবু আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললাম, "চিন্তা করবেন না। বিপাশারা দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

ষষ্ঠীপদবাবু অবাক হয়ে বললেন, "বিপাশা তো ট্রুপের সঙ্গে যায়নি। আমরা ওকে পাঠাইনি। সেই কথাটা বলার জন্যই কয়েকদিন ধরে আপনাকে খুঁজছি ভাই। তা, দেখাই পাচ্ছি না।"

"পাঠাননি, কেন?"

টেবলের ড্রয়ার খুলে ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে ষষ্ঠীপদবাবু বললেন, "এই চিঠিটা পড়ুন। বুঝতে পারবেন।"

কৌতূহলে দ্রুত চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। "আপনাকে সাবধান করার জন্যই এই চিঠি। সুমিতা বসুর ট্রুপের সঙ্গে বিপাশাকে পাঠাবেন না। সুমিতা বসু ঘৃণ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গত পুজোর সময় দিল্লিতে দল নিয়ে গিয়েছিল। তপতী দাস বলে একটি মেয়ে সেই দলের সঙ্গে গিয়ে আর ফিরতে পারেনি। মেয়েটির বাবা-মা নেই। বিধবা পিসির সঙ্গে সে কালীবাবুর বস্তিতে থাকত। বিশ্বাস না হলে ওখানে খোঁজ করতে পারেন। শুভেচ্ছা নেবেন।"

চিঠির নীচে কোনও নাম নেই। পড়া শেষ করে আমি মুখটা তুলতেই ষষ্ঠীপদবাবু বললেন, "আপনি কি কিছু জানেন?"

"না।"

"আরও তিনটে মেয়ের বাড়িতে এই চিঠি গেছে। নিশ্চয়ই আপনার দিদির পিছনে কেউ

লেগেছে।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ষষ্ঠীপদবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ছেলেকে কালীবাবুর বস্তিতে পাঠিয়েছিলাম মশাই। সত্যিই তপতী বলে মেয়েটা আর ফিরে আসেনি। ওখানকার লোকেরা বলল, মেয়েটার পিসি আমতায় চলে গেছে। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তাই পাঠাইনি আমার নাতনিকে।"

"ওরা পুলিশে খবর দেয়নি?"

"দিতে চেয়েছিল। শুনলাম, ভোলার দলের ছেলেরা টাকা পয়সা খেয়ে, বস্তিতে গিয়ে ওর পিসিকে ভয় দেখায়। আপনি কিছুই জানেন না, এ হতে পারে নাকি?"

ষষ্ঠীপদবাবুর চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। বললাম, "এ ঘটনাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে ভালই করেছেন বিপাশাকে না পাঠিয়ে।"

কথাটা বলেই দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। ষষ্ঠীপদবাবু কী মনে করলেন, জানি না। আমার কিন্তু বিশ্বাস হল না। বুলুদি আর যা-ই করুক, নাচের মেয়েদের নিয়ে 'ঘৃণ্য ব্যবসা' করবে না। বহুদিন আগে আমিও একটা চিঠি পেয়েছিলাম। বুলুদি সম্পর্কে নোংরা কথায় ভরা। এ সব চিঠি পাত্তা দিলে চলে না। সব থেকে বড় কথা, বুলুদিকে নিয়ে ভাবলে আমার চলবে না। খুব অল্প দিনের মধ্যেই চেতলার এই পাড়া আমি ছাড়ছি। ষষ্ঠীপদবাবু আমার সম্পর্কে কী ভাববেন, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।

অফিসে এলাম বটে, মন কিন্তু পড়ে রইল ফ্ল্যাটের চিন্তায়। ঘণ্টাখানেক পর গেটে ডিউটি দিচ্ছি, দেখি টিকিট পাঞ্চ করে বেরিয়ে আসছে সহেলি। সঙ্গে আমার বয়সী একটা ছেলে। চোখাচোখি হতে সহেলি বলল, "কেমন আছেন অর্কদা?"

"ভাল, তুমি?" প্রশ্নটা করেই হঠাৎ মনে হল, সহেলি এখানে? ওর তো বাংলাদেশে থাকার কথা। বুলুদির সঙ্গে সহেলিও গিয়েছিল। নিজে ওকে বাসে উঠতে দেখেছি। তাই বললাম, "তোমরা কবে ফিরে এলে সহেলি?"

"কাল বিকেলে।" সঙ্গী ছেলেটার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিল সহেলি, "এর নাম সোহেল। এবার ঢাকায় পরিচয় হল। এত ভাল ছেলে, আমাদের সঙ্গেই চলে এল। একে কলকাতা দেখাচ্ছি।"

"তোমাদের প্রোগ্রাম কেমন হল, সহেলি?"

"দারুণ।" হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সহেলি, "বাংলাদেশের মানুষজন এত ভাল, এত আন্তরিক, আমরা জানতামই না। ঢাকা, নারানগঞ্জ, আর রাজশাহী—এই তিনটে জায়গায় আমরা প্রোগ্রাম করলাম। তিনটে জায়গাতেই দারুণ সাড়া পেয়েছি। সুমিতাদিকে নিয়েও ওখানকার কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে।"

"বাহ্, শুনে খুব ভাল লাগল।"

"আমরা তো আবার ঢাকা যাচ্ছি। ডিসেম্বরে ওরা ফের দাওয়াত দিয়েছে। জানেন, ঢাকায় এক মাল্টিমিলিওনিয়ার বাঙালির সঙ্গে সুমিতাদির আলাপ হয়েছে। উনি আমাদের আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন। ওখানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হয়। সুমিতাদি রাজি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কলকাতাতেও এসেছেন।"

বললাম, "তোমাদের দেরি হচ্ছে দেখে আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। দু'একজন গার্জেনও এসে খোঁজ করছিলেন।"

"আসলে কী হল জানেন, রাজশাহীতে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল না। ঢাকায় আমাদের

দেখে ওরা জোর করে নিয়ে গেলেন। ভাল টাকা দিয়েছেন। সেই সুযোগটা সুমিতাদি ছাড়তে পারলেন না। চলি অর্কদা, দিদির বাড়িতে যেতে হবে। দিদির জন্য একটা জামদানি শাড়ি এনেছি। দিয়ে আসি।"

ব্যস্ত পায়ে সহেলি নীচে নেমে গেল। আমার মাথায় আরও একরাশ চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে। বুলুদি কলকাতায় ফিরেছে। অথচ বাড়িতে আসেনি। তা হলে কি বুলুদিও টের পেয়ে গেল, পুলিশ পিছনে লেগেছে? নাকি স্মাগলাররা কোনও হুমকি দিয়েছে, পিস্তলের প্যাকেট ঠিক জায়গায় না পৌঁছনোর জন্য। বাড়ির বাইরে দু'টো জায়গায় বুলুদি থাকতে পারে। এক, হোটেল দিনরাতে। দুই, নাচের নতুন স্কুলে। হোটেলে ফোন করলেই জানা যাবে, সুখিজি আছে, না নেই। ওখানে যদি বুলুদিকে পাওয়া না যায়, তা হলে প্রতাপাদিত্য রোডে গিয়ে খোঁজ করা যেতে পারে।

বুলুদির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। ঝুলনকে বিয়ে করার কথা মুখের উপর বলার জন্য তো বটেই, সেই সঙ্গে জানতে চাইব, কেন আমার হাত দিয়ে পিস্তল পাচার করতে চাইছিল? আমাকে বিপদে ফেলে বুলুদির কী লাভটা হত? ফোন করার জন্য এস এস-দের ঘরের দিকে এগিয়েও হঠাৎ মনে হল, সায়ন্তনকে বেলা দু'টোর আগে পাওয়া যাবে না। আমি ডিউটিতে থাকতে থাকতেই ও এদিক দিয়ে যাবে। এখানেই ওকে ধরে নেওয়া যাবে। তার চেয়ে বরং প্রতাপাদিত্য রোডে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা যাক। মিনিট কুড়ির ব্যাপার। গুরুদ্বারার গেট দিয়ে বেরোলে মিনিট পাঁচেক লাগবে স্কুলে পৌঁছতে।

ইন্দ্রদা এখন সাসপেন্ড। ওঁর জায়গায় এসেছেন কবিতা নায়ার বলে এক ভদ্রমহিলা। তাঁকে বলে রাস্তায় উঠে এলাম। সকালে যখন পাতালে ঢুকি, তখন আকাশ ঝকঝকে ছিল। এখন বেশ মেঘ করেছে। রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে ফুটপাতে উঠতেই দেখি সুজয়দা হেঁটে আসছে। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। উদভ্রান্তের মতো চেহারা। চোখ দু'টো লাল। কয়েক রাত বোধহয় ঘুমোতে পারেনি। আগের দিন আমাকে গালাগাল করেছিল। তাই না চেনার ভান করে হাঁটতে লাগলাম।

"কী রে অর্ক, আমাকে যে চিনতেই পারছিস না।" সুজয়দা পাশে এসে বলল। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

"তোমাকে না চেনাই উচিত। সেদিন যা ব্যবহার করেছ, তাতে তোমার সঙ্গে কথা বলাই উচিত না।"

হাত ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে সুজয়দা বলল, "রাগ করেছিস অর্ক। আমি রাগারাগির ঊর্ধ্বে চলে গেছি রে।"

"ফের তুমি নাটক করছ সুজয়দা। তুমি একটা নোংরা টাইপের লোক।"

"বল। তোর যা খুশি, তাই বল। আমি শুনব।"

"হাত ছাড়ো। একটা জায়গায় যাচ্ছি। বাওয়াল কোরো না।"

"না, ছাড়ব না। তোকে আমার কিছু বলার আছে। তোকে না জানালে আমি শান্তি পাব না।"

সুজয়দার কথায় আমার খটকা লাগল। রাগটা চেপে রেখে বললাম, "বলো, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। চল, আমার বাড়িতে যাই।"

"আমার অত সময় নেই।"

"তা হলে রিমঝিমে চল।"

দু'জনে মিলে রেস্টুরেন্টে এসে বসলাম। চায়ের অর্ডার দিয়ে সুজয়দা বলল, "অর্ক ইন্দ্র চ্যাটার্জি সম্পর্কে তোর মোহভঙ্গ হয়েছে? নাকি এখনও মনে করিস, ওর মতো লোক হয় না?"

শুরুতেই সুজয়দা খুব দুর্বল জায়গায় আঘাত করল। মুখটা নিচু করে ফেললাম। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। এমন সময় সুজয়দা বলল, "ওই লোকটা সম্পর্কে তোর যে ধারণাই থাকুক না কেন, আমি কিন্তু ওকে ছাড়ব না। মরার আগের দিন পর্যন্ত শত্রুতা করে যাব।"

জিজ্ঞেস করলাম, "ইন্দ্রদার উপর তোমার এত রাগ কেন বলো তো?"

"শুধু রাগ নয়, ঘৃণাও। এমন চরিত্রহীন লোক পৃথিবীতে কম আছে। যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে তোকে প্রমাণ দেখাতে পারি।"

"কী প্রমাণ দেখাবে তুমি?"

পকেট থেকে একটা খাম বের করল সুজয়দা। তারপর বলল, "এই ছবিগুলো দ্যাখ। তা হলেই বুঝতে পারবি।"

খামের ভেতরে গোটা দশ-বারো রঙিন ছবি। প্রথম ছবিটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। খাটের উপর শুয়ে আছে মিতা বউদি। ইন্দ্রদা চুমু খাওয়ার জন্য মুখটা নামিয়ে আনছে। পরের ছবিটায় বউদির উর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। স্তনে মুখ ঘষছে ইন্দ্রদা। সুজয়দার দিকে তাকাতেই যন্ত্রণাভরা গলায় বলল, "অবাক হোস না। অন্য ছবিগুলো দ্যাখ। তা হলেই বুঝতে পারবি, তোর ইন্দ্রদা কী প্রকৃতির জানোয়ার ছিল।"

বাকি ছবিগুলো দেখার ইচ্ছেটাই চলে গেল। কোনওরকমে বললাম, "কোথায় তোলা হয়েছিল এই সব ছবি?"

"ডায়মন্ডহারবারের কাছে একটা রিসর্টে। তোর বউদিকে নিয়ে ইন্দ্র শূয়ারের বাচ্চাটা স্ফূর্তি করতে গেছিল। রিসর্টের লোকজনও হারামি। ছবি তুলে একটা প্যাকেট তোর বউদির কাছে পাঠায়। সেই ছবি আমার হাতে পড়ে যায়। ওদের ধান্দা ছিল তোর মিতা বউদিকে ব্ল্যাকমেইল করার। আমি আসতে বলি। এমন পেটান পিটিয়েছিলাম, আর এ মুখো হয়নি।"

"কিন্তু বউদি...বউদিই বা কেন ইন্দ্রদার ফাঁদে পা দিল?"

"এটা আমার কাছেও রহস্য। তোরা তখনও জয়েন করিসনি। আমরা একবার পিকনিক করেছিলাম গেঁয়োখালিতে। প্রথম পিকনিক। ইন্দ্রর বউ সে বছরই সুইসাইড করেছে। আমরা জোর করে ওকে নিয়ে গেলাম। সেই প্রথম মিতার সঙ্গে ওর আলাপ। পিকনিকের পর থেকে ও আমার বাড়িতে আসতে শুরু করল। আমি বাড়িতে না থাকলেও কোনও কোনওদিন আসত। তখন কিছু সন্দেহ করিনি। এই ছবিগুলো পাওয়ার পর মাথা খারাপ হয়ে গেল।"

"তখন ইন্দ্রদাকে তুমি কিছু বলোনি?"

"একদিন ফাটাফাটি হয়ে গেল। ওর বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিলাম। সেদিনই দুপুরে তোর বউদি হাতের শিরা কেটে সুইসাইডের চেষ্টা করল। খবর পেয়ে নার্সিং হোমে নিয়ে কোনও রকমে বাঁচালাম। তার পরে তো বুঝতেই পারছিস, দাম্পত্য জীবনটা কেমন দাঁড়ায়।"

বেয়ারা চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে গেল। সুজয়দার দিকে তাকিয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই লোকটা এতদিন ইন্দ্রদার সঙ্গে কাজ করছিল কীভাবে? সুজয়দা সম্পর্কে সব সময় আমাদের একটা খারাপ ধারণা দিয়ে এসেছে ইন্দ্রদা। সেই ধারণাটা এই একটু আগে পর্যন্ত

আমার ছিল। ছবিগুলো না দেখলে তা বদলাতও না। ইন্দ্রদাকে এতদিন সহ্য করল কী করে সুজয়দা? আমি হলে তো খুনই করে ফেলতাম। হঠাৎই মনে পড়ল, ইন্দ্রদা সম্পর্কে এই কিছু দিন আগে ঝুলন একটা মন্তব্য করেছিল। ডাকাতির পর ইন্দ্রদা যেদিন আমাকে বাড়িতে দেখতে গেছিল, সেদিনই ঝুলন আমাকে বলেছিল, "এই লোকটা ভাল না।" মেয়েরা কত তাড়াতাড়িই না লোক চিনতে পারে!

সুজয়দা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার জন্য আমার দুঃখই হচ্ছে। মিতা বউদির বোন সেদিন আমাকে যা তা বললেন সুজয়দা সম্পর্কে। তিনি কি এ সব জানেন? মনে হয় না। সুজয়দার মারধর আর শারীরিক অত্যাচারের কথাই উনি জানেন। কিন্তু সুজয়দাকে যে মানসিক পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, তার খবর উনি হয়তো রাখেন না। জিজ্ঞেস করলাম, "এ সব কথা আর কেউ জানে, সুজয়দা? বউদির বাপের বাড়ির লোকেরা?"

"জানি না রে। বাপের বাড়ির লোক বলতে এখন আছে ওই বোন। সেও একই রকম। তিনটে বিয়ে। এখন যার সঙ্গে আছে, সে এক নম্বরের আঁতেল। আমার বাড়িতে সালিশি করতে এসেছিল। এক চড় খেয়ে ফিরে গেছে। আর আসে না। আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিল ওরা। তোর মিতা বউদিকে বিয়ে করার জন্য আমার বাড়ির লোকেরা এত খেপে আছে, আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখে না।"

প্রায় পাঁচ বছর একসঙ্গে কাজ করছি, অথচ সুজয়দা সম্পর্কে বলতে গেলে কোনও কিছুই জানি না। কথার পিঠে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বাড়ির লোকজন কোথায় থাকেন সুজয়দা?"

"বেনেটোলায়। আমি নর্থ ক্যালকাটার ছেলে। এক বন্ধুর বিয়েতে লেক গার্ডেন্সে এসেছিলাম। তোর মিতা বউদির রূপ দেখে মজে গেলাম। ওকে বিয়ে করার কথা যখন তুললাম, তখন বন্ধুটা মানা করেছিল। তখনই আমার আরও খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল ওদের ফ্যামিলি সম্পর্কে। বাড়ির কারও কথা শুনলাম না। এক কাপড়ে তুলে এনে ঘর বাঁধলাম লেক মার্কেটের ওই ফ্ল্যাটে। কিন্তু সম্পর্কটা তৈরি হল না। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজনের সম্পর্কটা কিসে গাঢ় হয় জানিস? বিশ্বাস আর ভালবাসা দিয়ে। সেটাও আবার একতরফা হয় না। তোর বউদি আমাকে ভালবাসা তো দিলই না, সেই সঙ্গে সারা জীবন তঞ্চকতা করে গেল।"

শেষ কথাগুলো শুনে আমি চমকে উঠলাম। একটা বিরাট কথা কত সহজে বলে ফেলল সুজয়দা। সম্পর্কটা তৈরি হয় বিশ্বাস আর ভালবাসা দিয়ে। তা হলে তো, বুলুদির সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোনও সম্পর্কই আমার তৈরি হয়নি। মিছিমিছি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে কী লাভ? যে সম্পর্ক গড়েই ওঠেনি, তা ভেঙে ফেলার জন্য দ্বিধা করে কী হবে?

সুজয়দা রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে। বিধ্বস্ত একটা মুখ। সুজয়দার মধ্যে আমি দিবাকরদাকে দেখতে পেলাম না। এই লোকটা হুইস্কি খেতে খেতে রাগে কোনওদিন ফেটে পড়তে পারবে না। কাপে চা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অথচ সুজয়দা চুমুক পর্যন্ত দেয়নি। গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সুজয়দা আমাকে বলল, "আমার কথা শুনে আর কী করবি? ওঠ, তোর অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম।"

টেবলের ওপর খামটা পড়ে আছে। সেটা তুলে সুজয়দার হাতে দিয়ে বললাম, "বউদি এখন কেমন আছে গো? কেমোথেরাপি কি শেষ হয়ে গেছে?"

আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুজয়দা বলল, "তোর বউদি এখন সব থেরাপির

বাইরে চলে গেছে।"

"তার মানে?"

"ও আর নেই রে অর্ক।" সুজয়দার গলাটা ভাঙছে, "দিন কয়েক আগে ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে ফের তোর বউদিকে লেক গার্ডেন্সে নিয়ে গেল। আমি তখন বাড়িতে নেই। মাঝে কোনও খবর পাইনি। ওরা কোনও খবর দেয়নি। শুনলাম, কাল বিকেলে কেওড়াতলার শ্মশানে নাকি পুড়িয়ে গেছে।"

"কী বলছ তুমি সুজয়দা?"

"ঠিক বলছি। শ্মশানে রেজিস্টারটা তাই দেখতে যাচ্ছিলাম। ওর নামটা আছে কি না।" কথাগুলো বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুজয়দা।

২১

ফের ম্যাগনেটিক টিকিট নিয়ে ঝামেলা। গেট দিয়ে বেরতে পারছেন না এক ভদ্রমহিলা। পাঞ্চ করার জন্য যতবার টিকিট ঢোকাচ্ছেন, লাল আলো জ্বলে উঠছে। আর গ্যাঁ-গ্যাঁ শব্দ হচ্ছে। গেট খুলছে না। বিরক্ত হয়ে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী প্রবলেম হচ্ছে, প্লিজ একটু দেখবেন?"

টিকিটটা হাতে নিয়ে দেখি ফর্টি এইট রাইড-এর। অর্থাৎ এক টিকিটে আটচল্লিশ বার যাতায়াত করা যাবে। রোজ রোজ যাতে টিকিট কাটার জন্য যাত্রীদের সময় নষ্ট করতে না হয়, সেজন্য আমাদের রেলে ফর্টি এইট আর টুয়েলভ রাইড টিকিটের ব্যবস্থা আছে। এতে যাত্রীদের কিছু টাকাও বাঁচে। টিকিটটা হাতে নিয়ে বললাম, "আপনি আসুন। মেশিনে ফেলে দেখে দিচ্ছি, আপনার রাইড শেষ হয়ে গেছে কি না।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "হতেই পারে না। টিকিটটা আমি মাত্র দু' দিন আগে কেটেছি। ইউজ করেছি মোটে পাঁচবার। গুনতিতে আমার ভুল হয় না। দেখুন, টিকিটে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে।"

এস এস-দের ঘরে একটা ছোট মেশিন আছে। টিকিটটা তার ভেতরে ঢোকালে বোঝা যায়, ক'টা রাইড বাকি। অথবা টিকিটটাই খারাপ কি না। অনেক সময় ঘামে বা জলে টিকিটের চৌম্বক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে ইদানীং মেশিনের গণ্ডগোলে কিছু খারাপ টিকিট বেরচ্ছে। প্রায়দিনই একটা-দুটো অভিযোগ আসছে। চক্রবর্তীদাদের ঘরে ঢুকে মেশিনে ঢুকিয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলার দোষ নেই। টিকিটটাই খারাপ হয়ে গেছে। বললাম, "এখনও আপনার তেতাল্লিশটা রাইড বাকি। এই টিকিট কাউন্টারে দিয়ে আপনি টাকা ফেরত নিয়ে নিন। তার আগে আপনাকে একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে।"

ভদ্রমহিলা খুব চটে গেলেন, মনে হল। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়তো দরকারে কোথাও যাচ্ছিলেন। এখন ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন না। ওঁর রাগ কমানোর জন্য যাদবকে ডেকে বললাম, "কাউন্টারে সীতাংশু আছে। গিয়ে বল, এই ভদ্রমহিলাকে যেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়।"

চক্রবর্তীদা চুপচাপ কী যেন লিখছেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "মেট্রোর খুব বদনাম হয়ে যাচ্ছে রে অর্ক। এখন টিকিটটাও ঠিক মতো বেরচ্ছে না। প্যাসেঞ্জাররা একদিন এমন খেপে যাবে, তোদের পেটাবে।"

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, "ঠিক বলেছেন।"

"যাচ্ছিস কোথায়, বোস না। তোর বউদি আজ আলুর পরোটা পাঠিয়েছে, আয়, লোকজন কম। খেয়ে নিই।"

"লোকজন কম মানে?"

"বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ছেলে বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। তাই জানলাম। পাতালে তো কিছুই বোঝা যায় না।"

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়লাম। চক্রবর্তীদা টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবার সাজাচ্ছেন। কাজ করতে করতেই বললেন, "কাল মেট্রো ভবনে গেছিলাম। গিয়ে শুনি, ভয়াবহ ব্যাপার। পাতাল রেলে যে কোনও দিন মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে।"

"কেন বলুন তো?"

"আরে, শ্যামবাজার থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউর পুরোটা, কংক্রিটের রাস্তা করবে বলে ক্যালকাটা কর্পোরেশন রিসেন্টলি পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা চেয়েছে, আমাদের মেট্রো রেলের কাছ থেকে। তা, সে জন্যই ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে ওরা সয়েল টেস্টিং করিয়েছিল। তার রিপোর্ট যা বেরিয়েছে, তা দেখে তো পুরকর্তাদের মাথায় হাত।"

"কেন চক্রবর্তীদা?"

"শ্যামবাজারে চার ফুট মাটি কাটার পরই দেখে জলে ভর্তি হয়ে আছে বিরাট একটা অঞ্চল।"

"জল! জল এল কোত্থেকে?"

"এখনও ঠিক ধরা যায়নি। তবে ইঞ্জিনিয়াররা আন্দাজ করছেন, তিনটে কারণে ওই জল জমতে পারে। এক, টালার ট্যাঙ্ক থেকে যে পাইপটা ওখান দিয়ে গেছে, তাতে কোথাও ফুটো থাকতে পারে। দুই, আমাদের এয়ারকন্ডিশনিং কন্ট্রোল সিস্টেমে কোথাও গণ্ডগোল হতে পারে। জলটা নিয়মিত বের করে দেওয়াটাই নিয়ম। হয়তো কোনও ডিসচার্জ পয়েন্টে জল চুঁইয়ে পড়ছে এবং মাটির তলায় জমছে। আর, তিন নম্বর কারণটা আরও ভয়ানক। শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা—এই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার নীচে, জায়গায় জায়গায় ফোঁকর তৈরি হয়ে রয়েছে।"

অবাক হয়ে বললাম, "তা হতে পারে নাকি?"

"এত আশ্চর্য হচ্ছিস কেন? আমাদের দেশে সবই হতে পারে। দুটো প্লেনে ধাক্কা লাগতে পারে, বিদেশি প্লেন এসে আকাশ থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে যেতে পারে, দেশের প্রধানমন্ত্রী গুলি খেয়ে বা বোমা বিস্ফোরণে মারা যেতে পারে, আর পাতাল রেলের ঠিক ওপরে জলের স্তর বা ফোঁকর থাকতে পারে না?"

"কিন্তু চক্রবর্তীদা, পাতাল রেলের ওপরটা তো বালি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।"

"না, সব জায়গায় তা করা হয়নি। তোর জানার কথা নয়। তখন তোর বয়স দশ-এগারো। উত্তর কলকাতায় যখন পাতাল রেলের কাজ চলছিল, সেই সময় পাতাল রেলের গর্তটাকে ডাস্টবিন ভেবে নিয়ে আশপাশের বাড়ির লোকেরা সব জঞ্জাল ওখানে ফেলতেন। নর্থ ক্যালকাটার লোকেদের সিভিক সেন্স তো জানিস। একেক সময় নিবারণকে ঠিকই জবাব দিত ইন্দ্র।"

"কিন্তু জঞ্জাল ফেলার সঙ্গে ফোঁকর তৈরি হওয়ার সম্পর্কটা কী?"

"আছে। সম্পর্ক আছে। ধর্মঘট যখন উঠে গেল, তখন ওই জঞ্জালের ওপরই বালি আর

রাবিশ ফেলে ঠিকাদাররা গর্ত ভরাট করেছিল। তারও উপর রাস্তা করে দিল। এইবার হল কী, যত দিন যেতে লাগল, ওই জঞ্জালে একটা কেমিকেল রিঅ্যাকশন হয়ে গ্যাস সৃষ্টি হল। সেই গ্যাস ওপরে চাপ দিতে থাকল।"

"আপনি এত সব জানলেন কী করে চক্রবর্তীদা?"

"মেট্রো ভবনে সব শুনে এলাম। ওখানে হইহই পড়ে গেছে। তুই তো নর্থ ক্যালকাটার দিকে সচরাচর যাস না। গেলে দেখবি, বিডন স্ট্রিট থেকে হ্যারিসন রোডের ক্রসিং পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউর সাত-আটটা জায়গায়, কোথাও দু' ইঞ্চি, কোথায় চার ইঞ্চি রাস্তা বসে গেছে। প্লট লোড বিয়ারিং টেস্ট করতে গিয়েই বিপত্তিটা ধরা পড়ল। এমন অবস্থা, আশপাশের কিছু বাড়ি যে কোনও দিন ধসে পড়তে পারে।"

"পাতাল রেলে অ্যাক্সিডেন্টটা হবে কেন চক্রবর্তীদা?"

"হবে নাই বা কেন? আমাদের এই পাতাল রেলের ছাদটা থেকে, ওপরের রাস্তার ব্যবধান কত ফুট বল তো?"

আমার কোনও ধারণা নেই। স্বীকার করলাম, "বলতে পারব না।"

"পাতাল রেলে কাজ করিস, বলতে তোর লজ্জা করল না? কোথাও কুড়ি ফুট। কোথাও তার বেশি। ধর, কোনও কারণে এই ছাদটা ধসে পড়ল। তখন কী হবে ভাবতে পারিস? হুড়হুড় করে ওই জল নেমে এসে পাতাল রেল ভাসিয়ে দেবে। দেবে কি না?"

"কিন্তু কংক্রিটের ছাদ, ধসে পড়বে কী করে?"

"সেটাই কথা। ধসে যে পড়েনি, তা তো নয়। বেলগাছিয়ায় একবার ধসে পড়েওছে। যাক ভাই, যা হওয়ার তোদের আমলে হবে। আমাদের দিন তো শেষ হয়ে এল। আর ক'টা দিনই বা চাকরিটা আছে। নে, বউদির হাতে তৈরি পরোটা। এবার খাওয়া শুরু কর।"

বললাম, "কর্তারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না?"

"কী ব্যবস্থা নেবে? আমাদের দেশে প্রিভেনশন নেওয়ার কথা কেউ আগ বাড়িয়ে ভাবে? একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে, তখন সবাই উঠেপড়ে লাগবে। কী শুনে এলাম জানিস? কংক্রিটের রাস্তাটা এখন আর তৈরি করা হবে না। ব্যস, হয়ে গেল।"

পরোটা মুখে দিতেই পাতাল রেল নিয়ে দুর্ভাবনাটা চলে গেল। বউদি জলখাবারটা কিন্তু দুর্দান্ত করেন। একেক জনের হাতে, মনে হয়, জাদু-টাদু থাকে। যে কোনও ধরনের খাবারই তাদের ছোঁয়ায় সুস্বাদু হয়ে ওঠে। বউদিও সে রকম একজন। একেক দিন একেক রকম জলখাবার পাঠান। জানেন, চক্রবর্তীদা একলা খেতে পারেন না। কেউ না কেউ জুটবেই খাওয়ার সময়। আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটে যায় মালপোয়া, লুচি, চিড়ের পোলাও অথবা নতুন ধরনের স্যান্ডউইচ। সব উত্তর কলকাতার ঘরানার খাবার।

খেতে খেতেই চক্রবর্তীদা বললেন, "হ্যাঁ রে, সুজয়টা এসেছে? কী ছেলে বল তো? বউটাকে মেরেই ফেলল?"

সব কথা তো বলা যাবে না। তাই বললাম, "রোগটা এমন, সুজয়দার আর কী করার ছিল, বলুন?"

"তাই বলে বউটাকে তুই মারধোর করবি? যার মুখে মুখ দিয়েছিস, রোজ সহবাস করেছিস, তার প্রতি তোর কোনও সিমপ্যাথি থাকবে না রে? এই যে তোর বউদির পেটে আমি দুটো সন্তান দিয়েছি, সে কথাটা ভাবলেই কেমন যেন টান বেড়ে যায় ভাই। আমি তো কোনওদিন তার গায়ে হাত তুলতে পারিনি। হ্যাঁ, এক ছাদের তলায় থাকলে ঠোকাঠুকি

হবেই। আমারও কী কম হয়েছে? আসল কথা কী জানিস, সমঝোতা। পরস্পরের ওপর নির্ভরতা। এই যে আমি বাড়ি ফিরে যাব, সন্ধেবেলায় তোর বউদি ঠিক আমার কোলের কাছে এসে বসবে। দু' দণ্ড কথা বলব। এটাই তো জীবন রে ভাই।"

"ক' বছর হল আপনাদের বিয়ের?"

"ডিসেম্বরে তিরিশ বছর হবে। হ্যাঁ রে, তুই বিয়ে করছিস না কেন?"

"করব চক্রবর্তীদা। পছন্দ করে রেখেছি।"

"পছন্দটা ভেবেচিন্তে করেছিস?"

"হ্যাঁ। মেয়েটাকে আপনি সেদিন দেখেওছেন। কালো মতো, সেদিন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে রে। কালো, জগতের আলো। তা, বিয়েটা করছিস কবে?"

"দিন ঠিক করতে পারছি না। ফ্ল্যাট পাচ্ছি না বলে। বিপিন পাল রোডে একজন দেবে বলেছিল। হঠাৎ তার ছেলে আমেরিকা থেকে আসছে। ব্যস, সব কেঁচিয়ে গেল।"

"লোকটা কে?"

"মনোময়বাবু বলে একজন। প্রায়ই আমার কাছে আসে।"

"মনোময় মিত্তির! ধূর, ও তো একটা ব্লাফবাজ। ওকে ভাল মতো চিনি। আমার ভায়রাভাইয়ের পাশের বাড়িতে থাকে। কী বলেছে, ছেলে আমেরিকা থেকে আসছে? হা হা হা। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সি জেলটা যদি আমেরিকা হয়, তা হলে আমার কিছু বলার নেই।"

"কী ফালতু কথা বলছেন আপনি?"

"ফালতু কথা? খোঁজ নিয়ে দেখিস। ছেলেটা একটা চ্যাম্পিয়ন। বাড়ির ঝিকে রেপ করে, তারপর মেরে ফেলেছিল। সাতটা বছর জেলের ঘানি টেনেছে। এখন বোধহয় ছাড়া পাচ্ছে। আর ওই ব্লাফবাজটা তোকে বলেছে, আমেরিকা থেকে ছেলে আসছে। সত্যি, সাউথ ক্যালকাটার লোকগুলো পারে মাইরি।"

চক্রবর্তীদা মিথ্যে কথা বলার লোক নন। শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। মনোময়বাবুকে দেখে কখনও আমার খারাপ লোক মনে হয়নি। বরং শ্রদ্ধাই করতাম। কিন্তু চক্রবর্তীদা এ কী শোনালেন? বললাম, "আমি যে মনোময় মিত্রের কথা বলছি, আপনি কি তাঁর কথাই বলছেন!"

"হ্যাঁ রে ভাই। কলকাতায় এক পিসই আছে। তোর সঙ্গে কথা বলতেও ওকে দেখেছি। তুই হয়তো লক্ষ করিসনি। আমাকে দেখলেই লোকটা কেমন যেন সিঁটিয়ে যেত। যাক, কথাটা তুলে ভালই করেছিস। ওর বাড়িতে ঢুকিসনি, বেঁচে গেছিস। তোকে ফতুর করে দিত।"

"কী করে?"

"ওর ঠাঁটবাট আছে। মালকড়ি নেই। জানবি, ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যই করেন। রোজ রোজ নানা বাহানা করে তোর কাছে হাত পাতত।"

সব শুনে আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। কোনও লোক এমন মিথ্যেবাদী হতে পারে? খাওয়া শেষ করে চক্রবর্তীদা টিফিন কেরিয়ার গোছাচ্ছেন। ঢেকুর তুলে বললেন, "হ্যাঁ রে, পরোটা কেমন খেলি, বললি না তো। তোর বউদি আবার জিজ্ঞেস করবে।"

বললাম, "দারুণ। বলে দেবেন।"

pathagar.net

"শোন, আমি একবার প্যানেল রুম থেকে ঘুরে আসছি। তুই কাছাকাছি থাকিস। ফোন-টোন এলে কিন্তু ধরিস।" বলেই চক্রবর্তীদা টিফিন কেরিয়ার ধোওয়ার জন্য বাথরুমের দিকে গেলেন।

হঠাৎই জুঁইয়ের মুখটা মনে ভেসে উঠল। মনোময়বাবু না হয় ব্লাফবাজ হতে পারেন, কিন্তু জুঁই কেন সেদিন তা হলে বলল, টুবলুদা যখন আসে, তিনতলার এই ফ্ল্যাটে থাকে? আর মাসিমা? তিনিই বা ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন কেন? আমার কাছে? তা হলে ব্লাড সুগারের প্রবলেম, ছেলের আমেরিকা যাওয়ার জন্য নয়। ছেলের জন্য লোকলজ্জা আর উদ্বেগের কারণে। চক্রবর্তীদা বললেন, ওদের মালকড়ি নেই। তা হলে চণ্ডীতলায় স্কুল তৈরির কথাটা ধাপ্পা? হতে পারে। মনোময়বাবু বা মাসিমার জন্য নয়, মনটা খারাপ হয়ে গেল জুঁইয়ের জন্য। ও তো বন্ধু হতে চেয়েছিল, তা হলে মিথ্যে কথা বলল কেন?

যতক্ষণ অফিসে রইলাম, ঘুরেফিরে মনোময়বাবুর কথাই মনে পড়তে লাগল। এরপর দেখা হলে, লোকটার সঙ্গে আর কথাই বলব না। আমাকে একটা মারাত্মক সমস্যার মধ্যে উনি ফেলে দিয়েছেন। কাল রাতে সব শুনে ঝুলন আমায় একটা পরামর্শ দিল, "অমিয়দাকে একটা ফোন করো। দেখো, ঠিক একটা রাস্তা ও বের করে দেবে।" তা, ফোন করে সমস্যাটা বললাম। অমিয় বলল, "এটা কোনও সমস্যাই না। রোববার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুই কিন্তু পিছিয়ে যাস না। ফোনটা একবার ঝুলনকে দে।"

ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, আমি তা শুনতে পাইনি। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য তখন কলঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। ফিরে দেখলাম, ঝুলনের মুখটা খুশিতে ঝলমল করছে। আমি কিন্তু উল্টোটাই ভাবছিলাম। খবরটা শুনে মুষড়ে পড়বে। বুলুদি যে কলকাতায় ফিরে এসেছে, সে কথাটা কাল ঝুলনকে বলিনি। কীভাবে নিত, কে জানে? কাল রাতটা খুব সুন্দর কেটেছে আমাদের। আদর করার সময় ওর আগ্রহটা দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছি। তাগিদটা যেন একটু বেশিই দেখাল ও।

বাড়ি ফিরে আসতেই ঝুলন বলল, "রেখা এসেছে। ওর সামনে যেন বাড়াবাড়ি কিছু করে বোসো না।"

ফিসফিস করে কথাটা বলে ও উধাও হয়ে গেল। মনে মনে হাসলাম। রেখার কাছে একবার আমরা ধরা পড়ে গেছি। ওর সামনে আর লুকোচুরির কোনও দরকার আছে? রেখা কি বোকা? একটা বাড়িতে আমরা দুজন রাত কাটাচ্ছি। আর কেউ নেই। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে কী হয়, ও জানে না? ওর নিজেরও তো নতুন জীবন শুরু হয়েছে। সবই ও বুঝতে পারছে।

আমি স্নান সেরে ফিরে আসার পর, হঠাৎ উদয় হয়ে ঝুলন বলল, "এই শোনো, প্যান্ট কাচতে গিয়ে আজ একটা অডিও ক্যাসেট পেয়েছি পকেটে। তোমার দরকারি কিছু?"

ক্যাসেটের কথাটা আমার মনেই ছিল না। সায়ন্তন আমাকে দিয়েছিল। ফোনে সুখবিন্দর সিংয়ের কথাবার্তার ক্যাসেট। ওটা দেখে বললাম, "দাও তো। এই ক্যাসেটটার কথা আমি ভুলেই গেছিলাম।"

ঝুলন হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটটা দিতেই ওকে টেনে আনলাম। আঁতকে উঠে ও ইশারা করল, রেখা রান্নাঘরে। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ছেড়ে দিলাম। সন্ধের আগে রেখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। যখন আসে, ঘণ্টা তিনেকের সময় নিয়ে আসে। কী যে এত গল্প হয় ওদের মধ্যে,

কে জানে? এ বাড়িতে আমি আসার পর থেকে দেখছি, ওদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। যেমন আমার সঙ্গে অমিয়র।

"কী মশাই, রোববার রেজেস্ট্রিটা সেরে ফেলছেন, আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না?" ঘরে ঢুকেই প্রশ্নটা করল রেখা। ওর হাতে খাবারের প্লেট। চিড়ের পোলাও জাতীয় কিছু হবে। প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন। আপনার হবু বউ কিন্তু করেনি। পোলাওটা আমি করে আপনাকে খাওয়াচ্ছি।"

রেখার পিছনে ঝুলন দাঁড়িয়ে। ওর মুখে হাসি। বললাম, "আমাদের বলতে তুমি আর কাকে বোঝাচ্ছ রেখা? তোমার বরকে তো আমি চোখেই দেখিনি।"

"ও আপনার মতো নয়। পড়াশুনোর জগতের লোক তো, একটু ইনট্রোভার্ট। আড়ালে থাকতে ভালবাসে।"

"ভাল। তোমার আঁচলের আড়ালে থাকলেই ভাল।"

কথাটা শুনে হাসতে লাগল রেখা। তারপর বলল, "আপনি তো বেশ কথা বলতে পারেন। প্রথম প্রথম যখন দেখতাম, আমার খুব গোমড়ামুখো মনে হত আপনাকে। ইদানীং যা শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে, ততটা রসকষহীন নন।"

চিড়ের পোলাও মুখে দিয়ে বললাম, "কতটা রসালো বলে মনে হচ্ছে রেখা?"

"মিক্সচারে ফেলে দেখতে হবে। সেই দায়িত্ব আপাতত দিচ্ছি আমার বন্ধুকে।"

"হ্যাঁ, ভাল করে টিপে দেখে নিতে বোলো, পরে না আবার পস্তায়।"

সোফায় বসে রেখা ফের হেসে উঠল। ওর কাঁধে মুখ রেখে ঝুলন বলল, "এই আর কিছু বলিস না। কী বলে বসবে কে জানে?"

সকালে আলুর পরোটা, বিকেলে চিড়ের পোলাও। বেশ আছি। বললাম, "দারুণ হয়েছে রেখা। তোমার ফুল মার্কস পাওয়া উচিত।"

রেখা বলল, "থ্যাঙ্কস। কিন্তু মিষ্টির কথাটা আমি ভুলছি না।"

বললাম, "রোববার তুমি ওর সঙ্গে যাবে? এই বেহালায়। বেশি দূরে তো নয়। তুমি সঙ্গে থাকলে ঝুলনের ভাল লাগবে।"

"দেখি। রোববার যদি আমার পতিদেবতাটি আসেন, তাহলে মুশকিল।"

"ওকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না।"

"না অর্কদা। তা হলে বাড়িতে জানাজানি হয়ে যাবে। পরে তো নিশ্চয়ই একটা অনুষ্ঠান করবেন। তখন না হয় দু'জনে মিলে আসব। যাক সে কথা। আগে বলুন তো, সই করার পর আমার বন্ধুটাকে আপনি কী দিচ্ছেন?"

এই প্রশ্নটার জন্য আমি ঠিক তৈরি ছিলাম না। ভাবিওনি। ওই সময়টায় কিছু দিতে হয়। রেখার সামনে হেরে গেলে চলবে না।

পাল্টা বললাম, "মেঘনাদবাবু তোমাকে কী দিয়েছিলেন রেখা?"

"কে মেঘনাদবাবু?"

"ওই, যিনি আড়ালে থাকেন।"

হি হি করে হাসতে হাসতে সোফায় গড়িয়ে পড়ল রেখা। তারপর নিজেকে সামলে বলল, "কাছাকাছি গেছেন। আমার বরের নাম কী জানেন? কণাদ। উফ্ বাবা, আপনি পারেন বটে।" ডান হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে এরপর রেখা বলল, "মেঘনাদবাবু আমাকে এই হিরের আংটিটি দিয়েছিলেন। অবশ্য আমেরিকান হিরের।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলাম, গড়িয়াহাটের মোড়ে গিয়ে কালই আমাকে একটা আংটি কিনে আনতে হবে। খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। প্লেটটা নেওয়ার জন্য ঝুলন উঠে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি রেখাও। বললাম, "আর বসবে না রেখা?"

"না অর্কদা। আজ আবার মেঘনাদবাবুর আসার কথা আছে। এসে আমাকে দেখতে না পেলে গোঁসা করবেন। শুনলাম, কাল থেকে আপনার বিকেলের ডিউটি। অফিস যাওয়ার সময় তা হলে ঝুলনিকে আমাদের বাড়িতে রেখে যাবেন। ফেরার সময় নিয়ে আসবেন।"

"তোমাদের অসুবিধে হবে না তো?"

"কী অদ্ভুত কথা বলছেন। আমার বাড়ির সবাই ঝুলনিকে অসম্ভব ভালবাসে। ও গেলে আমরা খুশিই হব। চলি তা হলে?"

রেখা আর ঝুলন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানায় গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথায় একরাশ চিন্তা। জুঁই, আর মনোময়বাবুর কথা ভুলতে পারছি না। মনোময়বাবুর স্বরূপটা ঝুলনকে বলার এখনও সুযোগ পাইনি। সদর দরজা বন্ধ করে ও আমার ঘরে এলে বলব। একটু আগে রেখা ওকে ঝুলনি বলে ডাকল। শুনতে খুব ভাল লাগল। এবার থেকে আমিও ওকে ঝুলনি বলে ডাকব।

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই সায়ন্তনের ক্যাসেটটার কথা মনে পড়ে গেল। এত দিন ধরে ওটা আমার কাছে রয়েছে। অথচ খেয়ালই হয়নি। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে ক্যাসেটের কথাবার্তা শোনা দরকার। কিছু নতুন তথ্য তা হলে পাওয়া যেতে পারে। পুলিশের তদন্তে যা সাহায্য করবে। ক্যাসেটটা টেবলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে রেকর্ডারে ঢুকিয়ে দিলাম। মন দিয়ে শুনতে লাগলাম কথাবার্তা।

"সুখি বলছি"...

এক ভদ্রমহিলার গলা, "তুমি আজ বাড়ি আসবে না?"

"মনে হয়, পারব না।"

"ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে রাত কাটাবে বুঝি?"

"চন্দ্রা, উনি একজন নামকরা ড্যান্সার। ওর সম্পর্কে ফালতু কথা বোলো না। হলদিয়া থেকে একজন অফিসার আসবেন। ওকে এন্টারটেন করতে হবে। কাল সকালে ফ্রি থাকব। তখন যাব।"

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"যদি তুমি তাই মনে করো, ফোনটা রেখে দিচ্ছি।" এরপরই ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ।

"....মালদা থেকে বাবলু বলছি। ঘোড়াগুলো এসে গেছে।"

"ধিনসা সাহেব চেতলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বললেন। ওটা অনেক সেফ জায়গা।" সুখিজির গলা, "এই লাস্ট বার।" "ঠিক আছে।"

ক্যাসেটে সুখিজির গলা একটু ক্যাটক্যাট শোনাচ্ছে। কিন্তু লোকটার সম্পর্কে নানা তথ্য পাচ্ছি। চন্দ্রা বলে মহিলাটি বাঙালি। সুখিজির স্ত্রী। আগে কোনও এক হোটেলে গান গাইতেন। সেখানেই পরিচয় সুখিজির সঙ্গে। এখন থাকেন আনোয়ার শা রোডে একটা ফ্ল্যাটে। বুলুদির ওপর চন্দ্রার খুব রাগ। হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুখিজি একটা হোটেল করেছেন হলদিয়ায়। পেট্রো-কেমিকেলসে আরও কীসব কাজ করতে চান। সেজন্য ওখানকার অফিসারদের এনে এখানে ঢালাও ফুর্তির ব্যবস্থা করেন। বুলুদি সেই আসরে

থাকে।

ক্যাসেটে ধিনসা বলে একটা লোকের কথা বেশ কয়েকবার শুনলাম। এই লোকটাই পাতাল রেলের কাজে সুখিজির পার্টনার। এর কোম্পানিটার নাম নর্মদা কন্সট্রাকশন্স। ধিনসা একবার বলল, "খৈতান কন্সট্রাকশন্সের রাকেশকে আমি এমন শিক্ষা দেব, বুঝতে পারবে।" কথা শুনে মনে হল, এই রাকেশ লোকটা পাতাল রেলের কিছু কাজ ছিনিয়ে নিয়েছে।

ফের বাবলুর ফোন, "প্যাকেটটা চেতলায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখান থেকে একজন পার্ক সার্কাসে পৌঁছে দেবে।" সুখিজির গলা, "তোমাদের এই কালা ধান্ধায় আমি কিন্তু আর নেই। পুলিশকে বলে লোকটাকে আমি ধরিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "আপনার টাকা শিগগির পেয়ে যাবেন।" সুখিজি, "আগে পাই। তারপর দেখা যাবে। তোমরা আমার সঙ্গে চিটিংবাজি করেছ।" বাবলু বলল, "চিটিংবাজি আমরা করিনি। করেছে ধিনসা। ওকে ধরুন।"

ক্যাসেটে বুলুদির কথাবার্তাও আছে। দিবাকরদার সম্পর্কে অভিযোগ করছে। "ওকে একটু টাইট দাও তো। সুরমার বাড়িতে গিয়ে আজকাল পড়ে থাকে।" তার মানে, বুলুদি জানত, দিবাকরদা পিঙ্কিদের বাড়িতে যায়। সুখি বলল, "তোমার কী। তোমার তো কোনও ক্ষতি করেনি।" বাংলাদেশে নাচের দল নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নানা কথাবার্তা। হিসাব ভাগাভাগি করছে বুলুদি। এ নিয়ে রাগারাগি। পাতাল রেলের কাজ নিয়েও টাকা চাইছে বুলুদি। "তুমি অর্কর টাকা কবে দেবে, বলো।"

ক্যাসেটে সুখিজির একটা কথা শুনে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল।

"সুমিতা, তোমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। তুমি আর কতদিন আমাকে সার্ভিস দিতে পারবে? ঝুলনের বয়স কম। ওকে এখন থেকেই জগৎটা চেনাতে শুরু করো।" বুলুদি বলল, "এ সব স্বপ্ন দেখো না। ও ডেঞ্জারাস মেয়ে। ওর দিকে হাত বাড়ালে, তোমার হাতটাই পুড়ে যাবে।"

অসংখ্য ফোন। ব্যবসায়িক কথাবার্তা। একটা সময় বিরক্তি ধরে গেল। টেপ বন্ধ করে ফের টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। সুখবিন্দর সম্পর্কে নতুন কয়েকটা ধারণা জন্মাল। লোকটা একশো ভাগ বিজনেসম্যান। তবে ব্যবসার খাতিরে যে-কোনও ঘৃণ্য কাজ করতে পারে। কাজ হয়ে গেলে, স্বচ্ছন্দে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে পারে। যেমন আমার সঙ্গে করেছে। শুভঙ্কর দত্তকে পটানোর সময় আমাকে খাতির করত। এখন কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছে। আমাকে আর দরকার নেই। বুলুদির সঙ্গেও একই ব্যবহার করবে, যেদিন বুলুদির রূপ যৌবন চলে যাবে। শেষ কথা, লোকটার নজর পড়েছে ঝুলনের উপর। কথাটা মনে হতেই, আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

ক্যাসেটে আর কী আছে, তা শোনার জন্য ফের সুইচ টিপলাম। ধিনসার গলা, "খৈতানকে শেষ করার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। বাবলু বসিরহাট থেকে একটা লোক পাঠাচ্ছে। খৈতানের লেবার সেজে ও ঢুকে যাবে রাতে। এম জি রোডে কাজটা ওই করে দেবে। সাতাশ মে।" সুখিজি বলল, "কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করছ না। আমাকে তুমি ফাঁসাবে।" ধিনসা বলল, "তুমি কলকাতায় থেকো না। আমিও কাঠমাণ্ডু চলে যাচ্ছি। বাই।" তারপর ফোন কেটে দেওয়ার শব্দ।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। সাতাশে মে তো আজই। টেপ বন্ধ করে বারবার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। "এম জি রোডে কাজটা ওই করে দেবে।" কী করে দেবে

লোকটা? নিশ্চয়ই কোনও খারাপ কাজ। এবং সেটা পাতাল রেলের মহাত্মা গাঁধী রোড স্টেশনে। "লেবার সেজে ও ঢুকে যাবে রাতে।" এখুনি এই ক্যাসেটটা ডি সি ডি ডি-কে শোনানো দরকার। যা করার আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করতে হবে। জামাকাপড় পরে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম।

ঝুলনকে বললাম, "আমি এখুনি বিনায়ক মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে আসছি। তুমি সদর দরজায় তালা দিয়ে রেখো।"

২২

লালবাজারে ডি সি ডি ডি বিনায়ক মল্লিকের সঙ্গে দেখা করা যে এত কঠিন, তা জানতাম না। এর আগে দুদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। দুদিনই আলিপুর রোডে ওঁর বাড়িতে। প্রথম দিন দুর্গা নিয়ে গেছিল। পরের দিন উনি নিজেই লোক মারফত ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাসেটের ব্যাপারটা ওঁকে জানানোর জন্য বাড়িতে ফোন করতেই কে একজন বললেন, উনি এখন লালবাজারে। বাড়িতে কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে লালবাজারে এসেছি। দোতলায় উঠে বিনায়ক মল্লিকের খোঁজ করতেই অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "উনি এখন জরুরি মিটিং করছেন। এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।"

"কিন্তু দেখা না করে আমার উপায় নেই।"

"বলছি তো, কাল বেলা এগারোটার পরে আসবেন।"

বাধ্য হয়ে বললাম, "আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বলুন, পাতাল রেলের একটা ব্যাপারে অর্ক রায়চৌধুরী দেখা করতে চান।"

ভদ্রলোক খুব রূঢ়ভাবে বললেন, "বিরক্ত করবেন না।"

হতাশ হয়েই নীচে নেমে এলাম। যে করেই হোক, আমাকে বিনায়কবাবুর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। লালবাজারের ঠিক উল্টোদিকে একটা এস টি ডি বুথ থেকে ওঁকে সরাসরি ফোন করলাম। ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। কেউ তুলছেন না। তা হলে কি বিনায়কবাবু নিজের ঘরে মিটিংটা করছেন না? হতে পারে। মিটিংটা ডি সি হেড কোয়ার্টার্সের ঘরে হচ্ছে। অথবা পুলিশ কমিশনারের ঘরে। ফোনটা রেখে দিলাম।

লালবাজারের গেটের সামনে কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে ফের এস টি ডি বুথে গিয়ে ঢুকলাম। এবার ফোনটা তুলে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলছেন?"

"বিনায়কবাবুর সঙ্গে একটা জরুরি কথা বলতে চাই। বলুন, পাতাল রেলের ব্যাপারে।"

"ধরুন।"

কয়েক সেকেন্ড পর ফোনে বিনায়কবাবু বললেন, "কে বলছেন?"

নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, "একটা ডকুমেন্ট আপনাকে দেখানোর জন্য এনেছি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আধঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না।"

"শিগগির চলে আসুন। আমি এখনই বেরিয়ে যাব।"

তিন-চার মিনিটের মধ্যেই ফের দোতলায় উঠে এলাম। বিনায়কবাবুর ঘরে ঢুকে দেখি, আরও কয়েকজন বসে। তাদের মধ্যে মেট্রো রেল পুলিশের ও সি গজেন্দর সিংও আছেন। সময় নষ্ট না করে আমি বললাম, "বিনায়কবাবু, আমার মনে হয়, মহাত্মা গাঁধী রোড স্টেশনে

কোনও একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

কথাটা শুনেই ঘরে বসা সবাই পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন।

বিনায়কবাবু বললেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে বললাম, "এই অডিও ক্যাসেটটা থেকে। এখানে কিছু কথাবার্তা টেপ করা আছে। আপনাদের এখানে কি টেপ রেকর্ডার আছে?"

হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটটা নিয়ে বিনায়কবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আমরা লেটেস্ট একটা মেশিন এনেছি। টেপ থেকে সরাসরি কথাবার্তা টাইপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।"

ইন্টারকমে ফোন করে একজন অফিসারকে ডেকে নিলেন বিনায়কবাবু। তাঁকে বললেন, "যত শিগগির সম্ভব ট্রান্সক্রাইব করে নিয়ে এসো।" তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, "কথাবার্তা কি আপনি শুনেছেন? যা জানেন, বলুন।"

বললাম, "পাতাল রেলে এখন রিনোভেশনের কাজ চলছে। রাতের দিকে কাজ করছে ঠিকাদারদের লোকেরা। আমার সন্দেহ, ঠিকাদারদের শ্রমিকদের সঙ্গে একজনকে আজ এম জি রোডে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে লোকটা কোনও ক্ষতি করে দেবে।"

এবারও দেখলাম, বিনায়কবাবু তাকালেন অন্য অফিসারদের দিকে। কেন জানি না, আমার মনে হল, আমি আসার আগে এঁরা এই প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করছিলেন। বিনায়কবাবু বললেন, "কে এই কাজটা করতে পারেন, আপনি জানেন?"

"ধিনসা বলে একজন। পুরো নামটা জানি না। ভদ্রলোক নর্মদা কন্সট্রাকশন্স বলে এক কোম্পানির মালিক।"

"উনি কেন পাতাল রেলের ক্ষতি করবেন?"

"মনে হয়, বিজনেস রাইভালরি।" বলেই খেতান কন্সট্রাকশন্সের কথাটা সবিস্তারে বললাম।

"আই সি। আপনি এই লোকটাকে কখনও দেখেছেন?"

"না। তবে ধিনসার পার্টনারকে জানি। সুখবিন্দর সিং ফ্লোরা। ওর কাছ থেকেই ধিনসার সব খবর পাবেন।"

"লোকটাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

"হোটেল দিনরাতে। ওখানে না পেলে আনোয়ার শা রোডের একটা ফ্ল্যাটে। হোটেলের ফোন নম্বর আমার কাছে আছে।"

ফোন নম্বরটা টুকে নিয়ে বিনায়কবাবু একজনকে ইশারা করলেন। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিনায়কবাবু আমাকে বললেন, "আপনি এই ক্যাসেটটা পেলেন কোত্থেকে।"

"হোটেলের টেলিফোন অপারেটর আমার খুব পরিচিত। ওর কথা শুনেই আমি সেদিন পার্ক সার্কাসে প্যাকেটটা দিতে যাইনি। আপনাকে ওর কথা আগে বলেছিলাম। ক্যাসেটটা ওই আমাকে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ। এখন মনে পড়ছে। অর্কবাবু, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। একটা কথা বলুন তো, ঠিকাদারদের যে সব লোক রাতে পাতাল রেলে কাজ করে, তাদের সম্পর্কে ডিটেল খোঁজখবর আগে থেকে নেওয়া হয়?"

"না। ঠিকাদাররা তাদের লেবারদের নামের একটা লিস্ট পাঠিয়ে দেয়। আমরা সেটা দিয়ে দিই মেট্রো রেল পুলিশকে। রাতে ওঁরাই পাতাল রেলের সব গেট বন্ধ করে, ভেতরে

pathagar.net

পাহারা দেন।"

"ঠিক কখন এই লোকগুলো কাজ করতে আসে?"

"শেষ ট্রেন বেরিয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর। ক্যাশ মিলিয়ে রাত দশটা নাগাদ আমরা ওপরে উঠে আসি। তারপরই এম আর পি পুরো স্টেশনের দায়িত্ব নেয়।"

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বিনায়কবাবু বললেন, "তার মানে, আর ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই লেবাররা আসতে শুরু করবে?"

"হ্যাঁ। এসে ওরা ননপেইড এরিয়ায় বসে থাকবে।"

"মহাত্মা গাঁধী রোড স্টেশনের টপোগ্রাফিটা আপনি জানেন?"

"ভাল মতো জানি। অনেকবার যাতায়াতও করেছি।"

"আমাদের সঙ্গে আপনি যেতে পারবেন?"

"অবশ্যই পারব। তবে বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে।"

"তার দরকার নেই। আপনার বাড়ির কাছাকাছি আমাদের লোক আছে। দশ-বারো দিন আগে থেকেই ওরা ঘোরাঘুরি করছে। একটা ছেলেকে ওরা চার দিন আগে ধরেওছে। সে পিস্তলগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেছিল। আপনারা কেউ টের পাননি।"

কথা বলার ফাঁকেই একজন অফিসার এসে জুতোয় শব্দ তুলে স্যালুট জানালেন। তারপর ক্যাসেট আর কয়েক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "স্যার, ট্রান্সক্রাইব করা হয়ে গেছে।"

কাগজগুলোয় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন বিনায়কবাবু। বসার সময় অতটা খেয়াল করিনি, গজেন্দর সিং কখন উঠে এসে আমার বাঁ পাশে বসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে উনি বললেন, "এম জি রোডের এস এসকে আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ। সুপ্রকাশ চাকলাদার। আমাদের চক্রবর্তীদার বন্ধু। প্রায়ই টালিগঞ্জের কোয়ার্টার্সে যাওয়ার আগে কালীঘাটে গল্প করতে আসেন। তা, আপনি কখন এসেছেন?"

"আধ ঘণ্টা আগে। এসে শুনলাম, এঁরা একজন আই এস আই এজেন্টকে ধরেছেন। তার কাছ থেকে খবর পেয়েছেন, পাতাল রেলে বোম্ব ব্লাস্ট হতে পারে।"

শুনে চমকে উঠলাম। পিস্তল পাচারের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণের সম্পর্ক আছে নাকি? পাতাল রেলে আগে কখনও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেনি। না ঘটাটাই অস্বাভাবিক। আমাদের স্টেশনগুলোয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা খুব ঢিলেঢালা। এতদিন যে কিছু হয়নি কেন, সেটাই আশ্চর্যের। শেষ ট্রেন থেকে নেমে যে কেউ যে কোনও স্টেশনে ইচ্ছে করলে লুকিয়ে থাকতে পারে। টাইম বোমা লাগিয়ে রেখে পরদিন প্রথম ট্রেনে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারে। তাকে শুধু গেটটা পেরিয়ে যেতে হবে। ভয় দেখিয়ে হোক, অথবা কোনও কর্মীকে হাত করে।

এসব উল্টো পাল্টা ভাবছি, এমন সময় বিনায়ক মল্লিক বললেন, "অর্কবাবু, এই ঝুলন মেয়েটি কে?"

"আমার হবু স্ত্রী। কেন বলুন তো?"

"আপনার বাড়িতে আর কেউ আছে?"

"এই মুহূর্তে নেই। বাকি মেম্বাররা বাইরে।"

"এর কথা তো আগে আপনি বলেননি? একে একা ফেলে আসা আপনার উচিত হয়নি। আপনি বরং বাড়ি চলে যান। কাল সকালে আমার বাড়িতে একবার দেখা করবেন।"

"ঠিক আছে।"

"দাঁড়ান। আমাদের একটা অ্যাম্বাসাডর গড়িয়াহাটে যাবে। একজনকে অ্যারেস্ট করতে। আপনি সেই গাড়িতে চলে যান।"

বিনায়কবাবু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাতের কাগজগুলো সামনে বসা এক অফিসারকে দিয়ে উনি বললেন, "মিঃ ইসলাম, আপনি চট করে চোখ বুলিয়ে নিন। তদন্তে সাহায্য করবে। অনেকগুলো নতুন তথ্য পেয়ে যাবেন।" কথাগুলো বলেই উনি ফোন তুলে কাকে যেন বললেন, "ব্যারাকপুর থেকে স্নিফার ডগ কি এসে গেছে? ..... গুড। ফোর্স রেডি রাখো। আমরা ঠিক দশটার সময় বেরব।" তারপরই ফোনটা ছেড়ে দিয়ে উনি গজেন্দর সিংকে বললেন, "আপনার রেলওয়ে কমান্ডোদের বলে দিন ঠিক এগারোটার সময় পৌঁছতে। টানেলে আমরা একদল যাব গিরিশ পার্কের দিক থেকে। অন্যদল এম জি রোড থেকে।"

বলেই বিনায়কবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অফিসাররাও। নীচে নেমে আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে উনি বললেন, "বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে জানি না। কাল আপনি একটু বেলার দিকে আসুন।"

অ্যাম্বাসাডরে উঠে সারাটা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এলাম, যদি সত্যিই পাতাল রেলে বিস্ফোরণ হয়, তা হলে কী হতে পারে। অফিস টাইম হলে কমপক্ষে হাজার পাঁচেক লোক মারা যাবেন। তাই কী? না আরও বেশি। একেকটা ট্রেনে হাজার আড়াইয়ের মতো প্যাসেঞ্জার থাকেন। ওই সময়টায় আকছারই বিপরীতমুখী দু'টো ট্রেন কাছাকাছি এসে যায়। তা ছাড়া, বিস্ফোরণ হলে ওপরের বাড়ি ঘরদোরও ভেঙে পড়বে। নিরীহ আরও কিছু লোক মারা পড়বেন। এম জি রোড স্টেশনের গায়ে একটা স্কুল আছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হঠাৎই চক্রবর্তীদার কথা মনে পড়ে গেল। কাল সকালেই অফিসে বসে জলখাবার খাওয়ার সময় চক্রবর্তীদা বলেছিলেন, শ্যামবাজার থেকে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত—চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর ঠিক নীচে বিরাট একটা অঞ্চল জলাধার হয়ে আছে। এম জি রোডে বিস্ফোরণ হলে তো সেই জল সারা পাতাল রেলকে ভাসিয়ে দেবে তা হলে? একেবারে সেই 'ভলকানো' সিনেমার মতো পরিস্থিতি! ওখানে জ্বলন্ত লাভা স্রোত পাতালে ঢুকে পড়েছিল। এখানে ঢুকবে জল। সারা কলকাতার মানুষ এখন নিশ্চিন্তে ঘুমনোর উদযোগ নিচ্ছেন। কেউ জানেনও না, কী একটা মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে, তাদের গর্ব পাতাল রেল!

গাড়িতে বসে ছটফট করতে লাগলাম। বিনায়ক মল্লিক প্রথমে আমাকে থাকতে বলেও, পরে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। পুলিশের সঙ্গে থাকলে পুরো অপারেশনটা নিজের চোখে দেখা যেত। পুলিশ যখন হদিশ পেয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আই এস আই এজেন্টকে ধরে ফেলবে। কলকাতা পুলিশ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। শুনেছি, স্নিফার ডগ-রা খুব দক্ষ। কোথায় বোমা লুকোনো আছে, শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে। বিনায়কবাবু দু'টো কুকুরকে নিয়ে আসতে বললেন। এদের অন্তত ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি পৌঁছে গেলাম। অ্যাম্বাসাডরটা শেতলা মন্দিরের কাছে দাঁড়াতেই, ব্রিজের গায়ে লোকনাথবাবার মন্দিরের কাছ থেকে ভবঘুরে টাইপের একটা লোক উঠে এল। লোকটা গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে, ভেতরে বসে থাকা একজনকে দেখে স্যালুট মারল। ও, এই লোকটা পুলিশের! এর কথাই বিনায়কবাবু তা হলে কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলেছিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। ঘণ্টা তিনেক আগে বাড়ি

থেকে বেরিয়েছি। এতক্ষণে ঝুলন নিশ্চয় চিন্তায় পড়ে গেছে।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল ঝুলন। ফিসফিস করে বলল, "দিদিভাই এসেছে।"

"কখন?"

"তুমি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই।"

"কিছু বলল?"

"না। এসেই ড্রিঙ্ক করতে বসে গেল। এখন গোছগাছ করছে। একবার তোমার খোঁজ করেছিল। বলেছি, তুমি অফিস থেকে ফেরোনি।"

"সঙ্গে আর কেউ আছে?"

"না। তবে একটা ফোন এসেছিল। হোটেল দিনরাত থেকে। সুখিজিকে যা-তা বলে দিল। বলল, তুমি একটা বাস্টার্ড। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। হঠাৎ কেন এত মেজাজ খারাপ করল, বুঝতে পারলাম না।"

"তোমার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করেছে?"

"না। ঢাকা থেকে আমার জন্য দু'টো জামদানি শাড়ি নিয়ে এসেছে। সেগুলো দেওয়ার সময়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করল। বোধহয় কিছু দেবে।"

আমি ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ঝুলন পিছন থেকে বলল, "এই শোনো, রোববার তা হলে কী হবে? দিদিভাই ঢোকার আগে অমিয়দাকে ফোন করেছিলাম। আরতিদি বলল, সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।"

বললাম, "কী আবার হবে? দরকার হলে বিয়ের কথা দিদিভাইকে স্পষ্ট করে বলতে হবে।"

"সেই সময় আমি কিন্তু সামনে থাকব না।"

হেসে বললাম, "থেকো না। কিন্তু এত ভয় পাওয়ার কী আছে?" ঝুলনকে সাহস দিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজেও নিশ্চিত নই, কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারব কি না। মনটা হঠাৎই চঞ্চল হয়ে উঠল। আর মাত্র দু'টো দিন বাকি। এই সময়টায় বুলুদি না এলেই ভাল হত। কপালে কী আছে, কে জানে? গত কয়েকটা দিন আমার বেশ কাটছে। একেকটা কারণে উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে। মনোময়বাবু একটা সমস্যা খাড়া করে দিলেন। এখন আবার এসে হাজির হল বুলুদি!

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বুলুদি হঠাৎ নিজেই হাজির হল আমার ঘরে। দু'হাতে ধরা একটা প্যাকেট। বলল, "এই নে ভাই। তোর জন্য একটা ভি সি আর নিয়ে এসেছি।"

বললাম, "এত দাম দিয়ে কিনতে গেলে কেন দিদিভাই? এখানেই তো এসব জিনিস পাওয়া যায়।"

"এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপে পেয়ে গেলাম। অনেক সস্তা।"

"তোমাদের প্রোগ্রাম কেমন হল ওখানে?"

"দারুণ"। বলে সোফায় বসে পড়ল বুলুদি। ঠিক আড্ডা মারার মেজাজে। তারপর বলল, "সব থেকে বড় লাভ হল আমার, তোর রনিদার সঙ্গে বহু বছর পর দেখা হয়ে গেল।"

অবাক হয়ে বললাম, "রনিদা? রনিদা ওখানে কেন?"

"আর বলিস না। ঢাকায় আমার প্রথম প্রোগ্রাম হয়ে যাওয়ার পর, রাতে হোটেলে ফিরে দেখি বিরাট একটা ফুলের তোড়া কে যেন আমাকে পাঠিয়েছে। তলায় একটা কার্ড। তাতে

লেখা রণদেব মিত্র। আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। মাঝ রাতে ফোন। তোর রনিদা সে রকম পাগলাটেই আছে রে। সেরাটন হোটেল থেকে ফোন করে বলল, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখুনি চলে আসবে।"

রনিদাকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। কাউকে সে কথা বলিনি। হঠাৎ সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, "রনিদা তো আমেরিকায় ছিল। ঢাকায় কী জন্য গেছিল তা হলে?"

"সে এক বিরাট ইতিহাস। আমেরিকায় সফটওয়ার নিয়ে কী কাজটাজ করে ও নাকি নিজের কোম্পানি খুলেছে। এখন বিলিওনিয়ার। ঢাকায় গেছিল ওর ওই কোম্পানিরই কাজে। কাগজে দেখেছে, আমার প্রোগ্রামের কথা। ঠিক খুঁজে বের করেছে। উফ্, ওকে দেখে আমি এত এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম যে, তোকে বোঝাতে পারব না। আমাদের বেহালারই একটা ছেলে, ভাবতে পারিস, কী উন্নতিটাই না করেছে?"

তাল মিলিয়ে বললাম, "রনিদার মতো স্কলার, আমাদের পাড়ায় ক'টা ছিল, বলো?"

"ঠিক বলেছিস, আমি লোক চিনতে ভুল করেছিলাম রে। বাংলাদেশে যে ক'দিন ছিলাম, ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল। আমার মেয়েদের কত জিনিস দিয়েছে, জানিস? এখনও আমার পিছু ছাড়েনি। কলকাতায় এসেছে। আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইছে।"

"কোথায় আছে এখন রনিদা?"

"তাজ বেঙ্গলে। কী ক্ষমতা ওর জানিস? দু'দিনের মধ্যেই আমার ভিসা বের করে নিয়ে এল। রোববার আমি ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছি রে।"

মনে হল, পাতাল রেলের বোমাটা কেউ আমার সামনে ফাটাল। বললাম, "চলে যাচ্ছ, মানে?"

"এত অবাক হচ্ছিস কেন? এই সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? ওখানে ও নাচের একটা অ্যাকাডেমি করে দেবে বলেছে। এখানে পড়ে থেকে কী হবে, বল তো? তোর দিবাকরদা যা নোংরামি করল আমার সঙ্গে, ওকে হাজবেন্ড ভাবতেও ঘেন্না লাগে এখন। আর ওর ভাইটা তো আরও ছোটলোক। এ বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াতে চাইছে। নতুন স্কুলের বাড়িওয়ালাকেও ভাঙচি দিয়ে এসেছে। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল বাংলাদেশ যাওয়ার আগে।"

"আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাবে?"

"উপায় নেই রে। তোর জন্য আমার কোনও চিন্তা নেই। ঝুলনটার জন্যই আমার যত চিন্তা। বিয়ের পর যখন এ বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন তোর দিবাকরদার মা আমার হাতে ঝুলনকে দিয়ে বললেন, "এই মেয়েটাকে তোমার কাছে দিয়ে গেলাম বউমা। একে মানুষ কোরো।" ঝুলনের তখন কতই বা বয়স? বড় জোর ছ' বছর। দিবাকরের কোনও বোন আছে বলে জানতাম না। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মেয়েটা কে মা?" উনি বললেন, "এর পরিচয়টা পরে দেব মা।"

"পরে শুনলাম, কোনও ব্লাড রিলেশন নেই। ঝুলনকে উনি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। একথা অন্যরা কেউ জানে না। পাড়া প্রতিবেশীরাও না। পাড়ার লোক জানে, তোর দিবাকরদার দূর সম্পর্কের বোন।"

কথাগুলো শুনে আমি ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম। ঝুলন তা হলে দিবাকরদার কেউ

pathagar.net

না? ও কে তা হলে? জিজ্ঞেস করলাম, "হাসপাতাল থেকে ঝুলনকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন... তার মানে?"

"সেই কথাটাই তো তোকে বলতে যাচ্ছি। তুই তখন ছোট। কলকাতায় যখন পাতাল রেল তৈরি হচ্ছিল, তখন বাইরে থেকে প্রচুর লেবার নিয়ে এসেছিল ঠিকাদাররা। ওরা দল বেঁধে থাকত ময়দানের একটা টিলায়।"

বললাম, "জানি। জায়গাটার নামই হয়ে গেছিল সাঁওতাল পল্লী।"

"হ্যাঁ। ঝুলনের সাঁওতালি মা তখন ওখানেই থাকত। প্রেগনেন্ট অবস্থায় কাজ করার সময় একদিন পাতালেই জন্ম নেয় ঝুলন। অন্য মেয়েরা মা আর বাচ্চাকে ধরাধরি করে তুলে আনে। পি জি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ইনফেকশন হয়ে পরের দিনই ঝুলনের মা মারা যায়। অনেক চেষ্টা করেও তোর দিবাকরদার মা সাঁওতালি মেয়েটাকে বাঁচাতে পারেনি। বাচ্চাটা এ'কদিন হাসপাতালেই পড়ে ছিল। ওদের সমাজের কেউ নিতে আসেনি। পরে জানা গেল, ওর বাবা বাঙালি। সেই কারণে বাচ্চাটাকে নিয়ে কেউ আগ্রহ দেখায়নি। তোর দিবাকরদার মা তখন সুপারকে বলে বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। নাম দিলেন ঝুলন। সেই থেকে ও এ বাড়িতে।"

অবাক হয়ে বুলুদির মুখে ঝুলনের জন্মবৃত্তান্ত শুনছি। পাঁচ-ছ' বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। কারও মুখে এ সব কথা শুনিনি। দিবাকরদার মাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুনেছি, উনি পি জি হাসপাতালের গাইনিকোলজিস্ট ছিলেন। আমি এ বাড়িতে আসার আগেই উনি মারা যান। উনিই তা হলে বুক দিয়ে আগলে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমার ঝুলনকে? অদ্ভুত লাগছে এ সব শুনতে। গল্প উপন্যাসে পড়েছি। বাস্তবে হয়, কোনও দিন ভাবতেও পারিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম বুলুদির দিকে। ঝুলনের জন্ম তা হলে পাতালে! ঈশ্বরের কী আশ্চর্য খেলা! এই মেয়েটাকেই তিনি পাঠিয়েছেন আমার জীবনসঙ্গিনী করার জন্য?

বুলুদি বলেই যাচ্ছে, কী সব। আমার কানে ঢুকছে না। ভাবছি, ঝুলন নিজে কি জানে, ওর আসল পরিচয়? ওর শরীরে আধা সাঁওতালি রক্ত বইছে? মনে হয় না। ওকেও নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেননি। এক বলতে পারত দিবাকরদা। আশ্চর্য, যেদিন দিবাকরদা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, যাওয়ার সময় আমাদের আশীর্বাদ করে গেল, সেদিনও কিন্তু কিচ্ছু বলেনি। আজ যদি ঝুলনের কানে এ সব কথা যায়, তা হলে মারাত্মক একটা ধাক্কা খাবে। আমি অবশ্য ওকে কিচ্ছু জানাব না। ও সাঁওতালি মায়ের মেয়ে হোক, বা অন্য কেউ আমার তাতে কিছু আসে-যায় না। ঝুলনকে আমি ভালবাসি। আমার ভালবাসা আজ থেকে একটুও কমবে না।

"জানিস ভাই, জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে একবার ফিরে আসব। এখানকার নাচের ট্রুপ ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সময় ঝুলনের একটা ব্যবস্থা করে যাব।" বুলুদি অনুরোধের সুরেই কথাটা শেষ করল, "ততদিন তুই ওকে একটু দেখিস ভাই।"

কথাটা শুনেই মনস্থির করে ফেললাম। এর থেকে ভাল সুযোগ আমি আর পাব না। বললাম, "তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব দিদিভাই? আগে বলো, না করবে না?"

"না রে। বল না। তুইই একমাত্র লোক, আমার কাছ থেকে আজ পর্যন্ত কিচ্ছু চাসনি। বল, তোর কী চাই?"

"ঝুলনকে। আমার হাতে দেবে তুমি দিদিভাই?"

বুলুদি কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই দরজার বাইরে কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হল। দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখি, জ্ঞান হারিয়ে ঝুলন কাত হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরের মেঝেতে!

২৩

বুলুদি নীচে নেমে এল সকাল ন'টা নাগাদ। আমার ঘরে ঢুকে বলল, "ঝুলন কেমন আছে রে?"

এই সাত সকালেই স্নান সেরে নিয়েছে। পরনে বাটিকের সালোয়ার-কামিজ। হালকা মেকাপ করেছে। দেখে মনে হল, বুলুদি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি। হাতে একটা গয়নার বাক্স। সেটা টেবলের উপর রেখে বুলুদি ফের বলল, "কাল রাতে আমি তো ঘাবড়েই গেছিলাম। ভাগ্যিস, তুই গিয়ে মহিম ডাক্তারকে ডেকে আনলি।"

বললাম, "ভোরের দিকে জ্বরটা ছেড়ে গেছে। রাতে তুমি উঠে যাওয়ার পরও ভুলভাল বকছিল। তার পর ঘুমোল।"

কাল রাতে রান্নাঘর থেকে তুলে এনে, ঝুলনকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলাম। চোখ-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই কিছুক্ষণ পর ও চোখ খুলেছিল। তার পরই ছটপট করতে করতে বার বার বলতে শুরু করে, "মাগো, কেন তুমি আমাকে জন্ম দিলে?" দু-একবার উঠে বসারও চেষ্টা করে। কিন্তু আমি আর বুলুদি ওকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ কাঁপিয়ে জ্বর। বাধ্য হয়েই রাত বারোটার সময় বেরিয়ে গিয়ে আমি ডাক্তারকে ডেকে আনি। সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। ঝুলনের পাশে বসে নানা উদ্ভট চিন্তা করেছি।

ঝুলনের কপালে হাত বোলাচ্ছে বুলুদি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটার ওপর খুব মায়া পড়ে গেছে ভাই, বুঝলি। ষোলোটা বছর আমার কাছে ছিল। একটু একরোখা টাইপের। তা ছাড়া ওর সব ভাল। দেখিস, তুই খুব সুখী হবি ভাই। আমি বলছি।"

"তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ, দিদিভাই?"

"হ্যাঁ রে। রনি ভোরবেলায় ফোন করেছিল। আর দেরি করা যাবে না। শোন, কিছু গয়না রেখে গেলাম ঝুলনের জন্য। বিয়ের দিন ওকে পরতে বলিস। একটা নেকলেস রইল। গোটা চারেক বালা, দু'টো আংটি আর কানের দুল। রোববার আমি থাকতে পারছি না বলে কিছু মনে করিস না ভাই।"

"তুমি আমেরিকায় কবে যাচ্ছ দিদিভাই?"

"রোববারই। সোমবার আর্লি মর্নিং শিকাগো পৌঁছে যাব। গিয়েই তোদের ফোন করব। যোগাযোগটা ভাই রাখিস। হ্যাঁরে, তোরা কোথায় থাকবি, কিছু ঠিক করেছিস?"

"না।"

"তা হলে একটা কাজ কর না। প্রতাপাদিত্য রোডে যে ফ্ল্যাটটা আমি ভাড়া নিয়েছিলাম, সেখানে গিয়েই না হয় থাক। দু' বছরের ভাড়া আমি দিয়ে রেখেছি। দীপঙ্কর ছোটলোকটা তোকে এখানে থাকতে দেবে না। ঝুলনকে নিয়ে তুই আমার ফ্ল্যাটেই উঠিস। বাড়িওয়ালা লোকটা তোকে চেনে। যতীন সাহা। তোর কথা দু-তিন দিন জিজ্ঞেসও করেছে। নে, চাবিটা রেখে দে।"

প্রতাপাদিত্য রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তবু যদি একদম ঠেকে যাই, তখন না হয় দেখা যাবে। ভেবে বুলুদির কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে রাখলাম, তার পর বললাম, "সুখিজি যদি ফোন-টোন করে, কিছু বলব?"

হঠাৎ চটে গিয়ে বুলুদি বলল, "একদম পাত্তা দিবি না। পাতাল রেলের কাজটা তুই ওকে করে দিলি, অথচ তোকে একটা পয়সাও ঠেকাল না। বেইমান, এক নম্বরের বেইমান। বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করবে বলে আমাকে নাচাল। সব টাকা-পয়সা আমি দিলাম। রওনা হওয়ার দিন ফোন করে বলে কি না, যেতে পারবে না। ভাগ্যিস আমি কিছু টাকা সঙ্গে রেখে দিয়েছিলাম। না হলে বর্ডারে গিয়ে অথৈ জলে পড়তাম।"

সুখিজি সেদিন কেন ডুব দিয়েছিলেন, সায়ন্তনের মুখে আমি তা শুনেছি। ওঁর স্ত্রী হোটেলে ফোন করে চেঁচামেচি করেছিলেন। বুলুদি জানে না সে সব কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "বাংলাদেশ থেকে ফেরার পর সুখিজির সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?"

"না। আমিই আর যোগাযোগ করিনি। ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ও আমার জন্য যা করেছে, তার চেয়ে আমি ওর জন্য অনেক অনেক বেশি করেছি। সব কথা তোকে বলা যাবে না। আমি অন্তত কাউকে ঠকাইনি।"

"তুমি যে আমেরিকায় যাচ্ছ, দিবাকরদা জানে?"

"না। ওকে বলার তো কোনও দরকার নেই। এক নম্বরের চিট। শোন, এতদিন বলিনি। আজ তোকে বলছি। বিয়ের আগে ও আমাকে বলেছিল, রেকেট অ্যান্ড কোলম্যানে চাকরি করে। বিয়ের পর দেখলাম, বাজে কথা। মায়ের রোজগারে বসে বসে খায়। ওর চেহারাটা দেখে আর কথাবার্তা শুনে আমি ভুল বুঝেছিলাম। খুব শিগগির ধরা পড়ে গেল। যত বাজে বাজে লোক ওর বন্ধু। সুন্দরী বউ পাশে নিয়ে ঘুরলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়...।"

অবাক হয়ে শুনছি বুলুদির কথা। কয়েক বছর একই ছাদের তলায় আছি। অথচ জানতামই না, দিবাকরদা চাকরি করেন না। রোজ সেজেগুজে হয় সকালে, না হয় বিকেলে বেরিয়ে যেতেন। শুনতাম, অফিসে শিফটিং ডিউটি। সবটাই তা হলে ভাঁওতা? টাকার জন্য মাঝে মধ্যেই দিবাকরদাকে ইদানীং হাত পাততে দেখতাম বুলুদির কাছে। এ নিয়ে রাগারাগি হত দু'জনের মধ্যে। তা হলে দোষটা একা বুলুদির নয়।

"অবস্থা বুঝে নিজেই রোজগারে নামলাম।" বুলুদি বলল, "এখানে নাচের স্কুলটা শুরু করে দিলাম। দিবাকরের মা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার নিন্দে আমি করব না। বড় ছেলে বেকার। ছোট ছেলে...পাড়ায় আরও বড় কীর্তি করে গেছে। আমার বিয়ের আগেই পাড়ার একটা মেয়েকে প্রেগনেন্ট করে পালিয়েছে। এই রকম একটা ফ্যামিলিতে এসে এতদিন যে থেকে গেলাম, তা ওই ভদ্রমহিলার জন্য।"

বুলুদির মুখে যত শুনছি, ততই অবাক হচ্ছি। ছোট ছেলে মানে দীপঙ্করদা। তাঁর এই কীর্তি! অথচ লোকটা রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দাঁড়িয়ে সেদিন আমাকে কত বড় বড় কথাই না বলে গেছিল! এ সব কথা আগে জানা থাকলে সেদিন একটা ঘুষিতে দীপঙ্করদার চোয়াল আমি ভেঙে দিতাম।

"ইদানীং তোর দিবাকরদা গোপনে যোগাযোগ রাখছিল ভাইয়ের সঙ্গে। বুঝলাম, বাড়ি থেকে আমাকে তাড়ানোর একটা প্ল্যান করছে। তাই প্রতাপাদিত্য রোডের ওই ফ্ল্যাটটা আমি নিয়ে রেখেছিলাম। আর দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর বুঝলাম, সুখবিন্দরও সুবিধের লোক নয়। আমাকে একদিন বিপদে ফেলবে। মাঝে মধ্যেই ওর লোক এসে প্যাকেট অথবা বাক্স

রেখে যেত আমাদের এ বাড়িতে। একদিন হঠাৎ ফোনে ওর কথাবার্তায় বুঝলাম, ওগুলো সব বেআইনি জিনিস। হয়, আর্মস, না হয় এক্সপ্লোসিভস। আমার এক ছাত্রীর জ্যাঠামশাই হলেন ডি সি ডি ডি বিনায়ক মল্লিক। তার কাছে গিয়ে খুলে সব বললাম। উনি বললেন, আমি লোক লাগিয়ে রাখছি। আপনি এখন বাধা দেবেন না। নিশ্চিন্তে বাংলাদেশে চলে যান।"

ও, দিদিভাই তা হলে আগেই পুলিশকে সব জানিয়েছিল! তাই যদি হয়, তবে আমাকে কেন একটা প্যাকেট পার্ক সার্কাসের ঠিকানায় দিয়ে আসতে বলেছিল? সুযোগ পেয়েই বললাম, "তুমি কি জানতে, যে প্যাকেটটা তুমি আমাকে পার্ক সার্কাসে দিয়ে আসতে বলেছিলে, তাতে পিস্তল ছিল?"

"না তো!" বুলুদি অবাক হয়ে বলল, "আমি কেন তোকে বিপদে ফেলতে যাব? শেষ মুহূর্তে তিনটে মেয়ে বাংলাদেশ গেল না। ওদের টিকিট, ট্রাভেলার্স চেক আর পাশপোর্ট— সব একটা প্যাকেটে ভর্তি করে রেখেছিলাম। যাতে তুই পার্ক সার্কাসে ট্র্যাভেল এজেন্টের আপিসে গিয়ে দিয়ে আসতে পারিস। তুই দিয়ে আসিসনি? চিরকুটে তো সব লেখা ছিল।"

"তুমি কোথায় রেখেছিলে সেই প্যাকেটটা?"

"কেন, টেবলে। দ্যাখ তা হলে এখনও হয়তো সে ভাবেই পড়ে আছে। ছি ছি, এজেন্ট ভদ্রলোক কী ভাববে বল তো।"

কথাটা বলেই বুলুদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে সাদা রঙের একটা প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, "এই তো সেই প্যাকেট। হাতের সামনে রেখে দে। আজ যে করেই হোক, পৌঁছে দিস। ভুলিস না কিন্তু।"

আর ঘরের ভেতর বসল না বুলুদি। প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে উপরে উঠে গেল। সদর দরজা হাট করে খোলা। বাইরে একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু পরেই বুলুদি চলে যাবে। সারা জীবনে আর কখনও দেখা হবে কি না সন্দেহ। কথাটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। কাল বুলুদি বলল বটে, দু'তিন মাস পরে আসবে। এসে নাচের টুপকে নিয়ে যাবে আমেরিকায়। কিন্তু বুলুদিকে আমি চিনি। আর আসবেই না।

গোটা তিনেক সুটকেস গাড়িতে তুলে বুলুদি বেরিয়ে যাওয়ার পরই আমি ঝুলনের কাছে এসে বসলাম। পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। বেচারি, জানতেও পারল না বুলুদি চলে গেল। ইচ্ছে করলে ওকে ডেকে তুলতে পারতাম। কিন্তু জেগে উঠে ও কী আচরণ করবে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। জন্ম পরিচয় জানার পর ঝুলন একটা মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছে। কাল রাতে যখন বুলুদি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল, তখন ও একবার শুধু বলেছিল, "আমিও কেন তখন মরে গেলাম না দিদিভাই?"

কথাটা মনে পড়তেই ঝুলনের কপালে হাত বোলাতে শুরু করলাম। জেগে উঠে ও যদি পাগলামি শুরু করে, তা হলে ফের মহিম ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে। ও সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি ছেড়ে বেরবই না। এই অবস্থায় ওকে একা রেখে কোথাও যাওয়াও বিপদ। কখন কী করে বসবে কে জানে? বেলার দিকে একবার বিনায়ক মল্লিক ওঁর বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। উনি হয়তো আমার প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন। ফোনে বলে দেওয়া যাক, এখন আমি যেতে পারব না।

কর্ডলেসটা হাতে নিতেই হঠাৎ বেজে উঠল। ও প্রান্ত থেকে রুক্ষ গলায় কে যেন বলে

উঠল, "অর্ক রায়চৌধুরী আছে?"

সামান্য খ্যাসখ্যাসে শব্দ হচ্ছে। বললাম, "কে বলছেন?"

"তোর বাপ রে শালা। পুলিশের খোচর হয়েছিস আজকাল, তাই না?"

ফোনটা কারা করতে পারে, চট করে বুঝে নিলাম। এ সব হুমকিতে ভয় পেলে চলে না। বললাম, "কী বলবি, তাড়াতাড়ি বলে ফ্যাল। এখুনি আমাকে ডি সি ডি ডি-র বাড়িতে যেতে হবে।"

"এই শুয়োরের বাচ্চা। আমাদের ডি সি ডি ডি দেখাস না। নোটের বান্ডিল ছুড়ে মারলে সব শালা হাত গুটিয়ে নেবে। তুই নিজেকে বিরাট মাস্তান ভাবছিস, না? একদম ঝাঁঝরা করে দেব তোকে।"

"চেষ্টা করে দ্যাখ।" বললাম, "সাহস থাকলে সামনে এসে দাঁড়াতি। ফোনে ঘেউ ঘেউ করতি না।"

"চুপ শালা। বহুত লোকসান করিয়ে দিয়েছিস। আগে তোর বাড়ি থেকে ওই মেয়েটাকে তুলে আনব। তারপর তোর ব্যবস্থা করছি।"

বলেই ফোন ছেড়ে দিল লোকটা। কেন জানি না, মনে হল আবার করবে। কর্ডলেসটা হাতের কাছেই রাখলাম। আমার গলা শুনে ঝুলনের ঘুম ভেঙে গেছে। ও চোখ মেলে তাকিয়েছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই ওর চোখের কোণ ভিজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ও বালিশে মুখ লুকোল। এই সময়ে কথা না বলাই ভাল। কাঁদলে ও খানিকটা হালকা হবে। ভেবে ওর চুলে হাত বোলাতে লাগলাম।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। নিশ্চয়ই সেই লোকটার। কর্ডলেসটা তুলেই বললাম, "ফের তুই ডিসটার্ব করছিস?"

ও প্রান্তে অমিয়র গলা, "বাহ্ চমৎকার! বিয়ের আগেই এ সব বলছিস। বিয়ের পর তোর বাড়িতে গেলে তো ঢুকতেই দিবি না।"

"আই অ্যাম সরি অমিয়। একটু আগে একটা লোক ভয় দেখাল, আমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। ঝুলনকে তুলে নিয়ে যাবে। ভাবলাম, সে-ই বোধহয় ডিসটার্ব করছে। যাক, কী জন্য ফোনটা করলি, বল।"

"সকালে টি ভি নিউজ কিছু শুনেছিস?"

"না তো। কী বলেছে টি ভিতে?"

"আরেকটু হলে তো পাতাল রেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।"

"কেন?"

"আই এস আই এজেন্টরা নাকি আমাদের এম জি রোডে ব্লাস্ট করার চক্রান্ত করেছিল। খবর পেয়ে কলকাতার পুলিশ কাল রাতে ওই এজেন্টকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। তার কাছ থেকে আর ডি এক্স, ডিটোনেটর—আরও কী কী সব উদ্ধারও করেছে।"

"টাইম বোমা কি ফিক্স করে ফেলেছিল?"

"না, পারেনি। তার আগেই ধরা পড়ে। এই মাত্তর তোদের গজেন্দর সিংয়ের ইন্টারভিউ দেখাল। কী কাণ্ড বল তো?"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, কোনও অঘটন ঘটেনি। জিজ্ঞাসা করলাম, "টিভি নিউজে আর কী বলল রে?"

"ডি সি ডি ডি-র ইন্টারভিউ দেখাল। উনি বললেন, পাতাল রেলের এক কর্মীর কাছ

থেকে টিপস না পেলে এই আই এস আই এজেন্টকে ধরা সম্ভব হত না। এরপরই আমাদের জি এম-কে আচ্ছা করে ঝাড়ল সাংবাদিকরা। মুখ চুন করে জি এম বলল, পাতাল রেলের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট নতুন করে ভাবা হবে। তিন মেম্বারের একটা কমিটি এই কাজটা করে একটা রিপোর্ট দেবে। আর হ্যাঁ, জি এম বলল, কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে আমাদের সেই স্টাফের নামটা পেয়েছে। তাকে অ্যাওয়ার্ড এবং প্রোমোশন দুটোই দেওয়া হবে। মালটা কে হতে পারে, বল তো? যার আন্ডারগ্রাউন্ডে এত বড় কানেকশন আছে?"

বললাম, "টপ লেবেলের কেউ হবে। তুই তো অফিসে গেলেই সব জানতে পারবি।"

"না রে, আজ অফিসে যেতে পারব না।"

"কেন?"

"তোর বিয়ের ব্যাপারেই কিছু কেনাকাটা করার আছে। বেলার দিকে আরতিকে নিয়ে বেরব। তোর কখন ডিউটি?"

"বিকেলে। কিন্তু বাড়িতে যা অবস্থা, বেরতে পারব কি না সন্দেহ।"

"বাড়িতে আবার কী হল তোর?"

"ফোনে বলা যাবে না। কাল রাত থেকে ঝুলন একটা ব্যাপারে খুব আপসেট হয়ে পড়েছে।"

"তার মানে? কী এমন ব্যাপার? বিয়ের ব্যাপারে বেঁকে বসেনি তো?"

"ঠিক তা নয়। তবে বেঁকে বসতেও পারে।"

"ভ্যানতাড়ামো না করে আমায় খুলে সব বল তো। এ দিকে, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এখন তোরা পিছিয়ে যাবি, তা হয় না।"

"বললাম তো, ফোনে সব বলা যাবে না।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে অমিয় বলল, "ঝুলনকে তুই একবার ফোনটা দে। আমি কথা বলি।"

"ও এখন কথা বলার মতো অবস্থায় নেই রে। পরে তোকে ধরিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ অমিয়, তুই কিছু মনে করিস না।"

আহত গলায় অমিয় বলল, "ঠিক আছে। তা হলে থাক। দু'টো-আড়াইটে অবধি আমি বাড়িতে আছি। সুযোগ পেলে ফোন করিস।"

কর্ডলেসের সুইচ অফ করে দেখি, বালিশে মুখ গুঁজে তেমনভাবেই ঝুলন শুয়ে আছে। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মমতায় মনটা ভরে গেল। ওর পিঠের অনেকটাই অনাবৃত। অন্য সময় হলে চুমুতে ভরিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল সকালের সঙ্গে আজ সকালের অনেক তফাত। এখন আদর করলেও ও কিন্তু সাড়া দেবে না।

তোয়ালে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার মাথাটাই ভার হয়ে আছে। স্নান করে নিলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। কলঘরে ঢোকার মুখে হঠাৎই মনে হল, কাল রাতে বিনায়ক মল্লিক যদি লালবাজার থেকে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে না দিতেন, তা হলে বুলুদির সঙ্গে আমার দেখা হত না। আর দেখা না হলে, কত কী আমার অজানা থেকে যেত। দিবাকরদা, দীপঙ্করদার অতীত নিয়ে কিছুই জানতে পারতাম না। বুলুদিকেও আমার নতুন করে চেনা হত না।

কলঘরে ঢুকে মাথায় জল ঢালতেই অনিদ্রার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। চৌবাচ্চা থেকে জল ঢেলেই যেতে থাকলাম। অন্য দিন হলে দোতলার বারান্দা থেকে ঝুলন আমাকে বকত। "চৌবাচ্চার জল সব খালি করে দেবে, না আমার জন্য কিছু রাখবে? বেলা তিনটের আগে কিন্তু আর জল আসবে না।" আমি জানি, আজ টের পেলেও ও উঠে এসে এ সব কথা বলবে না। একটু আগে আমার চোখে চোখ পড়তেই ও কেঁদে ভাসাল। কান্নার হয়তো ভাষা আছে। আমি জানি না। তবে ওর কান্না দেখে এটুকু মনে হল, নিজের ওপর অভিমানেই যেন ভুল করে না বসে। নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেয়। তা অবশ্য আমি হতে দেব না। ও কোনও ভুল করলেও, আমি অন্তত করব না।

গা মুছে ঘরে ফিরে এসে দেখি, ঝুলন বিছানায় তেমনভাবেই শুয়ে রয়েছে। মহিম ডাক্তারের ইঞ্জেকশনের জের। ঘুম গাঢ় হলে ওর মনটা অনেক শান্ত হয়ে আসবে। কোনও শব্দ না করে পাজামা-পাঞ্জাবি গলিয়ে নিলাম। কাল রাত থেকে পেটে কিছু পড়েনি। হঠাৎই খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। কাল রাতে আমি আর বুলুদি ঝুলনকে নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলাম, খাওয়ার সময়ই পাইনি। রান্নাঘরে সব খাবার ঢাকা দেওয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে বাসন মাজতে এসে গঙ্গার মা বকবক করে গেছে , "তোমাদের কেমন ধারা সংসার গো? কত গরিব দুখী খেতে পায় না। আর রোজ দেখি তোমরা লক্ষ্মীর দান ফেলে দিচ্ছ।"

চট করে হিজড়ার মোড় থেকে কচুরি-তরকারি কিনে আনার জন্য বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি রেখা। সঙ্গে ওর ভাই বিমল। আমাকে দেখেই রেখা বলল, "ঝুলন নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে অর্কদা? হঠাৎ কী হল ওর?"

প্রশ্ন করতে করতেই ও ভেতরে ঢুকে এল। বললাম, "তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?"

"মহিম ডাক্তার। ভাইকে নিয়ে চেম্বারে গেছিলাম। ফুটবল খেলতে গিয়ে কাল ও চোট পেয়েছে। তখনই ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার বন্ধু তো খুব অসুস্থ। তুমি জানো? আপনি আমাকে একটা ফোন করে দিলেন না কেন অর্কদা?"

ঘরের ভেতর ঢুকে বললাম, "কাল রাত থেকে হঠাৎ জ্বর। তোমার ফোন নম্বরটা আমি জানি না। ভাবছিলাম, তোমার বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসব কি না। ভালই হল, তুমি এসে পড়েছ।"

রেখা ভাইকে ডেকে বলল, "এই, মাকে গিয়ে বল, আমি ঝুলনদের বাড়িতে আছি। আর তুই সেঁক দেওয়া শুরু কর। আমি আসছি।"

কথাগুলো বলেই ও বিছানায় উঠে বসল। ঝুলনের কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, "জ্বর তো এখন নেই অর্কদা। ওর কী হচ্ছে বলুন তো। এই তো কিছুদিন আগে ভুগে উঠল। একবার থরো চেক আপ করান। বিয়ের ঝামেলাটা মিটে যাক, তারপর।"

ঝুলনের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রেখা। দেখতে দেখতে বললাম, "আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসব রেখা। এই, মিনিট পনেরোর জন্য?"

"যান না। আমি আছি। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ দরকার, আমি এখন থাকতে পারি।"

নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। মন্মথবাবুর মিষ্টির দোকানের দিকে হাঁটছি, নিত্যানন্দ মেডিকেল হলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতর থেকে ষষ্ঠীপদবাবু ডাকলেন, "অর্কবাবু, ও অর্কবাবু। একবার আসবেন?"

কয়েকদিন আগে ভদ্রলোক বুলুদি সম্পর্কে একটা বাজে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাই না

শোনার ভান করে হাঁটতে লাগলাম। কয়েক পা এগোতেই দেখি, ষষ্ঠীপদবাবু দোকান থেকে নেমে এসেছেন। হনহন করে আমার কাছে এসে বললেন, "আপনাকে এতবার ডাকলাম, শুনতে পাননি বোধহয়?"

মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। বললাম, "একটু ব্যস্ত আছি। মন্মথবাবুর দোকানে যাচ্ছি। কিছু বলবেন?"

মন্মথবাবুর নামটা শুনেই ষষ্ঠীপদবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। বললেন, "যা শুনছি, তা হলে তা ঠিক। আপনার দিদিভাই নাকি নাচের ট্রুপ নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছেন?"

মনে মনে হাসলাম। মন্মথবাবুর মেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠীপদবাবুর নাতনির লড়াই। নাচের দলে ঢোকা নিয়ে। বুলুদি বাংলাদেশে যাওয়ার আগে দু'জনেই আমাকে ধরেছিলেন। সেই কথাটা মনে পড়ায় বললাম, "ঠিক শুনেছেন।"

"দেখবেন, এ বার যেন আমার নাতনিটা বাদ না পড়ে। গতবার একটা উড়ো চিঠি পেয়ে মেয়েটাকে পাঠালাম না। এখন কান্নাকাটি করছে। অর্কবাবু, প্লিজ আমার কথা একটু মনে রাখবেন।"

ঘাড় নেড়ে আর দাঁড়ালাম না। মন্মথবাবুর দোকানে গিয়ে কচুরি আর জিলিপি খেয়ে মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়িতে ফিরে এলাম। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল রেখা। উঠোনের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "কী ব্যাপার অর্কদা? ঘুম থেকে উঠে ঝুলন এ কী পাগলামি শুরু করেছে?"

বুকটা ধক করে উঠল। বললাম, "কেন, কী হয়েছে?"

"বলছে, অর্কদাকে বল, বিয়েটা ক্যানসেল করে দিতে। এ বিয়ে হতে পারে না। আমার মত নেই।"

pathagar.net

২৪

এস এস-দের ঘরে ঢুকতেই চক্রবর্তীদা বললেন, "আয় অর্ক, তোকে একটু ছুঁয়ে রাখি। কপালটা যদি ফেরে। তোর তো দেখছি, বেস্পতি তুঙ্গে রে।"

চেয়ারে বসে বললাম, "কেন আমার পেছনে লাগছেন চক্রবর্তীদা?"

"তোর পেছনে লাগব? বাব্বা, এমন সাহস আমার আছে নাকি? মেট্রো রেলের কয়েক কোটি টাকা তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস। জি এম তোর খোঁজ করছে। রেল মিনিস্টার তোকে ডেকে পাঠিয়েছে। দু'দিন পর তুই যদি আমার বস হয়ে বসিস, তা হলে তো তোকে স্যার স্যার করতে হবে।"

শুনে চুপ করে রইলাম। চক্রবর্তীদা তো জানেন না, কী প্রচণ্ড একটা মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আজ আমি অফিস করতে এসেছি? বলতে গেলে বাড়ি থেকে পালিয়েই এসেছি। বাড়িতে দমবন্ধ হয়ে আসছিল। বাধ্য হয়ে রেখাকে বললাম, "ঝুলনকে তুমি তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে নিয়ে আসব।"

"কী রে চুপ করে রইলি যে। খবরটা আজ সকালে তোর বউদিই দিল। টি ভি দেখতে দেখতে বলে উঠল, হ্যাঁ গো অর্ক ঠাকুরপোর নামে কী বলছে দ্যাখো তো। পরের বুলেটিনটা শুনেই আমি লাফিয়ে উঠলাম। উফ্ কী আনন্দই যে হল, কী বলব তোকে। তা হ্যাঁরে, তুই মুখটা গোমড়া করে আছিস কেন? তোর কী হয়েছে?"

"মনটা ভাল নেই চক্রবর্তীদা।"

"কী হয়েছে, আমাকে বল তো ভাই। সেই ফ্ল্যাটের প্রবলেম?"

"না। সেটা মিটে গেছে। তার চেয়েও বড় প্রবলেম। ঝুলন শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছে। কাল রেজিস্ট্রি করার কথা। বলছে করবে না।"

"সে কী রে!" চেয়ারে সিধে হয়ে বসে চক্রবর্তীদা বললেন, "কেন?"

কাল রাত থেকে যা হয়েছে, সব খুলে বললাম। শুনে চক্রবর্তীদা হেসে বললেন, "দূর বোকা। এই সামান্য কারণে এত ভেঙে পড়লে, তুই তো সংসারই করতে পারবি না। ঝুলন তো তোকে অপছন্দ করছে না। নিজের অভিমানে এ সব কথা বলছে। তুই বাড়ি চলে যা। দু'চারটে ভালবাসার কথা বল। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর ওর কোনও বন্ধুটন্ধু আছে? অথবা ও খুব বিশ্বাস করে এমন কেউ? তাকে গিয়ে ধর। সে-ই তোর কাজটা অনেক হালকা করে দেবে।"

বললাম, "না চক্রবর্তীদা। সে চেষ্টাও করেছি। কিছু হয়নি। এমন গোঁ ধরে আছে, কোনও কথাই শুনছে না। সারা দুপুর কিছু মুখে দিল না। বলল, আগে তুমি আমার কথা শোনো। তারপর তোমার কথা শুনব।"

"শরীরে আধা আদিবাসী রক্ত বইছে তো, একটু একরোখা হবেই। এই সব মেয়ে যাকে ভালবাসবে, তার জন্য জান দিয়ে দেবে। তুই আবার রাগ-মাগ দেখাতে যাস না।"

"পাগল হয়েছেন? ওর তো কেউই নেই। আমি রাগ দেখালে ও সহ্যই করতে পারবে না।"

"দুপুরে তুই কিছু খেয়েছিস? তোর মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে, না। তোর বউদি আজ পাউরুটির পোলাও করে পাঠিয়েছে। নে, পেটে কিছু দে। ভরা পেটে থাকলে চিন্তা করতে পারবি।"

বলেই টিফিন কেরিয়ার খুলতে শুরু করলেন চক্রবর্তীদা। খাওয়ার রুচি নেই। কিন্তু বললেও চক্রবর্তীদা শুনবেন না। জোর করে খাওয়াবেন। তাই চুপ করে রইলাম। বাটিতে পাউরুটির পোলাও তুলে দিয়ে চক্রবর্তীদা বললেন, "হ্যাঁরে অর্ক, ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে?"

আচমকা এই প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিলাম না। তবুও বললাম, "হ্যাঁ।"

"ব্যস, ব্যস। তা হলে আর চিন্তা করিস না। এই মেয়ে কখনও তোকে ছাড়তে পারবে না। পোলাও খেয়েই তুই বাড়ি ফিরে যা। গিয়ে একটু আদর-টাদর কর। দেখবি, হাওয়া ঘুরে গেছে।"

"তা হয় নাকি?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চক্রবর্তীদা। বললেন, "হয় না মানে? তোর বউদির কত গোয়ার্তুমি আমি ঠাণ্ডা করে দিয়েছি, তা জানিস? যাক গে, নীচে একটা ইন্সপেকশন করার আছে। কন্ট্রাক্টররা নাকি পটুয়াপাড়ার ছবিগুলো ঠিকমতো বসায়নি। কে একজন কমপ্লেন করে দিয়েছে। যাই, দেখে আসি।"

বলেই চক্রবর্তীদা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। পাউরুটির পোলাও মুখে দিয়ে হঠাৎ মনে হল, বাড়িতে ঝুলন কিছু খায়নি। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছেটা উবে গেল। উঠে গিয়ে বাথরুমের নর্দমায় সব ফেলে দিয়ে এলাম। চক্রবর্তীদা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন। কিন্তু আমার উপায় নেই। জীবনের সব থেকে প্রিয় মানুষটাকে অভুক্ত রেখে, আমার পক্ষে খাওয়া

কোনওমতেই সম্ভব না। ও যদি অনশনের জেদ করতে পারে, তা হলে আমিই বা কেন তা দেখাব না?

চক্রবর্তীদা কত সহজে সমস্যার সমাধান করে গেলেন। সবার জীবনে কি তা হয়? হলে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এত বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটতই না। এই ক'দিন আগেও আমার মনে হত, শারীরিক বন্ধনটাই আসল। তারপরে আসে মন। এই একটা ঘটনা, সেই ধারণাটাকে বদলে দিচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি, মনের বন্ধনটাই সব। ঝুলনের মনটাই ভেঙে গেছে। আমাদের সম্পর্কেও তাই চিড় খেয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেটা মেরামত করা দরকার। কিন্তু কীভাবে সেটা করা সম্ভব, বুঝতে পারছি না।

টিফিন কেরিয়ারের বাটিটা টেবলের ওপর রেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাঁ দিকে কাউন্টারে বসে টিকিট বিক্রি করছে সীতাংশু আর সুমন্ত্র। সামনে বেশ লাইন পড়ে গেছে। ওদের মাথা তোলার সময় এখন নেই। বেলা প্রায় চারটে। এই সময়টায় ভিড় হয় না। নিশ্চয়ই ওপরের রাস্তায় কিছু ঘটেছে। বাস-ট্রামের অনেক যাত্রী তাই নীচে নেমে এসেছেন। পরক্ষণেই মনে হল, কমরেড সুবিনয় চৌধুরীর মরদেহ নিয়ে আজ শোকযাত্রা হওয়ার কথা। সম্ভবত সেই কারণেই ওপরে যানজট। নীচে পাতাল রেলের টিকিট বিক্রি বেড়ে গেছে। সপ্তাহে চার-পাঁচদিন এ রকম শোকযাত্রা হলে পাতাল রেলকে আর লোকসানে চলতে হবে না। কথাটা মনে হতেই হাসি পেল।

"এই যে হিরো নাম্বার ওয়ান। আছেন কেমন?"

তাকিয়ে দেখি দুর্গা ব্যানার্জি। আজ আর নীল পোশাকে নেই। পরনে নীল জিনসের ট্রাউজার্স, ঘিয়ে রঙের টি শার্ট। ওর চেহারাটাই বদলে গেছে। বেশ স্মার্ট লাগছে ওকে দেখতে। বললাম, "চলছে। তুমি নিশ্চয়ই খারাপ নেই।"

"আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে বুঝি?"

"অনেক কথাই মনে হচ্ছে। বলা উচিত হবে কি না জানি না।"

দেখা হলেই দুর্গা আমার সঙ্গে কথার টক্কর মারে। বলল, "যা মনে হচ্ছে, বুঝে-সুঝে বলবেন। আমার সামনে কে আছে, তা তো জানেন।"

"সেই খোঁড়া সার্জেন্ট?"

খিলখিল করে হেসে উঠল দুর্গা। বলল, "বাব্বা, আপনি মনে রাখতেও পারেন বটে। এখন আর খোঁড়া অবস্থায় নেই। দু'পায়ে ভর দিয়ে তিনি ফের দাঁড়িয়েছেন।"

"তার মোটর সাইকেলের পিছনে বসে কোথাও যাচ্ছ বুঝি?"

"ঠিক ধরেছেন তো। সত্যি আপনার আই কিউ লেভেলের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। আন্দুলে যাচ্ছি।"

"যা ড্রেস করেছ, ভাবলাম আমেরিকায়।"

"আস্তে, আস্তে। শুনতে পেলে আপনার চোখ কিন্তু গেলে দেবে।"

"সেটাও ট্র্যাফিক আইনে পড়ে নাকি? দেখো, আমার কোনও গাড়ি নেই। কোনও সার্জেন্টকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।

দুর্গা হার মেনে বলল, "থাক বাবা, আমি আর আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে যাচ্ছি না। তা, আপনার সেই বাড়ির প্রবলেমটা তো সল্‌ভ হয়ে গেছে, তাই না? সর্ষের মধ্যেই ভূত। শুনেছেন কিছু?"

অবাক হয়ে বললাম, "না। সর্ষের মধ্যেই ভূত বলছ কেন?"

"সে কী! কিছুই শোনেননি? আপনার এক রিলেটিভকেই তো পুলিশ ধরেছে। ডি সি ডি ডি কিছু বলেননি আপনাকে?"

"না। আজ অবশ্য ওঁর কাছে যাওয়ার কথা ছিল আমার। যেতে পারিনি। খুলে বলো তো ব্যাপারটা।"

দুর্গা বলল, "আমি সব কথা জানি না। আমাদের থানায় শুনলাম, আই এস আই এজেন্ট বলে যাকে ধরা হয়েছে, তার নাম দীপঙ্কর বসু। আপনারই তো রিলেটিভ, তাই না?"

"কী বলছ তুমি? উনি ধরা পড়লেন কোথায়?"

"এই কাছেই। অপূর্ব মিত্তির লেনে। ভাড়াটে সেজে ছিলেন। জায়গাটা আমাদের থানার আন্ডারে। লোকটাকে আজ ডিউটিতে আসার সময়ও লক আপে দেখেছি। টি ভি-র লোকেদের সে কী ভিড়। তখনই শুনলাম ঘটনাটা।"

"কিন্তু উনি যে আমার রিলেটিভ, তুমি কী করে জানলে?"

"সেটা জানা আর এমনকী কঠিন কাজ? চেতলায় যে বাড়িতে মাল সাপ্লাই হত, লোকটা সে বাড়িরই একজন। নিজেই স্বীকার করেছে মারধর খেয়ে। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিলাম। ডি সি ডি ডি আজ নিজেই এসেছিলেন আমাদের কালীঘাট থানায়। ইন্টারোগেশন করার জন্য। ভাগ্যিস, আপনি আগে ওকে সব জানিয়ে রেখেছিলেন। তাই বেঁচে গেছেন। না হলে পুলিশ কিন্তু আপনাদের বাড়ির কাউকেই ছাড়ত না। আর ওই লোকটাও ইচ্ছে করলে আপনাদের জড়িয়ে দিতে পারত।"

"দীপঙ্করদা এখন কোথায় বলতে পারো?"

"নিশ্চয়ই পুলিশ হাজতে। প্রচণ্ড মারধর খাবে। পুলিশ চার্জশিট তৈরি করবে। দশটা বছর যাতে জেলে পচতে হয়, তার ব্যবস্থা করবে। আমরা একটু অবাকই বলতে পারেন অর্কদা। বাঙালিরা চট করে এই সব কাজে নামে না। এই লোকটা ব্যতিক্রম। একে অবশ্য নামিয়েছে ধিনসা বলে একজন। এর ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও আছে। পুলিশ সব টেনে বের করছে।"

'ধিনসাকে পুলিশ পায়নি?"

"না। পালিয়েছে। ওর এক পার্টনার সুখবিন্দরকেও পুলিশ খুঁজছে। কেউ পার পাবে না অর্কদা। পুলিশ ধরবেই। এখন চলি। ওই দেখুন, আমাকে ধরার জন্য খোঁড়া সার্জেন্ট কেমন গটগট করে আসছে।"

দুর্গা চলে যাওয়ার পর আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আসল কালপ্রিট তা হলে দীপঙ্করদা? বাস্টার্ড, সেদিন আমাকে যা তা বলে গেছিল। দীপঙ্করদা একা নয়। ওঁর সঙ্গে দিবাকরদা আর সুখিরও মস্তিষ্ক ছিল। এক ঢিলে অনেক পাখি মারার ষড়যন্ত্র! পাখিগুলো আমি, বুলুদি আর ঝুলন। আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া যেত। এতে লাভ দীপঙ্করদার। বাড়ির এক তলাটা খালি পেয়ে যেত। সুখবিন্দরের লাভ, সহজেই ঝুলনকে তুলে নিয়ে ওর ব্যবসার কাজে লাগাত। আর তিনজনেরই টার্গেট ছিল বুলুদি। কোনওরকমে ওকে ফাঁসাতে পারলে, দিবাকরদা তাচ্ছিল্যের শোধ নিতে পারত। দীপঙ্করদা পুরো বাড়িটাই খালি পেয়ে যেত। আর সুখবিন্দর একটা শিক্ষা দিতে পারত বুলুদিকে। ওর কবজা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। উফ্ ঈশ্বর আমাদের তিনজনকেই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মনটা এমন ছটফট করে উঠল যে, উপরে উঠে এলাম।

দুর্গা একটা কথা বলল একটু আগে, যেটা সত্যিই মারাত্মক। "লোকটা ইচ্ছে করলে

আপনাদের জড়িয়ে নিতে পারত।" দীপঙ্করদা স্বচ্ছন্দে এখন বলতে পারত, পাতাল রেলে বিস্ফোরণে আমাকে সব খবরাখবর দিয়েছে অর্ক রায়চৌধুরী। লোকে বিশ্বাসও করে নিত। ডাকাত ধরে সবার নেক নজরে পড়াটা তখন ব্যর্থ হয়ে যেত। সব থেকে বড় কথা আমাকে সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হত। পরে প্রমাণ করা খুব কঠিন হত, আমি নির্দোষ।

উফ্, ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। সেদিন চেতলা পার্কে বসে যদি দুর্গা ব্যানার্জির বুদ্ধিটা না নিতাম, তা হলে আজ এখন হাঁটতে পারতাম না রাসবিহারী অ্যাভেনিউ দিয়ে। সকাল থেকে একটার পর একটা চিন্তা মাথায় ঘুরছে। হঠাৎই মনে হল, চেতলার বাড়িটা ছেড়ে যাওয়ার দরকার তো এখন নেই। দীপঙ্করদার কথা দুর্গা যা বলল, তাতে আগামী পাঁচ-সাতটা বছর ওর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঝুলনকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে আমি এই বাড়িতেই বাস করতে পারি। বুলুদি বা দিবাকরদাও নেই। কথাটা মাথায় ঢুকতেই আমি একবার আকাশের দিকে তাকালাম। সেঞ্চুরি করার পর ক্রিকেটাররা যে কারণে তাকায়।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটছি, হঠাৎ অটো নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল ছট্টু। অনেকদিন ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধহয় ধারে কাছে ছিল না। মুখ বাড়িয়ে ও বলল, "অর্কদা, যাচ্ছেন কোথায়?"

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "গড়িয়াহাটের মোড়ে।"

"উঠে আসুন। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি।"

"ভাল আছ?"

"না অর্কদা। ভাইটাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি।"

"এখনও চাকরি পায়নি বুঝি?"

"না, পেয়েছে। মাসখানেক হল এ জি বেঙ্গলে। স্টার্টিং ছ' হাজার টাকা। ভাল চাকরি। কিন্তু চাকরিটা পেয়েই আমার ভাইটা হঠাৎ বিগড়ে গেল অর্কদা। এখন বলছে কী না, আলাদা থাকবে। এত কষ্ট করে ভাইটাকে মানুষ করলাম। কী লাভ হল, বলুন তো?"

কথাটা বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছট্টু। তিন-চার বছর আগে এই ছেলেটার সঙ্গে আমার আলাপ। প্রায় দিনই ওর মুখে ভাইয়ের গল্প শুনেছি। ভাইকে নিয়ে কত স্বপ্ন। ভাই দাঁড়িয়ে গেলে ও আর অটো রিকশা চালাবে না। ফটোগ্রাফি করার খুব শখ ছিল। সেটাই পেশা হিসাবে নেবে। কিন্তু আজ ওকে আক্ষেপ করতে দেখে খারাপই লাগল। বললাম, "এটাই মানুষের ধর্ম। ছট্টু দুঃখ পেও না।"

"না, দুঃখটা আমার জন্য না অর্কদা। দুঃখটা আমার মায়ের জন্য। আমার মা খুব ভেঙে পড়েছে, জানেন। আমাকেই বকছে। তুই নিজে এম কমটা পড়লি না। ভাইকে মানুষ করার জন্য। এখন দ্যাখ, সে কীরকম চোখ উল্টে চলে গেল।"

"কারণটা কী ছট্টু?"

"কী আবার, মহিলা। ভাইয়ের সঙ্গেই টাইপ শিখত একটা মেয়ে। তার সঙ্গে ভাবসাব আছে। সে নাকি বলেছে, বিয়ের পর সাতগুষ্টির লোক নিয়ে থাকতে পারবে না। ভাইটাও একটু বোকা সোকা টাইপের। মা বোধহয় দু'চারটে কটু কথা বলেছিল। ব্যস, সেই যে ভাই বিগড়ে গেল, আর বাড়িতেই এল না। কী বোকা দেখুন, মা হচ্ছে গর্ভধারিণী। তার কথায় রাগ করতে আছে। কী লেখাপড়াটা শিখলি, তা হলে? আমি তো এখনও মাকে প্রণাম না

pathagar.net

করে বাড়ি থেকে বেরই না।"

"মেয়েটা কোথায় থাকে ছট্টু?"

"আমাদের ওদিকেই। জানেন, মেয়েরা মায়ের জাত, ঠিক কথা। আবার মেয়েরাই কিন্তু সব সর্বনাশের মূলে। এই তো সুজয়দার কথাই ধরুন। লোকটাকে এতদিন এত গালমন্দ করেছি। এখন দেখছি, ওর মতো মানুষ হয় না। আসলে বউটাই ছিল খারাপ। আপনাদের ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে লটঘট ছিল। কত চোখে পড়েছে আমাদের। এখন দেখুন, সুজয়দা কেমন বদলে গেছে। রোজ রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে পড়ে থাকছে। বউ মরে গিয়ে লোকটা যেন বেঁচে গেছে।"

কথা বলতে বলতেই গড়িয়াহাটের মোড় এসে গেল। অটো থেকে নেমে পড়লাম। পকেট থেকে পার্সটা বের করতেই ছট্টু জিভ কেটে বলল, "না, অর্কদা, আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি এদিকেই আসছিলাম। আজ আমাদের ধর্না আছে। থানার সামনে। এক হাজার অটো দিয়ে জ্যাম করে দেব পুরো গড়িয়াহাট মোড়। পুলিশের জুলুম আর সহ্য হচ্ছে না। কাজ করে তাড়াতাড়ি চেতলায় চলে যান। আর ঘণ্টা খানেক পর, বাস-ট্রাম কিছুই পাবেন না।"

কথাটা বলেই ছট্টু সোজা থানার দিকে চলে গেল। আমি বিজন সেতুর দিকে পা বাড়ালাম। কেন এলাম, নিজেই জানি না। আলেয়া সিনেমার ঠিক উল্টো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল, একটা সিগারেট খাওয়া যাক। পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে টানতে লাগলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দু'পাশের দোকানের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। আমার চারদিকে ব্যস্ততা। এক জোড়া ছেলেমেয়ে পানের দোকান থেকে সফট ড্রিঙ্কস কিনে খাচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা। ওদের লক্ষ করতে করতেই ফের আমার ঝুলনের কথা মনে এল।

অফিসে আসার আগে আমি আর রেখা মিলে ঝুলনকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু ওর ওই এক গোঁ, "এ বিয়ে হতে পারে না।" বারবার ও একই যুক্তি দিল, "তোমার বাবা আমাকে কিছুতেই মানবেন না।" আমি জানি, বাবা আমার কোনও পছন্দেই অমত করবেন না। ঝুলনকে উনি জানেন। আমি হাসপাতালে থাকার সময় ঝুলনের যত্ন উনি ভুলতে পারেননি। প্রায় চিঠিতেই বাবা লেখেন, "ঝুলন মাকে আমার আশীর্বাদ জানাইও।" আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঝুলনের আসল পরিচয় জানার পরও এ বিয়েতে বাবা আপত্তি করবেন না।

ঝুলন আজ একটা কথা, দু' তিনবার শোনাল, "আমার রাস্তা আমি নিজেই বেছে নেব।" কোন রাস্তা বেছে নেবে ও? জগৎ সম্পর্কে ওর তো কোনও ধারণাই নেই। পাতাল রেলে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার দিনই আমি সেটা বুঝে গেছি। একটা সময় আজ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরে সামলে নিলাম। ওকে কথা দিয়েছি, যত ঝড় ঝাপটাই আসুক, কোনও দিন ওর উপর রাগ করব না। পরে দেখলাম, ওর ওপর রাগ করা যায় না। একটা মেয়ে একটা পরিবারে মানুষ হতে হতে যদি কখনও জানতে পারে, সে যেসব সম্পর্কের মাঝখান দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, সেই সম্পর্কগুলো মিথ্যে, তার মনে তা হলে বিরাট একটা শূন্যতা আসতে বাধ্য। হঠাৎ সে আবিষ্কার করবে, এই পৃথিবীতে আপনজন বলতে তার কেউ নেই। সে একা। নিজেকে ঝুলনের জায়গায় দাঁড় করিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। আর তখনই গভীর ভালবাসায় মনটা ভরে উঠল। না, ঝুলনকে ছাড়া নিজেকে আমি ভাবতেই পারছি না। ভাবা সম্ভব না।

বাড়ি ফেরার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। কাল বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের দু'জনের বেহালায় পৌঁছনোর কথা। সন্ধ্যা সাতটায় দিলু আসবে। ওই সময়টা নাকি শুভ। আরতি পাঁজি দেখে বলেছে, "আটটা কুড়ির মধ্যেই সই সাবুদ সেরে ফেলতে হবে অর্কদা। আর প্রথম রাতটা আমাদের বাড়িতেই কাটিয়ে যাবেন।" রাত কাটানোর কথা এখনও ভাবিনি। হাতে বাইশটা ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে ঝুলনকে রাজি করাতেই হবে। আজ রাতে ওকে পাশে নিয়ে শোব। আদর করতে করতে ওকে বোঝাব। দেখি চক্রবর্তীদার পরামর্শ কাজে দেয় কি না।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে আমার মনে হল, পারব। হঠাৎ ডান দিকে চোখ যেতেই দেখি, একটা গয়নার দোকানে ঢুকছে জুঁই। সঙ্গে মাঝবয়েসি এক ভদ্রমহিলা। জুঁইয়ের মা? হতে পারে। জুঁইয়ের সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল মনোময়বাবুর বাড়িতে। মাঝে একদিন ও আমার খোঁজে এসেছিল কালীঘাট স্টেশনে। দেখা হয়নি। গয়নার দোকান কথাটা মনে হতেই রেখার মুখটা ভেসে উঠল। "বিয়েতে আমার বন্ধুকে কী দিচ্ছেন অর্কদা?" সেদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিল রেখা। ওই প্রশ্নটাই আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল কাচের দরজাটার দিকে।

গয়নার দোকানে আগে কখনও ঢুকিনি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সুন্দরী মহিলা গয়না দেখাচ্ছেন। দেওয়াল জুড়ে কাচ। শো কেসে সাজানো রয়েছে চমৎকার ডিজাইনের সব অলঙ্কার। নিশ্চয়ই অনেক দাম-টাম হবে। দোকানে ঢুকে বোধহয় ভুল করেছি। বেরিয়ে আসব কি না ভাবছি, এমন সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কিছু কিনবেন?"

বললাম, "হ্যাঁ, একটা এনগেজমেন্ট রিং।"

ভদ্রলোক বললেন, "বাঁ দিকে উঠে যান। ওখানেই পাবেন।"

বাঁ দিকে এক ধাপ উঠে চোখে পড়ল সুজাতাকে। নিবারণদার মেয়ে। চোখাচোখি হতেই সুজাতা বলে উঠল, "অর্ককাকু তুমি! কী আশ্চর্য, কী কিনতে এসেছ?"

অন্য সেলসগার্লদের মতো সুজাতাও হলুদ রঙের শাড়ি পরে রয়েছে। সবুজ ব্লাউজ। হঠাৎই যেন মেয়েটা বড় হয়ে গেছে। বহুদিন ওদের খোঁজ নেওয়া হয়নি। পড়াশুনো ছেড়ে এই বয়সে মেয়েটা চাকরিতে ঢুকেছে? বললাম, "তুই এখানে কবে থেকে?"

"বাপির সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই। খবরের কাগজে আমাদের কথা পড়ে এই জুয়েলারি হাউসের মালিক নিজে থেকে চাকরির অফারটা দেন। বাবার চাকরিতে মা ঢুকে গেছে। আমি নাইট কলেজে পড়ছি। তোমরা তো আর কোনও খবরই নাও না আমাদের। তা, কী কিনবে বলো।"

"এনগেজমেন্ট রিং।"

"দাঁড়াও, খুব সুন্দর ডিজাইনের কয়েকটা রিং এসেছে কালই। বউবাজারের শো রুম থেকে। তোমাকে দেখাই। খুব পছন্দ হবে।"

শো কেস থেকে কয়েকটা আংটি বের করে আনল সুজাতা। বললাম, "তুই বেছে দে। আমার তো সব ক'টাই ভাল লাগছে।"

"বিয়ে করছ বুঝি অর্ককাকু। বেশ, আমাদের বাদ দিয়ে? বাপি বেঁচে থাকলে, পারতে? মা জানতে পারলে খুব খুশি হবে। কোথাকার মেয়ে গো? আমি চিনি?"

"না, তুই দেখিসনি। কাল স্রেফ রেজেস্ট্রি। অনুষ্ঠান করে বিয়ে পরে হবে। ঝর্না বউদিকে

বলিস, তখন সবাইকে ডাকব।”

একটা আংটি বেছে নিয়ে সুজাতা বলল, “তুমি কী গো অর্ককাকু? আজকালকার দিনে কি কেউ একা একা এনগেজমেন্ট রিং কিনতে আসে? তুমি সেই আগের মতোই রয়ে গেলে। একটা আংটি আমি পছন্দ করে দিলাম। যদি মাপসই না হয়, তাহলে ফেরত নিয়ে এসো। বদলে দেব। তখন কিন্তু বউকে আনতে ভুলো না।”

হেসে বললাম, “তুইও বদলাসনি সুজাতা। আগের মতো রয়ে গেছিস।”

টাকা দেওয়ার জন্য ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল জুঁইয়ের সঙ্গে। ও না-চেনার ভান করে দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্গে বাড়ির লোকজন আছে। আমার সঙ্গে কথা বললে সম্মান চলে যেতে পারে বলেই বোধহয়। বন্ধুত্বের কথা আমি কিন্তু ওকে বলিনি। মনোময়বাবুর বাড়িতে দোলনায় বসে ও-ই আমাকে বলেছিল। ভালই হল। এর পর কোনও দিন ন্যাকামি করতে এলে আমি বনমালী নস্কর রোডের সেই অর্ক হয়ে যাব। ভদ্রমহিলার সঙ্গে জুঁই কথা বলছে। দু'চারটে কথা শুনেই বুঝলাম, ওর বিয়ে। গয়না কিনতে এসেছে। আমাকে ইচ্ছে করেই শোনাল। হতে পারে।

দোকান থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি করে, অনেক ঘুরে ঘুরে যখন চেতলায় পৌঁছলাম, তখন রাত আটটা। রেখাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছি। এমন সময় রেখা উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, “এ কী, অর্কদা, আপনি? আপনার নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?”

চমকে উঠে বললাম, “না তো! কে দিল খবরটা?”

রেখা মাথায় হাত দিয়ে বলল, “সর্বনাশ। ঘণ্টাখানেক আগে এক ভদ্রলোক এসে খবরটা দিয়ে বললেন, ঝুলনকে নাকি আপনি দেখতে চাইছেন। শুনেই ঝুলন পাগলের মতো ছুটে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। কে এই লোকটা, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল? ঝুলনকে কোথায় নিয়ে গেল?”

কথাগুলো শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। তা হলে ফোনে হুমকি দেওয়া সেই লোকটা সত্যিই ঝুলনকে কিডন্যাপ করল। এক মুহূর্ত লাগল নিজেকে সামলে নিতে। কোনও কথা আর জিজ্ঞেস না করে আমি ফের ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠছে। আমি জানি, ঝুলন এখন কোথায়। ড্রাইভারকে বললাম, “চলুন, যত শিগগির পারেন, গড়িয়াহাটের মোড়ে। হোটেল দিনরাতে।”

ঝুলনের খোঁজ না দিলে আজ সুখির কপালে দুঃখ আছে।

২৫

অমিয়দের বাড়ি যেতে মন চাইছিল না। তবুও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব। আজ সন্ধ্যায় রেজেস্ট্রি বিয়ের সব ব্যবস্থা ও করে রেখেছে। আমি না গেলে, একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে হয়তো ও আর সম্পর্কই রাখবে না আমার সঙ্গে। কাল রাতে একবার ভেবেছিলাম, ঝুলনের ব্যাপারটা ফোনে ওকে জানিয়ে দিই। যাতে পরে বলার সুযোগ না পায়, “এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ তুই আমাকে কিছুই জানালি না?” কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, এ সব কথা ওর বাড়িতে গিয়ে সামনাসামনি বলাই ভাল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ট্যাক্সিতে বেহালা যেতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না। সওয়া পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে যেতে পারব, যদি ঠিক সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। আমাকে একা দেখলে অমিয় আর আরতি নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে। প্রথম প্রশ্নটাই করবে, ঝুলন কোথায়? কী উত্তর দেব, তা ঠিক করে রেখেছি। আমি জানি, ওই সময়টায়, নিজেকে ঠিক রাখতে পারব না। কাল রাতে বাড়ি ফেরার পর থেকে ঝুলনের কথা ভাবলেই বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠছে। চোখের কোণ ভিজে আসছে। পর মুহূর্তেই রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সুখবিন্দরকে পেলে আমি কিন্তু ছাড়ব না। খুঁজে ওকে আমি বের করবই। তারপর নিজের হাতে শাস্তি দেব।

হাঁটতে হাঁটতে দুর্গাপুর ব্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোববার বিকেলে এই সময়টায়, মাঝ রাস্তায় অটোতে জায়গা পাওয়া যায় না। রাসবিহারী থেকে অটো ভর্তি হয়ে আসে। ট্যাক্সিও বেহালার দিকে যেতে চায় না। দু'একটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টায় হাত তুললাম। তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে গেল, একজন ড্রাইভার আবার মুখ বাড়িয়ে বলল, "এত কাছে যাব না দাদা। আপনি বরং অটোতে চলে যান।" শুনে এত রাগ হল যে, পরের ট্যাক্সিটায়, কিছু না বলেই উঠে বসলাম। ড্রাইভার ছেলেটা আমারই বয়সী। বেহালায় যাব শুনে বলল, "ও দিকে যাব না। তারাতলায় খুব জ্যাম। আপনি নেমে যান।"

ছেলেটার কপাল খারাপ। দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জামার পিছন দিকের কলার মুচড়ে ধরে বললাম, "চল শালা। না গেলে, তোকে নামিয়ে একদম পিটিয়ে মারব।"

লুকিং গ্লাসে আমার চোখ মুখ দেখে ছেলেটা খুব ভয় পেয়ে গেল। কোনও কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে ও ট্যাক্সি ছুটিয়ে দিল ব্রিজের উপর। লাথি না মারলে এই সব হারামি ড্রাইভার শায়েস্তা হয় না। শালারা ভাবে কী, ট্যাক্সি চালিয়ে আমাদের দয়া করছে? যখন তখন ভাড়া বাড়াচ্ছে। তার উপর ইচ্ছে-অনিচ্ছে—এখানে যাব না, সেখানে যাব না! মগের মুল্লুক! ছেলেটা আর একটা কথা বললেই আজ নামিয়ে পেটাতাম। একবার একজনকে পিটিয়েওছিলাম। সেদিন আমার সঙ্গে ছিল বুলুদি। রবীন্দ্র সদনে নাচের প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছিল। যাব না বলায়, ড্রাইভারটাকে এমন মেরেছিলাম যে, বুলুদি ভয়ে বলে উঠেছিল, "আর না। ভাই, এ বার ছেড়ে দে।"

লুকিং গ্লাস দিয়ে ড্রাইভার ছেলেটা বারবার তাকাচ্ছে আমার দিকে। বোধহয় মাস্তান ভাবছে। ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। চুলে চিরুনি দেওয়ার সময় পর্যন্ত পাইনি। পরনে লাল রঙের একটা টি শার্ট। হাতের সামনে ছিল, পরে বেরিয়েছি। চোখ মুখে কালি পড়ে গেছে। নিজেকেই আমি এখন চিনতে পারছি না। বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে। আজ এই সময়টায় আমার অন্য পোশাকে বেহালা যাওয়ার কথা। কিন্তু কপালে নেই। ঝুলন ঠিকই বলেছিল সেদিন। মাঝে এমন একটা কিছু ঘটে যাবে, দেখবে তোমাকে আমি পাব না। ঠিক তাই হল।

দুর্গাপুর ব্রিজ থেকে নেমে ছেলেটা ট্যাক্সি ডানদিকে ঘোরাল। আমি সিটে হেলান দিয়ে বসলাম। কপালের শিরা দপদপ করছে। নিজেকে শান্ত করা দরকার। চোখ বুজে রইলাম। পারছি না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাই করতে পারছি না। মেজাজ খারাপ থাকলে আমি যে কোনও দিনই ভয়ঙ্কর। বনমালী নস্কর রোডের অনেকেই সেটা জানে। কাল রাত থেকে মেজাজটা এমন খিঁচড়ে আছে, এই মুহূর্তে তুচ্ছ কারণে আমি মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারি।

কাল রাতে ট্যাক্সি নিয়ে যখন হোটেল দিনরাতে পৌঁছলাম, তখন মাথার ঠিক নেই। ঠিক

ওই রকম মেজাজে। সুখবিন্দর হোটেলে আছে কি না জানার জন্য প্রথমেই আমি টেলিফোন অপারেটরদের ঘরে গিয়ে খোঁজ করেছিলাম। সায়ন্তন বেরিয়ে এসে বলেছিল, "অর্কদা, আপনি? এত রাতে? কী হয়েছে আপনার?"

"সুখবিন্দর হোটেলে আছে কি না, দ্যাখো তো।"

আমার চোখ-মুখ দেখে সায়ন্তন বোধহয় কিছু আন্দাজ করেছিল। একটু ইতস্তত করে বলেছিল, "অফিসিয়ালি নেই। পরশু রাত থেকে নাম পাল্টে একটা ঘরে লুকিয়ে রয়েছে, হোটেল থেকে বেরয়নি। কী ব্যাপার বলুন তো অর্কদা। আপনাকে দেখে ভীষণ এক্সাইটেড মনে হচ্ছে।"

"ঘণ্টাখানেক আগে লোক দিয়ে একটা মেয়েকে সুখবিন্দর কিডন্যাপ করেছে। ওকে এখুনি আমার ধরা দরকার।"

"মাই গড।" সায়ন্তন বলে উঠেছিল, "কে মেয়েটা?"

"আমার হবু স্ত্রী।"

সায়ন্তন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর বলেছিল, "অর্কদা, আপনি ৩০৪ নম্বর ঘরে চলে যান। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে পেয়ে যাবেন। আধ ঘণ্টা আগে একটা মেয়ে ওর ঘরে গেছে।"

কথাটা শোনামাত্রই আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল। টেলিফোন অপারেটরদের ঘর থেকে বেরিয়ে, লিফটে সোজা চারতলায় উঠে ৩০৪ নম্বর ঘরের দরজায় টোকা মেরেছিলাম। ভেতর থেকে সুখবিন্দরের গলা, "কে?"

"ওয়েটার।"

পরক্ষণেই দরজা অল্প ফাঁক করে সুখবিন্দর আমাকে দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। দরজা বন্ধ করার সময় দিইনি। এক লাথি মেরে ওঁকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেছিলাম, "ঝুলন কোথায়?"

আর তখনই চোখে পড়েছিল বিছানায় একটা মেয়ে চাদর জড়িয়ে উঠে বসেছে। না ঝুলন নয়। বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে। পরনে কিচ্ছু নেই। চোখ-মুখে আতঙ্ক। ভেবেছে আমি পুলিশের লোক। মেয়েটার দিকে নজর দেওয়ার সময় তখন আমার নেই। আমার দরকার সুখবিন্দরকে। মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে ওঁকে বলেছিলাম, "কিডন্যাপ করে ঝুলনকে কোথায় রেখেছেন বলুন। না হলে মেরে শেষ করে দেব।"

পরনে শুধু একটা তোয়ালে। সুখবিন্দর সেটা এক হাতে ধরে রেখেছিলেন। উনি বোধহয় ভাবতেই পারেননি, আমি এত রাফ হতে পারি। বরাবর উনি আমাকে বুলুদির ভাই হিসাবে দেখেছেন। ভদ্র, নম্র, বিনয়ী। আমার উগ্র মূর্তিটা কখনও দেখেননি। কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন, "বিশ্বাস করুন অর্কবাবু। আমি কিচ্ছু জানি না।"

ফের তলপেটে একটা লাথি মেরেছিলাম। উফ্ বলে বসে পড়েছিলেন সুখবিন্দর। হাতের সামনে একটা ফুলদানি। সেটা তুলে ছুড়ে মেরেছিলাম ড্রেসিং টেবলে। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়েছিল কার্পেটের উপর। ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো হাতে নিয়ে আমি হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিলাম, "বল, শুয়োরের বাচ্চা, না হলে এখুনি এটা তোর পেটে ঢুকিয়ে দেব।"

সুখবিন্দর আতঙ্কে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর চোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, সত্যি কথা বলছেন। মুখ দিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন,

pathagar.net

জানেন না। সময় নষ্ট করে লাভ নেই ভেবে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। হাতে কাচের টুকরোটা রয়েই গেছিল। সেটা একটা ফুলের টবে ঢুকিয়ে দিয়ে লিফটে করে আমি নেমে এসেছিলাম লাউঞ্জে। সুখবিন্দর যদি ঝুলনকে কিডন্যাপ না-করে থাকেন, তা হলে কে তুলে নিয়ে গেল? আমার মাথাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছিল।

গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা এস টি ডি বুথ থেকে বিনায়ক মল্লিককে ফোন করেছিলাম। সব শুনে উনি বললেন, "আমরা এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম অর্কবাবু। আপনি লোকাল থানায় একটা ডায়েরি করে রাখুন। আমি দেখছি, কী করা যায়।"

"আপনার কি মনে হয়, এটা আর্মস ডিলারদের রিভেঞ্জ?"

"হতে পারে। আগে একটা কথা বলুন তো, যে ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে থেকে ঝুলন কিডন্যাপড্ হয়েছে, তিনি নিজে কি লোকটাকে দেখেছেন? মানে, লোকটার কোনও ডেসক্রিপশন দিতে পারবেন?"

" জানি না। জিজ্ঞাসা করিনি। তখন মাথাটা কাজ করেনি।"

"নেভার মাইন্ড। আমি লোক পাঠিয়ে সব জেনে নিচ্ছি। থানায় ডায়েরি করে আপনি বাড়ি চলে যান। আমি পরে যোগাযোগ করব।"

বিনায়ক মল্লিকের কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি ফোনের পাশে বসেছিলাম। দুর্ভাবনায় তখন এমন অবস্থা একটা গাড়ির শব্দ পেলেই আমি ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি। বোধহয় পুলিশ কোনও খবর নিয়ে এল। মাঝ রাতে বুলুদির সেল থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে গিলতে শুরু করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে এসেছিল। ঝুলন বাড়িতে নেই, কথাটা ভাবলেই বুক ফেটে যাচ্ছিল তখন।

কী ভেবে চিলেকোঠায় উঠে গিয়েছিলাম। ওই ঘরটার সর্বত্র ঝুলনের চিহ্ন। ওর শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ম্যাক্সি, মেকাপ সরঞ্জাম, বিছানা, বালিশ—দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। এই কলকাতায় কোনও মেয়েকে খুঁজে বের করা কি সহজ কথা? কোথায় কে আটকে রেখেছে ওকে, কে জানে? হঠাৎই মনে হয়েছিল, ঝুলনকে আমি আর ফিরে পাব না। ভুলটা আমারই। আরও সাবধান হওয়া আমার উচিত ছিল।

হঠাৎই বালিশের পাশে একটা অ্যালবাম চোখে পড়েছিল। আগে তো কখনও দেখিনি। কৌতূহলেই অ্যালবামটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলাম। কভার ওল্টাতেই দেখি, দিবাকরদার মায়ের ছবি। পেন দিয়ে কাটাকুটি করা। তলায় লেখা ছিল, আমার মা। (মায়ের চেয়েও বেশি)। সেটাও কেটে দেওয়া। ছবিটার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, নিজের পরিচয় জানার পরই ঝুলন কাল দুপুরের দিকে কোনও একটা সময় উঠে এসে এই কাটা-কুটির কাজটা করেছিল।

পরের পাতাতেই বুলুদির ছবি। লেখা, 'আমার দিদিভাই। যার মতো আমি হতে চাই।' তার পরের পাতায় দিবাকরদার ছবি। লেখা, 'আমার বড় দাদাভাই, ভালবাসায় যার জুড়ি নাই।' এরপরই পাতার পর পাতা জুড়ে ঝুলন আর বুলুদির নানা ভঙ্গিতে তোলা ছবি। নাচের ক্লাসে, বাড়ির ছাদে, বুলুদির ঘরে, দিল্লিতে কুতুব মিনার, যন্তর মন্তর আর লালকেল্লার সামনে দাঁড়ানো দু'জনের ছবি। একটা পাতার পুরোটা জুড়ে ঝুলনের হাসিমুখের ছবি। এত জীবন্ত, মনে হচ্ছিল ও সামনে বসেই হাসছে। তলায় লেখা, 'আমি কালো, কিন্তু মেয়ে ভাল।'

অ্যালবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎই আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার ছবি!

নীল শার্ট, টাই। অফিসের ইউনিফর্মে। শখ করে তুলেছিলাম শিশির স্টুডিও থেকে। বছর চারেক আগে। এই ছবিটা তো ঝুলনের পাওয়ার কথা নয়। তলায় লেখা ছিল, আমার শত্রু। পরে শত্রু কথাটা কেটে দিয়ে ও লিখেছে পরম মিত্র। লেখাটার দিকে তাকিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে বহুক্ষণ বসেছিলাম। তারপর অ্যালবামের পাতা উল্টে দেখি, সর্বত্র আমার আর ওর ছবি। কোথাও লেখা, আমরা। আমার প্রেমিক। আমার ভালবাসা। কোথাও লেখা, আমার। শুধু আমারই। আমরা দু'জন। ছবিগুলো দেখতে দেখতে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

অ্যালবামটা নিয়ে নীচে নেমে এসেছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। সকালে ঘুম ভেঙেছিল বিনায়কবাবুর ফোনে, "অর্কবাবু, আমরা যা খবর পেয়েছি, তাতে কোনও অচেনা লোক ঝুলনকে কিডন্যাপ করেনি। ও পরিচিত লোকের সঙ্গেই গেছে।"

"কী বলছেন আপনি?"

"কলকাতায় আপনাদের এমন কোনও আত্মীয় স্বজন আছেন, যার বাড়িতে ও যেতে পারে?"

"না। সে রকম তো কেউ নেই।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন। যে লোকটার সঙ্গে ও গেছে, সে ট্যাক্সি করে এসেছিল। ট্যাক্সিটা একটু দূরে লোকনাথবাবার মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সে রেখাদেবীর বাড়িতে ঝুলনের খোঁজ করতে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকটা ঝুলনের সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলে। তারপরই বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঝুলন বলে, আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখুনি যেতে হবে।"

"তারপর।"

"তারপরই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দ্রুত ও ট্যাক্সিতে গিয়ে বসে। লোকটা আপনারই বয়সী। কোনও রকম বলপ্রয়োগ করেনি। তাই মনে হচ্ছে, এটা কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা নয়। ঝুলন যেখানে গেছে, স্বেচ্ছায় গেছে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে কি কোনও কারণ আছে? মানে, আমি বলতে চাইছি, এমন কি কিছু ঘটেছিল, যার জন্য ও চলে যেতে পারে?"

বিনায়কবাবুর কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গেছিল। কারণ? হ্যাঁ, চলে যাওয়ার একটা কারণ তো হতেই পারে। ওর জন্মবৃত্তান্ত। বিয়েতে বেঁকে বসেছিল। পাছে জোর করি, সেই ভয়েই কি ঝুলন চলে গেল? এত কথা বিনায়কবাবুকে বলা সম্ভব না। তাই বলেছিলাম, "না, সে রকম বড় কোনও কারণ তো ঘটেনি।"

বিনায়কবাবু যেন উত্তরটা শুনে একটু হতাশই হলেন, "ঘটেনি? তাহলে তো আমাদের একটু অন্য রকম ভাবতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনি বাড়িতে থাকুন। দরকার হলে আমি ফোন করব।"

বিনায়কবাবু ফোনটা ছাড়ার পরই নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসে জড়ো হয়েছিল। আমাকে না জানিয়ে ঝুলন স্বেচ্ছায় চলে যাবে, এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। গেলে ও কার সঙ্গে যাবে? এমন কেউ ওর নেই, যার বাড়িতে ও আশ্রয় পেতে পারে। আমি নিশ্চিত। একশো ভাগ নিশ্চিত। এ সব ভাবার মাঝেই ফোনটা একবার বেজে উঠেছিল। এ পাশ থেকে আমি হ্যালো বলার পর, ও প্রান্তে কে যেন হেসে উঠে, ফোনটা নামিয়ে রেখে দিল। কাল রাত থেকে দু'বার এমন হল। কে করতে পারে ফোন? নিশ্চয়ই এমন কেউ, যে আমার দুরবস্থার কথা

pathagar.net

জানে। এবং জানে বলেই মসকরা করছে।

...বনমালী নস্কর রোডে ঢুকে খানিকটা এগোলেই অমিয়দের বাড়ি। এক তলাটা বিয়ের জন্য ভাড়া দেয়। এ অঞ্চলে সবাই চেনে। ট্যাক্সিটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একশো টাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে নেমে পড়লাম। আজ বোধহয় বিয়ে অথবা বউভাতের জন্য একতলাটা কোনও পার্টি ভাড়া নিয়েছে। গেটের সামনের দিকটা খুব সুন্দর করে সাজানো। বিয়েবাড়ির পাশ দিয়ে ছোট একটা দরজা আছে। দোতলায় ওঠার। বাড়ির লোকেরা ওপরে ওঠার জন্য ওই দরজাটাই ব্যবহার করে।

সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমাকে দেখে বলল, "তুই একা?"

গম্ভীর হয়ে বললাম, "কথা আছে। চল তোদের চিলেকোঠায়।"

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অমিয় বলল, "কী ব্যাপার বল তো অর্ক? তুই কি আমাকে ডোবাবি? বিয়ের সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। কিছু লোকজনকেও নেমন্তন্ন করেছি। আর তুই একা এলি! খোলসা করে বল তো, বিয়েটা করবি, না করবি না!"

বললাম, "সরি অমিয়। বিয়েটা আজ ক্যানসেল করতে হবে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অমিয় থমকে দাঁড়াল। তারপর অসন্তুষ্ট হয়েই বলল, "কেন?"

"রাগ করিস না প্লিজ। চিলেকোঠায় চল। সব বলছি। আরতিকেও ডেকে নে।"

কথাটা বলে আমি একা একাই তিন তলায় উঠে এলাম। এই চিলেকোঠার ঘরটায় বসে আমি আর অমিয় দিনের পর দিন পড়াশুনো করেছি। গরমের দিনে ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতিকে নিয়ে আলোচনা করেছি। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চিলেকোঠায়। সামনের ছাদটায় তখন অনেক ফুলের টব ছিল। এখন নেই। ঘরে আগে একটা পুরনো খাট ছিল। তার বদলে এখন ডিভান। ডানদিকে সোফা সেট আর টেবল। পুরো ঘরটাই আজ ফুল দিয়ে সাজানো। অমিয়রা বোধহয় আমার আর ঝুলনের জন্য ফুলশয্যার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কথাটা মনে হতেই আমার কান্না পেয়ে গেল।

"অর্কদা, ঝুলন আসেনি?"

আরতির গলা শুনে ঘুরে তাকালাম। পরনে বেনারসী শাড়ি, খোপায় বেলফুলের মালা। আরতি বোধহয় বসে সাজছিল। সেই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসেছে। উত্তরটা দিতে খুব মায়া লাগল। তবু সোফায় বসে বললাম "ঠিক শুনেছ, ওকে নিয়ে আসতে পারিনি।"

অমিয় আর আরতি ডিভানের উপর বসল। আমার মুখোমুখি। আমি বলতে শুরু করলাম। বুলুদি বাড়ি ফেরার পর থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সব। বলতে বলতে গলা ধরে এল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে আমি শেষে বললাম, "ঝুলনকে ছাড়া আমি বাঁচব না রে অমিয়। আমি শেষ হয়ে গেলাম।"

ডিভান ছেড়ে উঠে এসে আমার পাশে বসে আমিয় বলল, "বি প্র্যাকটিক্যাল অর্ক। ঝুলন যদি স্মাগলারদের হাতে পড়ে থাকে, তা হলে ফেরার আশা কম। এত ভেঙে পড়ছিস কেন? দাঁড়া, ভাবতে দে, কী করা যায়।"

"কী ভাববি অমিয়? আমারই দোষ। আমার আরও কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল। আমার কপালে সুখ নেই রে। জীবনে একটা মেয়েকেই ভালবাসলাম। আর দ্যাখ, মূর্খামি করে .....।" ভেতর থেকে এমন কান্না উঠে এল আমি কথাটাই শেষ করতে পারলাম না।

কান্না থামার পর বললাম, "সরি আরতি, তোমাদের সব আয়োজন আমি নষ্ট করে

দিলাম। আমি চলি। রাতে একবার পুলিশের কাছে খোঁজ নেব। যদি খবর না পাই, তা হলে নিজের একটা ব্যবস্থা করে নেব। তোমাদের সঙ্গে আর নাও দেখা হতে পারে।" বলেই আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অমিয় হাত ধরে আমাকে ফের বসিয়ে দিয়ে বলল, "কী বোকার মতো কথা বলছিস। কী ব্যবস্থা করবি তুই? সুইসাইড করবি? সামান্য একটা মেয়ের জন্য?"

হাত ছাড়িয়ে বললাম, "তোর কাছে ঝুলন সামান্য মেয়ে হতে পারে। আমার কাছে অসামান্য। ছাড়, আমার কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না।"

আরতি বলল, "আমি একটা কথা বলব অর্কদা? রাগ করবেন না বলুন? আমার এক খুড়তুতো বোনের কথা সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে? মল্লিকা। আজ ও এ বাড়িতেই আছে। মানে ..... বিয়ের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট যখন হয়েই আছে, তখন ওকেই ....."

কথাটা আর শেষ করতে দিলাম না। জ্বলন্ত চোখে বললাম, "প্লিজ আরতি, এ ব্যাপারে আর একটা কথাও তুমি বলবে না। বিয়েটা ছেলে খেলা নয়। আমার পক্ষে ঝুলন ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করা সম্ভব না।"

অমিয়ও হঠাৎ রেগে উঠে ধমক দিল, "তুমি এত স্বার্থপর, তা তো জানতাম না আরতি। দেখছ অর্কর অবস্থা। আর তুমি মলির কথা চিন্তা করছ। ছিঃ। যাও, নীচে যাও।"

কোনও কথা না বলে আরতি নীচে নেমে গেল। আমি আর অমিয় চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। নীচে বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজছে। বি এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমরা দু'জনে একবার বদমাইসি করেছিলাম। পরদিন পরীক্ষা। সানাইয়ের আওয়াজে আমাদের পড়ার বারোটা বেজে গেছিল। অমিয় আর আমি খচরামি করে বার ছয়েক মেন সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম। সে দিনগুলোই খুব ভাল ছিল। সানাইয়ের সুর আমি আজ সহ্য করতে পারছি না।

হঠাৎ অমিয় বলল, "অর্ক, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তুই স্নান টান করে নে। অ্যাটাচড বাথরুম আছে। দাড়ি কামিয়ে ফ্রেস হয়ে বোস। দেখি, দু'জনে মিলে কিছু করা যায় কি না।"

আলমারি খুলে ও নতুন পাঞ্জাবি আর চোস্ত বের করে দিল। তারপর জোর করেই আমাকে তুলে দিয়ে বলল, "দ্যাখ, ভগবান কখনও এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আমি বলছি, ঠিক তুই ঝুলনকে ফিরে পাবি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ছাদের ঘরে আগে এই বাথরুমটা ছিল না। অমিয় সাদা টাইলস বসিয়েছে। শাওয়ার লাগিয়েছে। পিন্টু আর শুক্লাদের বাড়িতে এ রকমই ছিল বাথরুমটা। অমিয় তখন বলত, "আমার বাবার কোনও টেস্ট নেই, বুঝলি। যখন আমি রোজগার করব, বাথরুমে ঠিক পিন্টুদের বাড়ির মতো টাইলস বসাব।" পনেরো-ষোলো বছর আগেকার ঘটনা। এখনও ভুলিনি। অমিয়দের এই বাড়িটার দশ বারো গজের মধ্যেই শুক্লাদের বাড়ি। বহুদিন ওদিক মাড়াইনি।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসেই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। এটা আমার অভ্যাস। বাড়িতেও করি। ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে, তার নীচে দাঁড়িয়ে থাকি। পাঞ্জাবি আর চোস্তটা গলিয়ে আমি পাখার নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক'টা বাজে জানি না। সাতটা-সওয়া সাতটা হবে। ছাদের দরজার দিকে তাকাতেই গোল চাঁদটা চোখে পড়ল। ঝুলন সেদিন বলেছিল, আজ পূর্ণিমা। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনটা ফের দুর্বল হয়ে গেল।

সিঁড়ির দিকে দরজার সামনে হালকা পায়ের শব্দ। অমিয় বোধহয় উঠে এল। পায়ের শব্দটা ঠিক আমার পিঠের কাছে এসে থেমে গেল। হঠাৎই পিঠে একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। মুখ দিয়ে ছিটকে একটা কথাই বেরিয়ে এল, "ঝুলন, তুমি?"

বিশ্বাস হচ্ছে না। দু'হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওকে দেখে নিলাম। সত্যিই আমার ঝুলন তো? যার জন্য প্রায় পুরো একটা দিন আমি পাগলের মতো কাটিয়েছি, সে এই বাড়িতে! আশ্চর্য! বিনায়কবাবু তা হলে ঠিক আন্দাজই করেছিলেন, ঝুলন স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গে চলে গেছে। কেউ ওকে কিডন্যাপ করেনি। তা হলে অমিয়, অমিয়ই ওকে নিয়ে এসেছিল?

ঘরের আলো নেভানো। ছাদের জ্যোৎস্না থেকে ছিটকে আসা রুপোলি আভায় আমার ঝুলনকে আমি দেখছি। পরনে বেনারসী শাড়ি, গলায় সোনার নেকলেস, কানে দুল। খোপায় বেলফুলের মালা। মুখে চন্দনের ফোঁটার আলপনা। কনের সাজে সেজে ঝুলন উঠে এসেছে। অঞ্জলির মতো দু'হাতে তুলে ধরলাম ওর মুখটা। প্রাণভরে ওকে দেখতে লাগলাম। পাতাল থেকে উঠে আসা রাজকুমারীকে।

ওর দু'টো হাতই আমার পিঠ জড়িয়ে ধরেছে। ফিসফিস করে ঝুলন বলল, "তুমি আমাকে এত ভালবাসো, অর্কদা?"

"তুমি আমাকে ভালবাসো না?"

"তুমি আমাকে এমন করেই ভালবাসবে তো অর্কদা?"

"আমাকে দেখে তুমি বুঝতে পারো না? তুমি কি জানো, কাল রাত থেকে আজ সারাটা দিন আমার কেমন কেটেছে? আমি তো ঠিকই করে ফেলেছিলাম, আজ রাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেব।"

আমার মুখে আঙুল চাপা দিয়ে ঝুলন বলল, "বোলো না গো। আমারই দোষ। আমি ভুল বুঝেছিলাম। অমিয়দা বোঝানোর জন্যই আমাকে কাল এখানে নিয়ে এল। এখানে না এলে জীবনে সব থেকে বড় ভুলটা আমি করে বসতাম।"

"ওই স্টুপিডটা এতক্ষণ আমার সঙ্গে নাটক করছিল। উফ্, আমাকে ফোন করলেও তো পারত। এত কষ্ট পেতাম না।"

"এই, লক্ষ্মীটি তুমি কিন্তু অমিয়দাকে গালাগাল করবে না। এখানে এসে আমি কিন্তু দু'বার ও বাড়িতে ফোন করেছিলাম। জানি, আমাকে না দেখলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। দু'বারই তুমি ফোন তুললে। এ দিক থেকে দু'বারই ফোনটা কেড়ে নিল অমিয়দা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে দিল না। বলল, অর্ক কত বড় মাস্তান দেখি। বিকেলে তো আসবেই। আসুক। এসে তোমার জন্য কান্নাকাটি করুক। ওর মুখ থেকে প্রেমের কিছু ডায়লগ শুনি। তারপর তোমাকে ওর সামনে বের করব।"

"শালা ইডিয়েট, এ সব বলেছে? ওর জন্য আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তুমি জানো?"

"মাফ করে দাও প্লিজ। নীচে অনেক লোকজন আছে। তোমার বাবা এসেছেন। উনি দাঁড়িয়ে থেকে এ বিয়েটা দিচ্ছেন। নীচে যে বিয়েবাড়িটা দেখে এলে, সেটা আমাদের জন্য। অমিয়দা আমাদের জন্য কী করেছে, তুমি ভাবতেও পারবে না।"

"বাবা কী করে খবর পেলেন?"

"কাল রাতে অমিয়দা ভগীরথপুরে ফোন করেছিল।" মুখ নিচু করে ঝুলন বলল, "আমার

ব্যাপারে সব কথা খুলে বলেছে। জানতে চেয়েছিল, এ বিয়েতে ওঁর মত আছে কিনা। তখন উনি আমার সঙ্গে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। আমাকে অনেক বোঝালেন। বললেন, 'মা আমার অর্ক, মায়ের ভালবাসা পায়নি। তুমি ওকে সুখে রেখো।' তখন আমার কান্না পেয়ে গেল। বিয়েতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। জানো, আজ দুপুরে এসেই উনি তোমার মায়ের সব গয়না আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আর কী বলেছেন জানো?"

শুনতে শুনতে খুশির একটা বুদ্বুদ বুকের ভেতর জমা হচ্ছিল। হঠাৎ সেটা ফেটে পড়ল। ওর মুখটা টেনে এনে আমি বললাম, "কী বলেছে গো?"

"বলেছেন, কালই আমাকে ভগীরথপুরে নিয়ে চলে যাবেন। গ্রামে গিয়ে সবাইকে ডেকে অনুষ্ঠান করবেন। এত সইবে তো অর্কদা আমার?"

"এক্সেলেন্ট। চমৎকার। আমি বাদ?"

"দেখি, বাবাকে রিকোয়েস্ট করে। তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।"

"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।" বলেই ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে যাব, এমন সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল তিন চারজন। কে একজন আলোটা জ্বালিয়ে দিতে ঝুলন ছিটকে ডিভানের অন্য পাশে সরে গেল। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে আরতি বলল, "তারপর অর্কদা, ঘুমের ট্যাবলেটগুলো সঙ্গে এনেছেন, না বাড়িতে রেখে এসেছেন। পকেটটা দেখি?"

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "দেখার দরকার নেই আরতি। বিয়েটা হয়ে যাক। তোমাদের সবাইকে একটা করে ঘুমের বড়ি দিয়ে দেব। যাতে রাতের বেলায় তোমরা কেউ আমাদের ডিসটার্ব করতে না পারো।"

"আজ আপনার সব ডায়লগ অমিয় টেপ করে রেখেছে। বিয়েটা হয়ে যাক। সারা রাত্তির ধরে আমরা সবাই সেই ক্যাসেটটা শুনব।"

হার মানলে চলবে না। বললাম, "তোমরা যা করেছ, তোমাদের পুলিশে দেওয়া উচিত।"

"দেওয়াচ্ছি পুলিশকে। আগে কান ধরে ওঠ-বোস করুন। তারপর অন্য কথা বলবেন। আমার বিয়ের সময় তো খুব বড় মুখ করে বলেছিলেন, বোকারা লাভ ম্যারেজ করে। জীবনেও এই বোকামিটা আমি করব না। তা, আজ এটা কী হচ্ছে মশাই?"

অমিয় বলল, "আমি বলব? একেবারে সাঁওতালি প্রথায় বিয়ে। সাঁওতালি বিয়েতে বরকে অনেক কষ্ট করতে হয়। তারপর কনেকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্ক, তোর বিয়েটা ঠিক ভাবেই হল রে। চল এবার নীচে চল। দিলু ব্যাটা কাগজপত্তর সাজিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছে।"

...অনেক রাতে চাঁদ যখন ঠিক মাথার উপরে, ঝুলনকে নিয়ে তখন আমি ছাদে এলাম। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের জ্বালাতন করে, ক্লান্ত আরতিরা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাদটা। চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে ঝুলনকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ওর আঙুলে এনগেজমেন্ট রিংটা পরিয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "পূর্ণিমার রাতটা কি আজ আমরা রেখাদের মতো করে কাটাব ঝুলন?"

আমাকে জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা রেখে ঝুলন বলল, "না। না। আমার লজ্জা করছে।"

---

pathagar.net